দক্ষিণের ভারতবর্ষ

আল্‌ফা পাবলিশিং কনসার্ন
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

দক্ষিণ ভারতে সচরাচর প্রয়োজনীয় কয়েকটি শব্দের ভাষান্তর

বাংলা	তামিল	তেলেগু	মালয়ালাম্	কন্নড়
কত ?	এত্রাই	এণ্ডা	এত্রা	এষ্টু
ভাড়া	ওয়ার্ডাকে	আদ্দে	ওয়ার্ড্রেকে	বাড়িগে
গাড়ি ভাড়া কত ?	বাণ্ডি ওয়ার্ডাকে এন্না	বাণ্ডি আদ্দে এণ্ডা	বাণ্ডি ওয়ার্ডোক এত্রা	গাড়ি বাড়িগে এষ্টু
কত দুর	এন্না দুরম্	এন্তা দূরম্	এত্রা দূবম্	এষ্টু, দুব
মূল্য/দাম	বিলাই	বেলা	বিলা	বেলে
টাকা	রূপা	রূপয়	রূপিয়া	রূপাই
পয়সা	আনা	পৈসা	মুকাল	আনে
এক (১)	ওন্নু	ওকাটি	ওন্না	ওযান্দু
দুই (২)	রেণ্ডু	রেণ্ডু	বে'ণ্ড	ইয়ারডু
তিন (৩)	মুন্নু	মুডু	মুনা	মুরু
চার (৪)	নালু	নালু	নালে	নালকু
পাঁচ (৫)	আঞ্জি	আইদু	আঞ্জে	ঐদু
ছয় (৬)	আরু	আরু	আবে	আরু
সাত (৭)	এড়ু	এড়ু	এ্যডে	ইয়েলু
আট (৮)	এট্টু	এনিমিদি	এ্যট্টে	এণ্টু
নয় (৯)	ওম্বদু	তোম্মিদি	ওম্বদে	ওম্বত্তু
দশ (১০)	পত্তু	পদি	পত্তে	হত্তু
শত (১০০)	নুর	নুরু	নুর	নুরু

খাদ্য দ্রব্য

জল	জলম্, তীর্থম্	নিলু'	ওযেল্লাম্	নীরু
চাউল	আরিসি	বিয়্যম্	আরি	আক্কি
ডাল	পরপ্পু	পপ্পু	পরিপ	বেলে
তেল	ইয়েন্নাই	নূনে	এন্না	এন্নে

লবণ	উপ্পু	উপ্পু	উপ্	উপ্পু
আলু	উরুলাই কলঙ্গু	বাঙ্গালি দুম্পা	উর্লা কাড়ঙ্গে	উরলা গাড্ডে
লঙ্কা	মোড়গা	মিরাপা কায়ালু	কাপ্পেল মোড়কে	মোনমিনা কাই
নারকেল	তেঙ্গয়	কোব্বরি কায়া	নালিকেরম্	তেঙ্গিনা কাই
ডাব	এলেনির	পাইডি কায়া	এলেনির	শিয়াল
পাকাকলা	বালাই পড়ম	আরোটি পাণ্ডু	পড়ম্	বালে হন্নু
নেবু	ইয়েলু মিচ্চম্	নিম্মা কায়া	কেরু নারিঙ্গা	নিম্বে
গুড়	বেল্লম্	বেল্লম্	শর্করা	কাকম্বী
চিনি	চক্করে	পঞ্চদারা	পঞ্চসারা	শক্করে
দৈ	তাইর	পেরেগু	তাইর	মোসরু
ঘি	নেয়ী	নেয়ী	নেয়ী	তুপ্পা
দুধ	পাল্	পাল্	পাল্	হালু
পান	চুনম্	সুন্নম্	চুন্নাম্বু	সুন্না
সুপারি	পাকু	চক্কা	পাকু	আড়িকে
পাতা	এলাই	আকু	এলা	ইয়েলে

প্রতিষ্ঠান

দোকান	কাডাই	দোকানমু	আঙ্গাড়ি	আঙ্গাড়ে
মন্দির	কোয়িল	দেবালয়ম্	অম্বলম্	দেবস্থান
পায়খানা	কাকুস	দোড্ডি	কাকুস	পায়খানা

সময়াদি

দিন	নল	দিনম্	দিবসম্	দিবস
মাস	মাস	নেলা	মাসম্	তিঙ্গলু
বৎসর	বরষম্	সম্বৎসর	কোল্লম্	বর্ষ
বেশি	অধিকম্	অধিকম্	অধিকম্	হেচ্চু
কম	স্বল্পম্	তাক্কুয়া	স্বল্পম্	স্বল্প
ভাল	নাল্লহু	মাঞ্চিদি	নাল্লহু	ওয়ল্লে
মন্দ	কেট্টাহু	চেড্ডাদি	চিতা	কেট্টা

গরম	চুড়্	বেড়ি	চড়ু	বিসি
ঠাণ্ডা	কুলুথি	স্বন্ননি	তনপ্প্	ভাত্তি

বিবিধ দ্রব্য

ঔষধ	মরন্দু	মন্দু	মরুন্নে	ঔষধ
কাগজ	কাগিদম্	কাগিতম্	কাড়লান	কাগদ
কলম	পেনা	কলম	পেন	লেখনী
ছুরি	কাত্তি	কাত্তি	কাত্তি	কাত্তি
কাঁচি	কাত্তোরি	কাত্তেরা	কাত্তেরি	কাত্তরি
দরজা	কাদাবু	তালুপু	ওয়াদিল	বাগলু
(দরজা) খোলো	তেরা	তিয়ি	তুরকুগা	তেরি
,, বন্ধকর	মুড়ু	ভেয়ী	আড্ডাক্কুগা	মুচ্চ্

আসবাবপত্র—

মশারি	কোসুবালাই	দোমাতেরা	কোসুবালা	মুসিতেরে
কম্বল	জামাকালাম্	দুপাটি	জামাকালম্	কম্বলি
দড়ি	কাইরু	তাড়্	কাইরে	হগ্গ

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—

হাত	কাই	চেতলু	কাই	কই
পা	পাদম্	কা আল্লু	পাদম	কালু
চোখ	কান্থ	চেয়েলু	চেরি	কিবি
কান	কান	কাল্ল	কান	কাল্ল
নাক	নাকু	নালিকা	নাক	নালিগে
মাথা	তালাই	তলা	তালা	তাল

বিবিধ

(ঘর) ভাড়া	বাড়াগাট	আদ্দে	ওযার্ডাকে	বাড়াগে

*প্রধানতঃ সারদা প্রসন্ন দাস প্রণীত দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কথামৃতে আছে কেউ আম গাছের ডালপাতা গোনে, কেউ আম খায়। অমৃতফলের আস্বাদ যিনি পেয়েছেন ডালপাতার হিসাব নিয়ে তিনি অবশ্যই মাথা ঘামাবেন না। ভ্রমণ বৃত্তান্ত বহুলাংশে এই ডালপাতা গোনার ব্যাপার। নতুনকে দেখার আনন্দ, অপরিচিতকে জানার রোমাঞ্চ কথামুখে অপরের চিত্তে সম্প্রসারিত করা প্রায় অসম্ভব। প্রায় বল্লাম এই জন্যে যে, ঠিকমত দেখার মন ও দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্য প্রতিভার মণি-কাঞ্চন যোগ সাধিত হলে সবই সম্ভব হতে পারে।

আমাদের এই পুরাতন দেশ ও তার পরিচিত মানুষ নিত্য নবরূপে নবীনতর প্রত্যাশা নিয়ে প্রকটিত হচ্ছে। আমরাও বদলে চলেছি নিরন্তর। এমনি করে বদলাতে বদলাতে দু দিন আগে হোক আর পরে হোক, সবাই আমরা নিঃশেষে মুছে যাব। এ সত্য সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু প্রকৃতির এই চরম নিয়তিকে স্বীকার করে নিয়েও মানুষ চেয়েছে দূর ভবিষ্যতের জনসমাজের কাছে তার চিন্তা ভাবনাকে পৌঁছে দিতে। এই মানসিকতা থেকেই কঠিন পাহাড়ের বুকে হাতুড়ি আর বাটালি ঠুকে ঠুকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিচিত্র সব ভাস্কর্য রচনা করে গেছেন। সৃষ্টি করে গেছেন অজস্র শিল্পসমৃদ্ধ মন্দির ও বিগ্রহ। ভারতের দক্ষিণাংশ জুড়ে রয়েছে শত সহস্র ছোট বড় মন্দির। সারা পৃথিবীর শিল্পরসিক মানুষ একবাক্যে এর অকুণ্ঠ প্রশস্তি করেছেন। শত শত বৎসর পূর্বে আমাদেরই কোন পূর্বজের হাতের ছোঁয়ায় যে কঠিন পাথর এমন বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে সেই সব পাথর স্পর্শ করে আমি তাঁদের প্রণাম করতে চেয়েছিলাম। এই উদ্দেশ্য সাধনের শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র যে দক্ষিণ-ভারত তাতে আর সন্দেহ কী!

উপনিষদ বলেছেন চরণ বৈ মধু বিন্দতি চরণস্বাদুমুদুম্বরম্—চলনে অমৃত লাভ এবং চলাই স্বাদু ফল। এই সত্যে বিশ্বাস করে একুশ

দিনে বাঙ্গালোর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের প্রধান তীর্থগুলি আমি পরিক্রমা করেছি। আমাদের মত মানুষের সাধ্য সীমিত। সুতরাং শুরু থেকেই পথঘাটের খোঁজ-খবর, থাকা খাওয়ার হদিস্ ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে না নিলে অকারণ সময় নষ্ট ও বৃথা ব্যয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনেকগুলি ভ্রমণকাহিনী পড়ে আমি নিজেকে তৈরী করে নিতে চেয়েছিলাম। আমি যে ক'টি ভ্রমণ কথা পেয়েছিলাম তা ভাল করে পড়া সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

ভারত সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সব আয়োজনটাই বিত্তবান্ বিদেশী ভ্রমণ-কারীদের জন্য বলেই আপনার ভ্রম হবে। তবু আপনি নাছোড়বান্দা হলে তার থেকেই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় খবরাখবর সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। বেরোবার আগে এটা করাই উচিত। এদের সাহায্যেই আমি একটি ভ্রমণসূচী তৈরী করেছিলাম। অবস্থার চাপে কার্যক্ষেত্রে তার কিছু রদ-বদল ঘটাতে হয়েছিল। সেই পরিবর্তিত সূচিটি আমি এখানে তুলে দিয়েছি। এটাকে ভিত্তি করে যে কেউ সহজেই নিজের মত করে একটা দাঁড় করাতে পারবেন। ভ্রমণকারীদের জন্য রেলে বিবিধ সুযোগ সুবিধা আছে। সার্কুলার টিকিট তার অন্যতম। অনেকগুলি বৃত্তকার পথ তাঁরা রচনা করে রেখেছেন। সে পথের ভাড়া চলতি মাশুলের চেয়ে অনেক কম। কারো প্রস্তাবিত ভ্রমণের পথ ভিন্ন হলেও তিনি এ সুযোগ পেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে পূর্বাহ্ণে রেলের কমার্শিয়াল দপ্তরের অনু-মোদন নিয়ে নিতে হয়। কাজটা খুবই সহজ।

আমরা সরাসরি মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যেতে রেলে মোটামুটি দু রাত এক দিন লাগে। অনেকে মাদ্রাজের ১৩৭ কিলোমিটার আগে গুডুর জংশনে নেমে তিরুপতি দিয়েই শুরু করেন। কিন্তু রাত দুটোর কাছাকাছি সময়ে গুডুর নামতে হয় বলে বহু জনে

মাদ্রাজ থেকে তিরুপতি যাওয়াই পছন্দ করেন। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই ভাল ধর্মশালা এবং যাত্রীনিবাস আছে। অধিকাংশ আবাসগুলিতে খাবার ব্যবস্থা নেই। এদেশের খাবার উত্তরাখণ্ডের মানুষ এবং বাঙালীর রুচিকর হয় না। অনেকে খেতেই পারেন না। নারকেল তেলে রান্না। টক ও ঝালের বিচিত্র সন্নিবেশে মাছ, মাংস, ডাল, তরকারী সবই বিস্বাদ ঠেকে। দইটাও বিষ টক। চিনি চাইলে পাওয়া যায়। কিন্তু দামটা অনেক ক্ষেত্রে দইয়ের চেয়ে বেশি পড়ে। তবে হাঁ, ভাল লাগুক বা না লাগুক এ দেশে এলে কম বেশি ঐ খাবার খেতেই হবে। আর কয়েকদিন ধরে খেতে খেতে শেষের দিকে একেবারে মন্দ লাগবে না। একটু মাখন ও চিনি সঙ্গে রাখবেন। তাতেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। আরও কিছু নেওয়া হয়তো চলে। তাতে অসুবিধাও বিস্তর। বেড়াতে গিয়ে লটবহরের বোঝা বেশি হলেই নানান মুশকিল। নিজে যেটুকু বইতে পারা যায় তার চেয়ে বেশি না হলেই ভাল। দামী জিনিসপত্র পরিহার করেই চলা উচিত। মালপত্রের জন্য পিছুটান থাকলে বেড়াবার আনন্দটাই মাঠে মারা যাবে। আবার লটবহর বেশি হলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেড়ে যাবে—কুলি-মজুর যান-বাহনের ব্যয় অনেক বাড়বে। মজুরের জুলুম সব দেশেই সমান। নতুন লোক দেখলে তারা ঠকিয়ে নেবেই। আইন ওখানে অচল। আর সে সময়ই বা তখন কোথায় পাবেন।

আর একটা কথা। ভ্রমণে একলা বেরোনো কোন কাজের কথা নয়। বড় দলের সঙ্গেও অনেক অসুবিধা। তিনচারজন অন্তরঙ্গ ও সমধর্মী লোক একত্রে বেরোতে পারলে সর্বোত্তম। এতে মেজাজটা ঠিক থাকে। একলা হলে পদে পদে অসুবিধা। যান-বাহনের ভাড়া, থাকা-খাওয়ার ব্যয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সুবিধা সেটা উপেক্ষণীয় না হলেও তার উপর আমি জোর দেই না।

আমরা কোথাও পৌঁছে সরাসরি মালপত্র নিয়ে হোটেল বা লজে

গিয়ে উঠিনি। কেউ বসে আছি স্টেশনে মালপত্র নিয়ে, অন্য জনে খোঁজ নিয়েছি পছন্দমত হোটেলের ও অন্যান্য প্রয়োজনের। তারপর সব ঠিকঠাক হলে একত্রে গিয়ে উঠেছি। এতে অনেক সুবিধা। আবার শরীরের কথাও তো বলা যায় না। ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে ইতর-বিশেষ হয়ই। বন্ধুজনেরাই তো সহায়। আরও সুবিধা দর্শনের ব্যাপারে। সমধর্মী মানুষ হলেই সমদৃষ্টি হয় না। দেখাশুনার ব্যাপারে, অনুভব উপলব্ধির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকেই। এগুলির আদান-প্রদানের ফলে দর্শন মধুর ও মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

মাদ্রাজ থেকে আমাদের ভ্রমণ-তালিকা ছিল এই রকম।

প্রথম দিন। মাদ্রাজ শহর। সমুদ্র, দুর্গ, সাধু টমাসের গির্জা, কপালেশ্বর ও পার্থ সারথির মন্দির, গান্ধী মণ্ডপ, আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম।

দ্বিতীয় দিন। মাদ্রাজ সরকারের টুরিষ্ট বাসে—কাঞ্চীপুরম্, পক্ষী-তীর্থম্, ও মহাবলীপুরম্। ফিরবার পথে আডিয়ারে নেমে থিওসফি-ক্যাল সোসাইটি। এখান থেকে শহর আট কিলোমিটার মাত্র। বাস অপেক্ষা করে না। ফিরবার ব্যবস্থাটা নিজেদেরই করতে হয়। যাত্রী বাস মেলে।

ঐ রাতেই রেলে পণ্ডিচেরি যাত্রা এবং পরের দিন ভোরে পণ্ডিচেরি।

তৃতীয় দিন। সকালে—পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ও পণ্ডিচেরি শহর। বিকেলে (আশ্রমের বাস-এ) অরভিল।

চতুর্থ দিন। সকালে নিজেদের ব্যবস্থায় একটি গ্রাম দর্শন। দুপুরে চিদাম্বরম্ যাত্রা। চিদাম্বরম্ শহরের মাঝখানে ধর্মশালায় মালপত্র রেখে নটরাজ মন্দির ও আন্নামালাই বিশ্ববিত্তালয় দর্শন। সময় থাকলে—গোবিন্দরাজা। সন্ধ্যার ট্রেন ধরে তাঞ্জোর। পথে পড়ে কুম্ভকোণম্।

পঞ্চম দিন। সকালে—বৃহদেশ্বর মন্দির, সরস্বতী মহল। দুপুরের গাড়ি ধরে ত্রিচিরাপল্লী। মালপত্র স্টেশনে জমা দিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির ও রক টেম্পল। রাত্রের গাড়ি ধরে রামেশ্বরম্।

ষষ্ঠ দিন। সমুদ্র, অগ্নিতীর্থ, রামজি-রোখা। রামেশ্বর মন্দির, আরতি দর্শন।

সপ্তম দিন। সকালে সমুদ্র স্নান। রামেশ্বর মন্দির। তীর্থকৃত্য। দুপুরের গাড়ি ধরে মাদুরা।

অষ্টম দিন। মাদুরায় মীনাক্ষী মন্দির। তিরুমালাই, নায়ক প্রসাদ, টেপ্পাকুলম্ সরোবর। বসন্ত মণ্ডপ। শহর। রাত্রের গাড়ি ধরে কন্যাকুমারী যাত্রা।

নবম দিন। কন্যাকুমারী—মন্দির, গান্ধী মণ্ডপ, বিবেকানন্দ স্মৃতি সৌধ। অবস্থান।

দশম দিন। সকালে তীর্থকৃত্য। গ্রাম গীর্জা ও সুচিন্দ্রম্ মন্দির দর্শন। দুপুরে বাসে করে ত্রিবান্দ্রম্।

একাদশ দিন। ত্রিবান্দ্রমে পদ্মানাথ স্বামী মন্দির, সমুদ্র, মৎস্য-শালা, শহর ও জলপথ। রাত্রের গাড়ি ধরে এর্নাকুলাম।

দ্বাদশ দিন। এর্নাকুলাম, কোচিন বন্দর, জলপথে ভ্রমণ। কোচিন বন্দরে অবস্থান।

ত্রয়োদশ দিন। রেল ধরে কোয়াম্বাটুর। এখান থেকে উটকামণ্ড হয়ে মহীশূর যাওয়া যায়। সরাসরি মহীশূরের বাসও চলে।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দিন। মহীশূর ভ্রমণ সংস্থার বাসে শহর দর্শন। শ্রীরঙ্গ পাটনা, শ্রী সোমনাথপুর, টিপু সুলতানের প্রাসাদ, আর্ট গ্যালারী, চিড়িয়াখানা, কৃষ্ণরাজ সাগর, বৃন্দাবন গার্ডেন এবং চামুণ্ডি মন্দির।

ষোড়শ দিন। বাসে বাঙ্গালোর। শহর দর্শন।

সপ্তদশ দিন। ভ্রমণ সংস্থার বাসে—শ্রাবণ বেলগোলা,. বেলুড়, হ্যালেবিদ। [মহীশূরে বাস পাওয়া গেলে সেখান থেকেই যাওয়া সুবিধা। কিন্তু সব সময় বাস মেলে না।]

অষ্টাদশ দিন। হোয়াইট ফিল্ড—সাঁইবাবার আশ্রম, বিমান নির্মাণ কারখানা, লালবাগ। তুপুরের পরে বৃন্দাবন একস্‌প্রেস ধরে মাদ্রাজ প্রত্যাবর্তন।

উনবিংশ দিন। রেলে তিরুপতি।

বিংশতি দিন। তিরুপতি মন্দির দর্শন। রাত্রের গাড়িতে কলকাতা যাত্রা।

যাত্রা-লগ্ন আমরা সাধারণত পাঁজিপুথি দেখে বেছে থাকি। তা করুন, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সূচিটা এমন করে করবেন যাতে পূর্ণিমার সন্ধ্যাটা কন্যাকুমারিকায় কাটে। তাতে যদি একটু খারাপ দিনেও বেরোতে হয় তবু ইতস্তত করবেন না। আখেরে লাভ হবে। বিনোবাজি বলেছেন অশুভ বলে কিছু নেই। ওটা শুভেরই ছায়া মাত্র। শুভের রূপ দেখানোই অশুভের কাজ। অতএব মাভৈঃ।

দক্ষিণে যাত্রাক্ষণের শুভাশুভের কথায় অগস্ত্য মুনির কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। হিমালয়ের খাতির তাঁর কন্যা গৌরীর গৌরবে। বিন্ধ্যও ভাবলেন অমন একটি কন্যা হলেই সব ঝামেলা মিটে যায়। গৌরীর মত কন্যা হলে জামাইও হবে শিবের মতন। তখন খাতিরটা আপনা থেকেই বেড়ে যাবে। তাই সাধনা করলেন কন্যা লাভের। একটি নয়, তুটি কন্যা তিনি লাভ করেন। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁরা হয়েছিলেন শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী। এই বিন্ধ্যগিরি উঁচু হতে হতে সূর্যের পথ রুদ্ধ করে দেন। সমগ্র দক্ষিণাপথ অন্ধকারে ডুবে যায়। মানুষ ও দেবতা, সকলেই শঙ্কিত হলেন। দেবতারা অগস্ত্যকে ধরলেন। অগস্ত্যের শাপে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত নহুষকে সাপ হতে হয়েছিল—এতই যার শক্তি তিনিই হচ্ছেন বিন্ধ্যকে বশীভূত করার যোগ্য শক্তিধর ব্যক্তি। দেবতারা তাই

অগস্ত্যের শরণ নিলেন। তিনিও এক কথায় রাজি হলেন। বিন্ধ্য অগস্ত্যকে ভয় করতেন খুব। সামনে আসতেই তিনি আভূমি নত হয়ে মুনিকে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য তাঁকে প্রত্যাবর্তন অবধি ঐ ভাবে থাকতে নির্দেশ করে অতিক্রম করে গেলেন। আর ফেরেন নি। তিনি দক্ষিণ দেশেই বে-থা করে প্রচুর সম্পদশালী হয়েছিলেন। বিন্ধ্য আজও অগস্ত্যের আদেশ পালন করে আনত হয়ে আছে। তারই প্রসারিত বাহুদ্বয় বুঝি বা পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালা। ঋষি অগস্ত্যই আর্য সভ্যতাকে দক্ষিণের ভারতবর্ষে প্রসারিত করেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

যাত্রাপথে

থাকি নিউ ব্যারাকপুরে। হাওড়া স্টেশনের দূরত্ব মাইল বার তের হবে। পুরো তিন ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারি না। ট্যাক্সির বিভ্রাট মিটিয়ে জ্যাম ও জুলুমের মোকাবিলা করে ঠিক সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছনোর গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। তাই শিয়ালদহ থেকে 'বলম্ বলম্ পদ বলম্'-এর হিসেবে সময় হাতে নিয়ে বেরোনোই যুক্তিসিদ্ধ। বিজ্ঞ হতে গিয়ে ঘণ্টা খানেক হাওড়া স্টেশনে বসে চলমান মিছিল দেখলাম। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সবাই ত্রাস্ত ব্যস্ত, ছুটন্ত মানুষ। ভ্রূক্ষেপই নেই অপরের সুবিধা অসুবিধার প্রতি। গাড়িতে একটি আসন পাওয়াই হলো এখনকার মোক্ষ।

আমরাও এক সময় গাড়িতে উঠে বসলাম। যাত্রীর তুলনায় বিদায় জানাতে আসা জনতাই বেশি মুখর। অধিকাংশ যাত্রী দক্ষিণী। তাঁরা মাতৃভাষায় কথা কইছেন। উচ্চকণ্ঠে দ্রুত উচ্চারণ এবং একাধিক জনের সমবেত আলাপের বিন্দুমাত্র বোধগম্য না হলেও আসন্ন বিচ্ছেদ জনিত বেদনায় যে তাঁরা কাতর তা আমরা অনুভব করেছিলাম। কোন কিছুই স্থায়ী হয় না। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়তেই আত্মীয়বন্ধুজনেরা নেমে

গেলেন। বহুজনেরই চোখ সজল হয়ে এসেছিল। চোখের জলে বলা কথা বুঝবার জন্য ভাষাজ্ঞানের দরকার হয় না। সহযাত্রীদের প্রতি স্বভাবতই আমরা করুণার্দ্র হয়েছিলাম।

রেলের নিয়মে রাত ন'টা থেকে সকাল ছ'টা পর্যন্ত ঘুমোবার অধিকার। কিন্তু সহযাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই খেয়ে দেয়ে ঘুমোবার উদ্যোগ করলেন। আমরাও তাদের সহগামী হলাম। অন্ধকার রাত্রে বসে বসে দেখবই বা কি! চারিদিক অন্ধকারে ঢাকা, দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কিছু। সুতরাং রাত্রের আহারাদি শেষ করে আমরাও শুয়ে পড়লাম। রাত তখন ন'টা হবে। আজকের রাত্রের আহার্য আমরা বাড়ি থেকে এনেছিলাম। সুধীরদার কন্যা ও পুত্রবধূদ্বয় খুব যত্ন করে সকলের জন্য প্রচুর লুচি ও মাছ ভাজা করে দিয়েছিলেন।

ঘুম ভাঙল বহরমপুরে, চা কফির কোলাহলে। অমন অখাদ্য কফি ইতিপূর্বে কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কফিতে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু এখানকার চা আরও খারাপ। পলাশায় আবার কফি। তারও ঐ একই হাল।

চোখ খুলেই পাহাড়ের হাতছানি দেখতে পেয়েছি। ছোট ছোট পাহাড়। কোথায়ও তা সবুজ আস্তরণে ঢাকা আবার কোথাও বা খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত শিলার ছড়াছড়ি। উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলে রয়েছেও অনেকে। কুয়াশার একটা পাতলা আস্তরণে শীর্ষদেশটি ঢাকা। মনে হয় অকম্পিত জলতরঙ্গের সঙ্গেই এর তুলনা হতে পারে। পাহাড়ের কোলে কোলে লাল মাটির বুকে সবুজ ধানের সমারোহ দেখে আমরা অবাক হই। পাথরের বুকেই বুঝিবা এরা ধান ফলিয়েছে। পলাশার পরে পাটও দেখেছি। আর দেখেছি অফুরন্ত তাল গাছের জটলা। খেজুরও গাছ আছে, তবে তার সংখ্যা নগণ্য।

বেলা ন'টার কাছাকাছি সময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা থেমে ছিলাম শ্রীকাকুলাম স্টেশনে। নকশাল আন্দোলের কল্যাণে শ্রীকাকু-

লাম আজ বহুখ্যাত স্থান। নকশাল আন্দোলনের রীতিপদ্ধতি আমার নিকট দুর্বোধ্য। ওদের ভয়ে ভয়ে যখন ষাট টাকা ফিসের ডাক্তার চার টাকা নিয়েই রোগী দেখেন, কাজে ফাঁকি দেনে-ওয়ালা সরকারী কর্মচারীরা ঠিক সময়ে আসেন যান তখন ভাল লাগে। কিন্তু যখন ওরা বিদ্যাসাগর আশুতোষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন তখন দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হই। আর পুলিশ ও বিরোধীদের যখন খতম করেন তখন ভীত হই। জানি ভয় পাপ। তবু ভীত হয়েছি বীভৎসতা দেখে। অহিংসার সাধনা ভিন্ন মানুষের সত্যিকার কোন মঙ্গল হতে পারে না এই সত্যে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। হিংসা মানুষের ধর্ম হতে পারে না, ওটা পশুর ধর্ম। শক্তিধর মানুষেরা সাধারণত এই কথাটা বিশ্বাস করেন না। শক্তি তো আর কেবল গায়ের জোর বা বোমা বন্দুক মাত্র নয়। সমাজে সঙ্ঘশক্তি, অর্থশক্তি, বুদ্ধিশক্তি সর্বোপরি ঐশীশক্তিও ক্রিয়াশীল রয়েছে। এগুলি সম্মিলিত না হয়ে যদি পরস্পর সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করে তা হলে ধ্বংস ছাড়া, আর কি হতে পারে? বর্তমান সময়ে অহিংসার শ্রেষ্ঠ সাধক মহাত্মা গান্ধী। তাঁর কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বহুবিদিত নয়। তিনি বলেছেন—
"মানবজাতিকে তরবারির বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। আপনারা দেখিবেন যে সকল স্থান হইতে পশু বলে জগৎ শাসন নীতির উদ্ভব সেই সকল স্থানের প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়।"

শ্রীকাকুলামের পর ভিজিয়ানাগ্রাম। স্থানীয় লোকেরা বলেন—বিজয়-নগরম্। এখানে রেলের লোক এসে দুপুরে যারা ভাত খাবেন তাঁদের একটা করে রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে গেলেন। খাবার মিলবে ওয়াল-টেয়ারে। আমিষ ভোজন মূল্য* জনপ্রতি দুই টাকা সত্তর পয়সা। খাবারের দাম ২'১০ পয়সা, পৌঁছে দেবার মজুরী '৫০ পয়সা এবং বিক্রয়

কর ·১০ পয়সা : মোট ২·৭০ পয়সা। আপনার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে বিনিময়ে যে খাবারটা পাওয়া গেল তা কেমন। দু চামচে ভাত (সে ভাতে আমার পেট ভরেনি), একটু জলীয় ডাল, খানিকটা কাঁচাকলার তরকারী, তুলসী পাতার মত এক টুকরো পাঁপর ভাজা, এক টিপ চাটনি, ঝোল সহ চার টুকরো মাংস ও এক চামচে দই। সে দই এতই টক যে বাঙালীর মুখে রোচে না; আমাদের ঝোলায় চিনি ছিল আর ছিল পেটে ক্ষিধে, তাই ওটার সদ্ব্যবহার করতে আটকায়নি।

যদি কোন কারণে মিলের অর্ডার দিতে ভুলে গিয়ে থাকেন তাতেও কোন অসুবিধা হবে না। ওয়ালটেয়ারে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। রেঁস্তোরায় গিয়ে সহজে খেয়ে আসতে পারবেন। বাড়তি মিল অনেক সময় ফেরিও করে।

ওয়ালটেয়ার স্টেশনটি পাহাড়ের কোলে। প্রথম নজরেই চোখে ধরে। ওয়ালটেয়ারকে বলা হয় চির বসন্তের দেশ। এ নাম যে তার সার্থক তা গাড়িতে বসেই অনুভব করা যায়। শহরে প্রবেশের আগেই অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় পথের দুধারেই উঁচু নিচু পাহাড়— কখনো একেবারে হাতের নাগালে, কখনো বা একটু দূরে। বেশ লাগে এই ছবি আর পাহাড়ের লুকোচুরি খেলা।

ওয়ালটেয়ার ডাব পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা সেগুলিকে ডাব বলি না। বলি ঝুমড়ো নারকেল। বেশ পুরু শাঁস আছে প্রত্যেক-টিতে। জল খেয়ে নারকেলটি এঁরা ফেলে দেন না, সেটিরও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনটিতে যেতে মূল পথ ছেড়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। আবার এই পথে পিছু হটে মূল পথের সঙ্গে মিলন ঘটে। ফলে গাড়ির যাত্রামুখ যায় বদলে। এতক্ষণ আমাদের বগিখানা ছিল ইঞ্জিনের ঠিক পেছনেই, এবার হলো শেষ কামরা। ওয়েলটেয়ারের অল্প পরে

একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমেছিল। নাম সীমাচলম। নতুন রাজ্য অরুণাচলের বোন বলেই মনে হয় না কি? এখানেও মন্দির আছে। বহু লোকে তীর্থ করতে গিয়ে থাকেন। এই স্টেশন থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় কলাওয়ালা এসে গাড়ির মধ্যেই হামলা শুরু করে দিল। চাঁপা কলা কিন্তু বেশ বড় বড়। রঙের বাহার আছে। সস্তাও খুব। টাকায় ষোলটা। সুধীরদা এক টাকার কিনে ফেল্লেন। এক টাকা বা আট আনার কলা প্রায় সকলেই নিলেন। সস্তা বলেই হয়তো কেনা।

কাশীতে সস্তা কেনার একটা মজাদার গল্প শুনেছিলাম। সেখানে মাছের দাম কলকাতার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। কলকাতা থেকে বাঙালীরা এসে সস্তা পেয়ে যেখানে আধ কেজি কিনলে চলে সেখানে ড্যাম চীপ বলে—দু কেজিই হয়তো কিনে ফেলেন। মাছওয়ালারা এঁদের অজ্ঞতার সুযোগে বাজার দরের চেয়ে কিছু বেশি আদায় করে নেয়। মেছুনীদের মুখে 'ড্যাম চীপ' কথাটি হয়েছে ড্যামচি। আর এই রকম খরিদ্দাররা হয়েছেন ড্যামচি বাবু!

বিকেলেও চা পাওয়া গেল না। চায়ের বড় আকাল এ দেশে। জনৈক সহযাত্রী বল্লেন 'রাজমণ্ডিতে' খোঁজ করলে ভাল চা পাবেন। খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু চা পাইনি। পাওয়া গেল ফুলের মালা। দক্ষিণে নারীর পুষ্পপ্রীতি বহুবিদিত। মালিকাবিহীন বেণী বিরল দর্শন। তবু খাদ্য পানীয়ের সঙ্গে প্লাটফর্মে ফুলের মালা ফিরি ব্যাপারটা বুঝে নিতে সময় লাগে। চা পান বিড়ি সিগারেটের মত ফুলও অপরিহার্য বিবেচিত না হলে রেল স্টেশনের যাত্রী গাড়ীর জানালায় তার শুভাগমন ঘটত না। ফুল যাদের জীবনে এমনই অপরিহার্য সে মানুষগুলিও যে ফুলের মত সুন্দর হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

রাজামহেন্দ্রীর পরেই বিখ্যাত তীর্থ নদী গোদাবরী। প্রতিটি হিন্দু হৃদয়ে গোদাবরীর একটি শ্রদ্ধার স্থান রয়েছে। প্রশস্ত নদী কিন্তু চরা পড়েছে মধ্যস্থলে। নৌকা চলাচল করছে। সন্ধ্যা সমাসন্ন।

তবুও ঘাটে বহু সুবেশী নরনারী, শিশুকে দেখা গেল। স্থানীয় কোন উৎসবে এঁরা সমবেত হয়েছেন বলেই অনুমান করি। তীর্থযাত্রী হলে শিশুর সংখ্যা এত বেশি কিছুতেই হতে পারত না। শান্ত স্নিগ্ধতার আমেজটুকু আমরা চলমান গাড়িতে বসেই অনুভব করতে পেরেছি।

পরবর্তী ছোট্ট স্টেশন থেকে বুকে যিশু খ্রীষ্ট ও মাতা মেরীর ছবি ঝুলিয়ে একটি বালক ভিক্ষুক উঠল। সে নীরবে হাত বাড়িয়ে যাত্রীদের সামনে দাঁড়ায়, মুখ ফুটে কিছু চায় না। চেহারা তার ভিক্ষুকের মত কিন্তু আচরণে পার্থক্য বিস্তর। যিশুর ছবি গলায় ঝোলানো ভিক্ষুক কলকাতায় নেই। ভিখারি নাকি একেবারেই নেই পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবী আর নেপালীরা ভিক্ষা করে না।

বেজওয়াদায় এসে রাতের খাবার পাওয়া গেল। খাদ্যে দক্ষিণী স্বাদ আরও বেড়েছে। বেজওয়াদা ছাড়তেই কৃষ্ণা নদী। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। শব্দে বুঝতে পারি সেতু পার হচ্ছি। অন্ধকার দেখতে দেখতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল পরদিন ভোরে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি মাদ্রাজ স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াবে। একটানা প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা চলে নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমাদের গাড়িখানা মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছে গেল।

মাদ্রাজ

ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি। কিন্তু রাজপথে তখন যাত্রী বাস-এর যাতায়াত সুরু হয়েছে, যাত্রীসংখ্যাও তাতে বেশ। রেল মজুর ও রিকশাওয়ালার জুলুম এখানে কিছু মাত্র কম নয়। ভাষার অসুবিধার জন্য একজন সহযাত্রী একটি মজুর ঠিক করে দিলেন। গাড়ি থেকে সুটকেস ও বিছানা রিকশায় তুলে দিতে মজুরী ঠিক হলো দেড় টাকা। রেলের নির্ধারিত পারিশ্রমিক পঞ্চাশ পয়সা। পথে বেরোতেই কোন একটা হোটেলের একজন বাঙালী

দালাল আমাদের পাকড়াও করলেন। তাঁর বেশবাস ও কথা বলবার ধরণ-ধারণই কেমন গ্রাম্য। তাঁকে তাই বাতিল করে দেওয়া হলো। জনৈক স্থানীয় মজুরের সঙ্গে সুধীরদা আশ্রয়ের সন্ধানে গেলেন, আমি মালপত্র নিয়ে ফুটপাথে বসে রইলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পছন্দমত আশ্রয় ঠিক করে সুধীরদা ফিরে এলেন। স্টেশনের কাছেই কানডান লজে আমরা উঠলাম। এখানে শুধু থাকার ব্যবস্থা। এদিকে অধিকাংশ স্থলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা পৃথক। দুই শয্যার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ স্নান ও শৌচাগার সহ কামরার দৈনিক ভাড়া দশ টাকা।

গতকাল গাড়িতে কাকস্নান হয়েছে। সেখানে একই খুপরিকে শৌচাগার আর স্নানাগার রূপে ব্যবহার করতে হয়। স্বভাবের দোষে দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যবহারযোগ্য রেখে বহুজনেই ফেরেন না। গান্ধীজি দিব্যদৃষ্টিতে আমাদের চরিত্র দর্শন করে বলেছিলেন—"আপনি যদি গাড়ির শৌচাগার সযত্নে ব্যবহার করেন তা হলে সকলেই খুশি হবেন। অমনোযোগের সঙ্গে ব্যবহার করার সময় আপনি পরবর্তী যাত্রীদের কথা খেয়াল করেন না।" রেলের সর্বভারতীয় সময় পঞ্জীতে কথাগুলি মুদ্রিত হয়েছে। ফল পেতে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। যাই হোক হোটেলে ধারা স্নানের দৌলতে দীর্ঘ রেল ভ্রমণের ক্লান্তি ও কাকস্নানের কষ্ট নিমিষেই দূর হয়ে গেল।

মেঘ-মেদুর আকাশ নিয়েই মাদ্রাজ এসেছি। অল্প পরেই ঝির ঝির বর্ষা শুরু হলো। কিন্তু এ বর্ষার স্বাদ আলাদা। রোদ বৃষ্টির মাখামাখি চলছে সর্বক্ষণ। এটাকে বলে ফিরতি মৌসুমী হাওয়ার বর্ষা। কিন্তু বাংলায় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বর্ষার জলে যেমন ধান রোয়া চলে এখানে এই সময় সর্বত্র তদ্রূপ ধান রুইতে দেখেছি।

বেরোবার মুখেই ঝুপ করে আচমকা বৃষ্টিটা এসে পড়ল। আমরা হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে বসতে বাধ্য হলাম। কলকাতা থাকতেই

শুনেছিলাম তামিলনাড়ুর শাসক দল দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাঘাম অর্থাৎ দ্রাবিড়ের অগ্রগামী দল ভেঙ্গে অপর একটি আন্না ডি. এম. কে দল হয়েছে। তা নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জুতও হচ্ছে বেশ। কলকাতার ছেলেরা ডি. এম. কের মানে করেছে—ডি = ধরো', এম = মারো, ও কে = কাটো, অর্থাৎ ধরো-মারো-কাটোর দল। সত্যিকার মারামারি কাটা-কাটিটার চেহারা জানতে চাইলে হোটেল ম্যানেজার বল্লেন —নাথিং; এভরিথিং নর্মাল। কিছুই না, সবই স্বাভাবিক। কি বুঝবেন আপনি? খবরের কাগজে বড় বড় খবর, আর ম্যানেজার বলেন কিনা নাথিং, এভরিথিং নর্মাল। যাই হোক, বোঝা গেল মাদ্রাজ শহরে সমস্যা গুরুতর কিছু নয়। দু'দিন ছিলাম, কোথায়ও গোলামালের সামান্যতম আভাস এই শহরে দেখিনি।

দিল্লী থেকে আমাদের অন্যতম সহযাত্রী অধ্যাপক মোহনলাল মিত্রের আজই দিল্লী-মাদ্রাজ জি টি আর এক্সপ্রেসে আসবার কথা। সে গাড়ি পৌঁছোয় দশটায়।

তাঁকে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল সেখানে আমরা উঠিনি। অতএব স্টেশনেই তার সঙ্গে দেখা করার দরকার। তাই সকালের দিকে আমরা দূরে কোথায়ও গেলাম না। কাছাকাছি একটু ঘোরাঘুরি করে স্টেশনে এসে বসলাম। সেন্ট্রাল স্টেশনে দোতলার ভোজনালয়ে ভাল চা পাওয়া যায়। বারান্দায় বসলে শহরটিকে চমৎকার দেখায়। সামনে যানবহুল রাস্তা। তারপর কয়েকটি বাড়ি। বাস, আর কিছু দেখা যায় না। মনে হয় অল্প দূরেই চোখের সামনেই যেন শহরটি হারিয়ে গেছে।

মোহনদা ঠিক সময়ে এলেন। তাঁকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধাই হলো না। দুপুরের খাওয়া সারলাম রেলের আমিষ ভোজনালয়ে। রাত্রেও এখানে খেয়েছিলাম; তাই দক্ষিণী খাবারের ভয়াবহ আস্বাদ আমাদের জন্য তোলা রইল।

বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছে গেলাম ৩৫নং মাউন্ট রোডে ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট দপ্তরে। এটাই শহরের প্রধান সড়ক। দর্শনীয় স্থানাদি সম্পর্কে কিছু কাগজপত্র পেলাম। কর্মীরা মুখে মুখে কিছু খবরও দিলেন। এখান থেকেই জেনেছিলাম ট্যুরিস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ও তামিলনাড়ু সরকারের ট্যুরিস্ট বিভাগের বাস নিত্য কাঞ্চীপুরম্, পক্ষীতীর্থম্ ও মহাবলীপুরমে যাতায়াত করে। মাদ্রাজ শহরও ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যাবস্থা আছে। ট্যুরিস্ট ডেভলেপমেন্ট করর্পোরেশনের ভাড়াটা একটু বেশি। মাদ্রাজ শহর দেখার ভাড়া ছ'টাকা আর কাঞ্চী, পক্ষীতীর্থম্ ও মহাবলীপুরমের ভাড়া ষোল টাকা। মাদ্রাজ সরকারের বাসে ভাড়া মাত্র বার টাকা।

টাকার রসিদ ও অন্যান্য খবরাখবর দিলেন জনৈক মহিলা কর্মী। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ও সৌজন্যশীল ব্যবহারের দ্বারা তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। সামান্য কথাবার্তার মধ্যেই মহিলাটির বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পেতেও বিলম্ব হলো না। তাই সাহস করে রাজাজির খোঁজ-খবর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ঠিকানা সংগ্রহ করে দিলেন। টেলিফোনে যোগাযোগ করার অনুমতিও পেলাম। আজ বিকেল সাড়ে তিনটেয় রাজাজির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করা গেল হাতে আমাদের ঘন্টা খানেক সময়। শুনে মিলে যে সব বাসের নম্বর জোগাড় করেছি তার একটারও দেখা নেই। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আধঘন্টা কেটে গেল। আর দেরি না করে একটা ট্যাক্সি ধরে নানা পথ ঘুরে রাজাজির বহুল প্রচারিত 'কল্কি' পত্রিকা আপিসে পৌঁছোলাম ঠিক সাড়ে তিনটায়। পথে নানা জনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে। ট্যাক্সি চালক তো বটেই, বহু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ রাজাজি নিবাসের খোঁজ রাখেন না।

কল্কি' আপিসের বাড়ীতে রাজাজি এখন থাকেন না। তিনি পাশের রাস্তার একটি বাড়িতে উঠে গেছেন। [illegible] মিনিটের মধ্যে

আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। কল্কির কর্মী সদালাপী মিষ্টভাষী মুরলীধরবাবু এখন রাজাজির সেক্রেটারী। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাদের রাজাজির কক্ষে নিয়ে হাজির করলেন।

বাড়িটি বেশ বড়। বাইরে পুলিশ পাহারা রয়েছে। ঢুকেই ডানহাতে একটি ছোটখাটো পুলিশ ঘাটি। সেটি অতিক্রম করলে একটি হল ঘর। তারই বাঁ হাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কক্ষে রাজাজি শোয়া-বসা লেখা-পড়া সবই করেন। সেই ঘরেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। চারিদিকে কয়েকটি বইয়ের আলমারি রয়েছে। ছোট একটি খাটে তিনি বসেছিলেন। তার উপর অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা ও বই ছড়ানো। পাশে কয়েকটি চেয়ার টেবিল আছে।

আমরা সকলেই রাজাজির পায়ে হাতে দিয়ে প্রণাম করলাম। এটি মাদ্রাজী শিষ্টাচার নয়। তবু তিনি সহাস্যে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। কানে তখন কম শোনেন এবং শরীরও খুব ভাল যাচ্ছে না তাই মিনিট পাঁচেকের বেশি আমরা কথাবার্তা বলিনি। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে মৃদু হেসে বল্লেন—My health is keeping pace with the conditions of the country—আমার স্বাস্থ্য দেশের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলছে। দেশের ক্রমবর্ধমান অবনতির প্রতি যে ইঙ্গিত করছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আসবার সময় ডান হাতটা ঊর্ধ্বে তুলে বলেছিলেন—See that West Bengal is not given to Chinees, দেখো পশ্চিম বাংলা চীনাদের যেন দিয়ে দেওয়া না হয়। রাজাজি এ আশঙ্কার কথা লিখেও প্রকাশ করেছেন। তাঁর আশঙ্কার কারণ, পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। মধ্যে একসময় তো আমাদের অনেকের মনেও অনুরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

রাজাজির সাধারণ স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালই মনে হলো। চেহারায় উজ্জ্বলতা যেন বেড়েছে। প্রায় বিশ বছর পরে তাঁকে দেখলাম। সেই বিখ্যাত কালো চশমা জোড়া চোখে ছিল না। সামান্য ন্যুব্জ হলেও

স্বাভাবিকভাবে খাটের উপর বসেই তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ফিরবার পথে মুরলীধরবাবু খানিকটা পথ এগিয়ে দিলেন। কথায় কথায় তিনি জানালেন, এই ডিসেম্বরে (১৯৭২) রাজাজির বয়স ৯৪ বৎসর পূর্ণ হবে। তিনি শতায়ু হোন এই প্রার্থনা নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

মাদ্রাজের গভর্ণর হাউসের নাম এখন রাজাজি হল। জীবন্ত মানুষের নামে প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে বিরল নয়। কলকাতায় বাসন্তী দেবী কলেজ, লক্ষ্ণৌ-এর এ. পি. সেন রোড, বোম্বাইয়ের নরীম্যান ও গান্ধীমার্গ প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে মনে আসে। সাধারণ মানুষের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকে বলেই এমন নামকরণ গৃহীত হয়। ইতর বিশেষ হলে উপেক্ষিত তো হয়ই, হাসি ঠাট্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রাজাজির বাড়ি যেতে এন. এস. সি. বোস রোড নামে একটা রাস্তা আমরা অতিক্রম করেছিলাম। নামটা বাঙালীর—অথচ এন. এস. সি. বোস যে কে তা কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। হঠাৎ খেয়াল হল এন. এস. সি. মানে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র। এমন অস্বাভাবিক সংক্ষেপ করার ফলে নামটির মাধুর্য এবং উপযোগিতা উভয়ই আমাদের কাছে কমে যায়।

হাতে আমাদের এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় আছে। তার মধ্যে আর্ট কলেজ ও মিউজিয়ম দেখতে হবে। পাঁচটার সময় এগুলি বন্ধ হয়ে যায়। শুক্রবার বন্ধ থাকে। রাজাজির বাড়ী থেকে তাই সোজা আমরা মিউজিয়মে গেলাম (প্যানথিয়ন রোড)। সকাল সাতটায় এটি খোলে। তাই আমাদের সূচিতে ছিল সকাল আটটায় এখানে আসব। এখান থেকে যাব ফোর্টের যাদুঘরে। সেটি খোলে বেলা ন'টায়। তারপর পার্থসারথিমন্দির ও অন্য ব্যবস্থা। কিন্তু সকালটা আমরা পুরো কাজে লাগাতে পারিনি বলে মাদ্রাজের কিছু কিছু দর্শনীয় স্থান ছেড়ে দিতে হল।

শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এই যাদুঘরটির প্রশংসা শুনেছি বহুজনের মুখে। অমরাবতী বৌদ্ধস্তূপ থেকে সংগৃহীত দ্বিতীয় শতাব্দীর ভাস্কর্য এবং ব্রোঞ্জ মূর্তির গ্যালারিটির জন্যই যে কেবল সুখ্যাতি তা নয়। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, দিনাজপুর, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বাংলার নানা স্থানের প্রাচীন ভাস্কর্য এখানে সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হয়েছে। স্বভাবতঃ আমাদের বাঙালী মন এতে একটু বেশি উল্লসিত হয়েছিল। কার প্রেরণায় এগুলি এখানে স্থান পেয়েছে জানি না। তবে মনে পড়ল একদা দীর্ঘকাল দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এই আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অনেক ক্ষোদিত সর্প মূর্তি। একটিতে অবিকল মনসার চালচিত্র। দুটি ভগ্ন কালী মূর্তিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি মূর্তির মুকুটের আকার ছিল করোটি।

লিপির বিবর্তন আমরা তেমন বুঝি না, তবে ভাল লাগে দেখতে। মহেনজোদাড়োর সীলমোহর, গয়নাগাটি, মৃৎপাত্রাদি ও জপমালা ইত্যাদি দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হবেন সকলেই। মহেনজোদাড়োর নামের সঙ্গে যে দুটি নাম অক্ষয় হয়ে আছে তা হল জন মার্শাল ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙালী হিসেবে রাখালদাসের জন্য কিঞ্চিৎ গর্ব হয় বৈ কি!

যাদুঘরে অন্যান্য বহু দর্শনীয়ের মধ্যে মুদ্রার মাধ্যমে ভারতের ইতিহাস, মূল ও প্রতিলিপিতে ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ও বহুবিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের এমন সুন্দর সংগ্রহ সুলভ নয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখবার মত আরও বিস্তর ও বিচিত্র জিনিসের সমাবেশ ঘটেছে। সুন্দরভাবে সেগুলি সাজান গোছান এবং সযত্নরক্ষিত। গোটা প্রদর্শনটি ভাল করে দেখা এক-আধদিনের কাজ নয়। নীচু তলার কর্মীরাও এখানে সৌজন্যশীল কিন্তু পয়সার প্রত্যাশী। মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারি কোথায়ও কোন প্রবেশ মূল্য নেই। মিউজিয়ামের পাশেই আর্ট গ্যালারি। কিন্তু

সময়ের অভাবে আমাদের দেখা হল না। শুনেছি এখানকার নটরাজের মূর্তি ভুবন বিখ্যাত। মিউজিয়মে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার আছে।

সূর্যালোক থাকতে থাকতে সমুদ্র দর্শন করা চাই। তাই আমরা সোজা চলে গেলাম সমুদ্র তীরে। পথে পড়ল পাবলিক হেলথ লাইব্রেরী। ভারতবর্ষের আর কোন শহরে একমাত্র জনস্বাস্থ্য বিষয়ে গ্রন্থাগার আছে বলে শুনিনি। মিউজিয়মের কাছ থেকেই বাস সমুদ্র-তীরে যায়। বাস থেকে সমুদ্র কিনার বেশ খানিকটা দূর। বিরক্তিকর বালু ভেঙে অনেকটা পথ গেলে তবে জলের দেখা পাওয়া যায়। বালির উপরেই সুবেশা নরনারী ইতস্ততঃ ছড়িয়ে বসে আছেন। শিশুরা ছুটো-পুটি করছে। স্ত্রী-পুরুষ দোকানিরা নানা পসরা সাজিয়ে বসেছেন। কফি, বাদাম, খেলনা, খাবার, কড়ি, শঙ্খ সব পাওয়া যায়, এমন কি ঝালমুড়িও। একটা ফুলের দোকানও দেখা গেল। আপনি ইচ্ছে করলে নামমাত্র মূল্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার শখ মেটাতে পারেন। জিন দেওয়া ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে ভাড়া দেবার জন্য মালিকেরা এখানে ঘোরা ফেরা করেন।

এখানে এই বালুময় বেলাভূমিতেই জনসভাদি অনুষ্ঠিত হয়। একটি স্থায়ী মঞ্চ সেজন্য নির্মিত হয়েছে। মাইক্রোফোন বসাবার পাকা পোষ্টও আছে। এইসব যন্ত্র থেকে অন্য সময়ে সঙ্গীতের সুর ভ্রমণকারীদের তৃপ্ত করে।

সমুদ্র এখানে আকর্ষক মনে হয়নি। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত। সেজন্য মাদ্রাজের মানুষের গর্ব খুব। সবটুকু দেখার অবকাশ হল না। সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

পরের দিন সকালে সাতটায় হাইকোর্টের পেছনে এক্সপ্রেস বাস গুমটি থেকে আমাদের বাস ছাড়বে। জায়গাটার একটু হদিস্ করে যাব ঠিক করেছিলাম। বৃষ্টি এসে গেল বলে তা আর হল না। বাসে করে সরাসরি হোটেলে ফিরে এলাম।

স্নানাদি সেরে ৬টার মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এক্সপ্রেস বাস গুমটির উদ্দেশ্যে। সকাল থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কখন প্রবল, কখন বা ঝিরঝির, বর্ষণ চলছে তো চলছেই। এইরকম বিরামহীন বর্ষণ এখানে কদাচিৎ ঘটে। হোটেল থেকে খবর নিয়ে জেনেছিলাম হাইকোর্ট বেশি দূরে নয়, হেঁটেই যাওয়া চলে। বাসও আছে অনেক।

মাদ্রাজের পথঘাট আমাদের চেনা নয়। তাই বাসে যাব বলে ঠিক করলাম। বাস নম্বর ও রাস্তার নিশানা পেতে কিন্তু আমরা হিমসিম খেয়ে গেলাম। তিনজন পথচারী আমাদের তিন রকম নির্দেশ করলেন। শেষ পর্যন্ত মোহনদা জনৈক ভিখারীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক পথ এবং বাসের খবর পান। অনেকের ধারণা মাদ্রাজে কিছু লোক আছেন যারা অন্য রাজ্যের নবাগতদের এইভাবে দুর্ভোগ দিয়ে আনন্দবোধ করেন। আমার ধারণা ভাষা বিভ্রাটের ফলে এরা আমাদের কথাবার্তা ঠিকমত বুঝতে পারেন না। আর তার জন্যই বিভ্রান্তিকর নির্দেশ দেন।

দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র ভাষা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। তামিলনাড়ু, কেরলা, অন্ধ্র ও মহীশূর যথাক্রমে তামিল, মালায়ালম, তেলেগু এবং কানাড়ী ভাষাভাষী রাজ্য। এ ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তর বা পূর্ব ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এরা হিন্দীর ঘোর বিরোধী। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা তামিল। অন্য ভাষাগুলিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ইংরেজি বহুজনে জানেন। কিন্তু একটি বিদেশী ভাষা কখনই দেশের আপামর জনসাধারণ শিখতে পারেন না। দুশো বছর ধরে ইংরেজি পড়ে শতকরা দশ পনের বা বড় জোর বিশ জন মানুষ হয়তো এই ভাষাটি জানবার সুযোগ পেয়েছেন। অবশিষ্ট আশি শতাংশ মানুষের তো মাতৃভাষাই সম্বল। সে ভাষার এক বর্ণও উত্তর অথবা পূর্ব ভারতের মানুষের বোধগম্য হয় না। এই অসুবিধার প্রতিকারকল্পে বিনোবাজি ভারতবর্ষের সকল ভাষা দেবনাগরী অক্ষরে লিখবার উপদেশ দিয়েছেন। সর্বসেবা সংঘ এ বিষয়ে উদ্যোগীও হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের

সর্বোদয় মণ্ডল "সর্বোদয়" নামে দেবনাগরী অক্ষরে একটি বাংলা সাপ্তাহিক বেশ কিছুদিন ধরে প্রকাশ করেন। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অনুরূপ আয়োজন হচ্ছে বলে জেনেছি।

বন্ধুবর বিধুভূষণ দাসগুপ্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা শেখার বই রচনা করেছেন। এগুলি পরিণত বয়সের মানুষের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। মাদ্রাজ স্টেশনের বইয়ের দোকানে ত্রিশ দিনে তামিল ও তেলেগু শেখার বই দেখেছি। এ বই পড়ে কাজ চালাবার মত জ্ঞান অর্জন করতে বেশ সময় লাগে। ভ্রমণকারীর সচরাচর প্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যগুলির তর্জমা রোমান অথবা দেবনাগরী অক্ষরে দিলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে কাজ চালান সম্ভব হয়। খাদ্য ও পানীয়ের নাম, নমস্কার ইত্যাদি শিষ্টাচারের প্রতিশব্দ, জামা কাপড় প্রভৃতি পোশাক পরিচ্ছদ এবং নিত্যব্যবহার্য নানা দ্রব্যের ইংরেজি ও স্থানীয় নামের তালিকার সঙ্গে কয়েকটি বাক্যের তর্জমা থাকলেই কাজ চলবে মনে হয়। কোন ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি এ কাজটি করলে ভ্রমণকারীদের বিশেষ সুবিধা হবে।

অসুবিধা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট পূর্বে আমরা বাসগুমটিতে পৌঁছে গেলাম। হাতে একটু সময় ছিল তাই ঘুরে ঘুরে হাইকোর্ট ও লাইট হাউসটি দেখে নিলাম। একেবারেই অর্থহীন এ দেখা। একটা বড় বাড়া দেখলাম এইমাত্র। পঁচিশ পয়সা দক্ষিণা দিলে লাইট হাউসের মাথায় চড়ে শহর ও সমুদ্র দেখবার সুযোগ মেলে।

বাসে কয়েকজন বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। তার মধ্যে একজন মোহনদার ছাত্র। তিনি মোহনদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আজকের ছাত্রদের কত দুর্নাম শুনি। তারা দুর্বিনীত শ্রদ্ধাহীন উচ্ছৃঙ্খল অমনোযোগী ইত্যাদি ভূরি পরিমাণ অভিযোগ। এই-রকম খবরে সংবাদপত্র ভরা থাকে। হাজার হাজার শ্রদ্ধাশীল বিনয়ী নীরব ছাত্রদের কথা আমরা মনে না রেখে ওদের কথাই বেশি করে

বলি। আজকের শিক্ষার এটাই, অর্থাৎ এই বিকৃত দৃষ্টিই হল সব চেয়ে বড় গলদ।

কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় বাসটি ছাড়ল। কিন্তু ট্যুরিস্ট ব্যুরোর আপিসে এসে অনেকক্ষণ দেরি হল। সরকারী গাইড মশায় আসতে দেরি করার জন্যই এই বিভ্রাট। বাসটি সেন্ট টমাস পাহাড়ের নিকট আসতেই গাইড ভদ্রলোক মুখ খুলেন। যথাবিধি সৌজন্য সহকারে এখাকার খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক সংস্থা এবং ঐতিহাসিক গীর্জার কথা জানালেন। যিশুর দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম সাধু টমাস নাকি প্রথম শতকে এখান থেকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে গেছেন। তিনি আরও জানালেন কোন গোঁড়া হিন্দু তাঁকে হত্যা করেছিল। এ কথাটির তাৎপর্য আমার নিকট দুর্বোধ্য। বাক্যটি না বল্লে ক্ষতি ছিল না। শুধু বলা যেত তিনি নিহত হন। ভারতবর্ষে ধর্ম প্রচারের জন্য হত্যার ঘটনা একান্তই বিরল। ধর্মের নামে সারা পৃথিবীতে বিস্তর হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। ভারতীয় হিন্দুই সবচেয়ে কম রক্তপাত ঘটিয়েছেন তাঁর ধর্মের জন্য। বহু গীর্জা হিন্দুর প্রদত্ত জমিতে ও অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে। মহীশূরের একটি প্রধান গীর্জার ভিত্তিশিলা স্থাপন করেছিলেন সেখানকার হিন্দু রাজা। এই তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে বিবেকানন্দ কম্বু কণ্ঠে বলেছিলেন—"ভারতে কেবল হিন্দুরা খ্রীষ্টানদের জন্য চার্চ ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এইরূপই করিতে হইবে।"

পথে ডি. এম. কে দলের সদর কার্যালয় দেখে এসেছি। ভবন শীর্ষে দলীয় প্রতীক (পাহাড়ের মধ্যে উদীয়মান সূর্য) অঙ্কিত এবং লাল ও কালো রঙের মিশ্রণে তৈরী পতাকা শোভিত। এই পতাকার লাল ও কালো অংশ আড়াআড়ি ভাবে জোড়া। কিন্তু খানিকটা পথ যেতেই পতাকার আকার বদলে গেল। লাল ও কালো অংশ এখন লম্বালম্বি জোড়া। একজন বল্লেন ওটা আন্না ডি. এম. কে দলের পতাকা। কিন্তু

সে সম্পর্কে মুখ খুলতে চাইলেন না কেউ। ডি. এম. কে হোক, আর আন্না ডি. এম. কে হোক ভয় তাদের সকলকেই। বর্ণ হিন্দুরা এদের কারো, পরে নির্ভর করতে পারেন না। দলের বাইরে সকলেই নাকি নত ও নীরব হয়ে আছেন সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায়।

কাঞ্চিপুরম্

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা কাঞ্চিপুরম্ পৌঁছে গেলাম। কাঞ্চিপুরমকে সংক্ষেপে কাঞ্চি বলা হয়। উত্তর ভারতে কাশীধামের ন্যায় দক্ষিণে কাঞ্চি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দুতীর্থ। মাদ্রাজ শহর থেকে ৭৭ কিলোমিটার। সুন্দর ও আনন্দদায়ক পথ। রেলেও আসা যায়। গাইড জানালেন শিব ও বিষ্ণু মন্দির মিলে এখানে ১২৪টি মন্দির আছে। ভ্রমণ পরিচালক ভদ্রলোকের মতে এত অল্প পরিসরে এত বেশি মন্দির ভারতের কোথায়ও নেই। শহরটির আয়তন ১১ বর্গ কিলোমিটার। সরকারী ভ্রমণ পরিচালকের দাবি মেনে নেওয়া যায় না। ভুবনেশ্বরকে সহস্র মন্দিরের নগর বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধ-মানের এরুয়ার গ্রামেই শতাধিক মন্দির আছে, অবশ্য ক্ষুদ্রকায়।

শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত। যে দিকে শিবমন্দির তাকে বলা হয় শিব কাঞ্চি। আর বিষ্ণুমন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিষ্ণু কাঞ্চি। বর্ষায় ভিজে ভিজে আমরা মন্দির ও দেবতা দর্শন করলাম। সময় কম, সর্বত্র যাওয়ার সুযোগ নেই। এখানে বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—একমবারেশ্বর, কৈলাসনাথ, শ্রীবরদারাজা, বৈকুণ্ঠ পেরুমল ও শ্রী কামাক্ষী মন্দির। বৌদ্ধ যুগের আগে আমাদের দেশে শিল্প ও ভাস্কর্য সমৃদ্ধ বৃহৎ মন্দির ছিল না, বিগ্রহও তেমন ছিল না। প্রধান মন্দিরগুলি সবই অনুমিত হয় বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মিত। পরে শ্রীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সময় এই সব মন্দিরে নানা দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই মন্দিরগুলির

অধিকাংশ দেড় দু' হাজার বছরের পুরাতন। দক্ষ স্থপতি, ভাস্কর ও কারিগর মিলে মিশে সারা জীবন ধরে অনন্য নিষ্ঠা আর ধৈর্যের সঙ্গে নিষ্প্রাণ পাথরকে কুঁরে কুঁরে তিলে তিলে তিলোত্তমা সৃষ্টি করে গেছেন। কেবল সৃষ্টি নয়, অপূর্ব রূপ ও সৌন্দর্য বোধের পরিচয় রেখে গেছেন তাদের স্থাপনায়। অনেক মন্দির আছে যেগুলি একাধিক পুরুষ ধরে নির্মিত হয়েছে।

ঘণ্টা মিনিট বোনাস আর ওভারটাইমের হিসাবে বাঁধা আজকের মানুষকে দিয়ে আর যাই হোক পাথর খোদাই করে মন্দির আর মূর্তি গড়া সম্ভবপর হবে না। জীবনে বৈষয়িক উন্নতির কথা ভুলতে হবে, ভুলে যেতে হবে দিনরাত্রির হিসাব—এক কথায় নিজের সৃষ্টির মধ্যে আত্মলোপ যিনি করতে সমর্থ হবেন তিনিই পারবেন তুচ্ছ পাথরকে দেবতা করে তুলতে। মূক শিলাখণ্ড একমাত্র তাঁর হাতেই মুখর হয়ে উঠতে পারে। এক দেড় হাজার বছর আগেকার মানুষেরা গড়েছিলেন এই সব মন্দির ও দেবতা—অথচ তাঁরা আজ সম্পূর্ণ বিস্মৃত। স্বীয় সৃষ্টির আনন্দে তাঁরা এতই বিভোর থাকতেন যে পার্থিব অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন চেতনাই তাঁদের ছিল না। সেই সব অজানা সাধকদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে আমরা প্রথমে একমবারেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করলাম।

এ মন্দিরে পাথর শুধু নয়ন ভোলায় না, কথাও বলে। তাদের ভাষা আমাদের জানা নেই, তাই মুগ্ধ চোখের দেখা দেখেই ফিরে এলাম। মূল মন্দিরের প্রবেশ পথের বাড়িটিকে গোপুরম্ বলে। আমাদের দেশে নহবৎখানা যেমন হয়। এ মন্দিরের গোপুরমটি (এ দেশে 'ম' বর্ণটি নানা শব্দের শেষে জুড়ে দেওয়া হয়) ১৮৮ ফুট উঁচু। একতলা বাড়ি ১০ বা ১০॥ ফুট হয়। সেই হিসাবে এটি আঠারো তলা বাড়ির সমান। কলকাতায় তের তলা বাড়ি দেখেই আমরা বিস্মিত হতাম। গোপুরমকে টাওয়ার বলাই বোধ হয় ঠিক।

মন্দিরে প্রবেশ মূল্য দশ পয়সা। পূজার ফি নিম্নরূপঃ দীপ

অভ্যর্থনা—ত্রিশ পয়সা ; অষ্টত্তরম পঁচাত্তর পয়সা ; সহস্রনাম দুই টাকা এবং রুদ্রম দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। আসল ব্যাপারটা কি তা বুঝতে পারি নি। এর পরেও পুরোহিত ঠাকুরকে পয়সা দিতে হয়, যদিও তার বাধ্যবাধকতা নেই। পূজা উপকরণ সামান্য এবং পদ্ধতিও সরল। তালপাতার টুকরিতে একটি বা দুটি ঝুনো নারকেল আর সামান্য ধূপ ইত্যাদি পূজোপকরণ এক টাকা থেকে দু টাকার মধ্যে কিনতে পাওয়া যায়। ফি জমা দেবার রসিদ সহ এই টুকরিটি পুরোহিতের হাতে দিলে তিনি দাঁড়িয়েই নামটি জেনে নিয়ে অবোধ্য মন্ত্র পড়েন। পরে দেবতার সামনে নারকেলটি ভেঙ্গে একটুকরো শাঁস প্রসাদরূপে ফেরত দেন। এই হল পূজা। এতে আমরা তৃপ্ত হই না। কিন্তু অন্য উপায় নেই। ভিড়ের চাপে আপনাকে এগিয়ে যেতেই হবে। সময়ও সীমিত।

এ দেশে মূল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামে মন্দিরের নাম হয়। কিন্তু প্রাঙ্গণে নানা গৃহে বিস্তর দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এক-মবারেশ্বর হলেন শিব। কিন্তু দুর্গা, গণেশ, নটরাজ, প্রভৃতি অনেকেই এইখানে বিরাজ করছেন। সরকারী বিবরণ অনুসারে মন্দিরটি পল্লভেরা নির্মাণ করান। পরে বিজয়নগরের রাজা ও চোলগণ কর্তৃক সংস্কৃত হয়। মূল মন্দিরটি যথেষ্ট বড়। তাছাড়া আছে পাঁচটি পৃথক বাড়ি এবং সহস্র স্তম্ভের হল ঘর বা মণ্ডপ।

এই মন্দিরে দেবী দুর্গা চতুর্ভুজা। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি একটি সাধারণ গৃহে স্থিতা। মহাবলীপুরমে, মহীশূরে ও আরও কয়েকটি স্থানে আমরা মা দুর্গার মূর্তি দেখেছি। এ মূর্তির সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পুত্রকন্যা পরিবৃতা বঙ্গজননী দশভূজার কোন মিল নেই। তবু দুর্গা দেখলে আমরা একটু বেশি তৃপ্ত ও পুলকিত হই। শান্ত শিব ও অশান্ত নটরাজ উভয়েই এখানে পূজিত হন। এইখানেই বোধ করি দেখেছিলাম বলিবামনের সুবিশাল মূর্তি।

এ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি মন্দিরে দেবদেবীর জল-বিহারের জন্য

একটি করে পুকুর আছে। বাংলায় প্রতিমা বিসর্জনের পূর্বে নৌকা বা লরীতে করে যেমন ঘোরানো হয় এও প্রায় সেই রকম। তবে এঁরা উৎসব শেষে বিসর্জন না দিয়ে বিগ্রহকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যান, এই যা পার্থক্য। মূল বিগ্রহ কিন্তু নাড়াচাড়া করা হয় না। এই সব কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট একটি প্রতিরূপ বিগ্রহ তৈরী করে নেওয়া হয়েছে।

· এতবড় মন্দির দেখতে সময় পাওয়া গেল মাত্র আধ ঘণ্টা। তাই সর্বত্র চোখ বুলিয়েই ফিরে আসতে হল। কোথায় যেন পড়েছিলাম, এখানে আচার্য শঙ্করের দেহ সমাধিস্থ রয়েছে। কেদারতীর্থও শঙ্করের সমাধির দাবিদার। সেটা আর দেখবার অবকাশ হল না। দেখিয়ে দেবার কোন লোক নেই। সঙ্গের সরকারী গাইড বাস থেকে নামেন নি। আচার্য শঙ্কর একটি বিস্ময়কর নাম। ভ্রমণকথা বিশারদ শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী তাঁর রম্যাণি বীক্ষ্য বইয়ের কেরল পর্বে এ বিষয়ে সংক্ষেপে সুন্দর লিখেছেন—

"বিশ্বের অদ্বিতীয় দার্শনিক শঙ্করাচার্যের জন্ম হয়েছিল এই গ্রামে (কেরলার কালাডি)।...বিখ্যাত নাম্বুদ্রি কুলে তাঁর জন্ম হয়েছিল।... আট বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে নর্মদা তীরে গোবিন্দচার্যের কাছে দর্শনাদি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল কাশীধামে বাস করেন ও পরে বদ্রীনারায়ণ চলে যান। ষোল বছর বয়সে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা শেষ হয়ে যায়...বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের চাপে সনাতন হিন্দুধর্ম তখন পর্যুদস্ত। সেই সঙ্কটের দিনে আচার্য শঙ্কর তাঁর অলৌকিক প্রতিভাবলে সর্বশূন্যবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ মত খণ্ডন করে হিন্দুধর্মকে তার স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।...এই বিশাল ভারতে শঙ্করাচার্য চারটি মঠ স্থাপন করেন। উত্তরে হিমালয়ে বদরীনাথের পথে যোশী মঠ, দক্ষিণ মহিশূর রাজ্যে তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী মঠ, পূর্বে বঙ্গোপসাগর তীরে পুরীতে গোবর্ধন মঠ, আর পশ্চিমে আরব সাগর তীরে দ্বারকার

সারদা মঠ।···লোকে বলে বত্রিশ কিংবা আটত্রিশ বছর বয়সে হিমালয় পার হয়ে তিনি কৈলাসে গিয়েছিলেন শিবের দর্শনে, আর ফেরেন নি।”

শঙ্করাচার্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে আমরা বিষ্ণুকাঞ্চির পথ ধরলাম। কাঞ্চি খুব পুরনো শহর। হিন্দু ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম এটি। পল্লভ ও চোল রাজাদের রাজধানী ছিল এইখানে। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে পল্লভেরা বহু সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। কেবল মন্দির নয়, রেশম শিল্পের জন্যও এর খ্যাতি প্রচুর। বর্তমান জনসংখ্যা লক্ষাধিক। রাস্তাগুলি খুবই প্রশস্ত। পূর্বে নাকি আরও বেশি চওড়া ছিল। কালক্রমে মানুষ একটু একটু করে দখল করে নিজের সীমানা বাড়িয়ে নিয়েছে, রাস্তা হয়েছে সঙ্কুচিত। রামানুজের স্মৃতির সঙ্গেও কাঞ্চি জড়িয়ে আছে। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ চাণক্যের জন্মভূমি বলেও এই শহরটিকে নির্দেশ করা হয়। বাংলা থেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যে এখানে এসেছিলেন তা তো শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই লেখা আছে।

একমবারেশ্বর মন্দির থেকে বেরিয়ে আমাদের বাস দাঁড়াল একটি কাপড়ের দোকানের সামনে। শ্রীনিবাস এণ্ড কোং। আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল ভ্রমণকারীদের জন্য টাকায় দশ পয়সা বিশেষ রিবেট দেয় এই দোকানী। পছন্দমত কাপড় কিনলে ভি. পি. করে পাঠায়। ট্রাভেলার্স চেক নেয়। ইত্যাদি। দোকনটি প্রধান বাজারের বাইরে। বড় বাজারে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় না, তার কারণ সেখানে একবার ঢুকলে যাত্রীরা বেরিয়ে আসতে অস্বাভাবিক দেরি করেন। সবাই প্রায় নেমে গেলেন। কিন্তু দু'চারজন ছাড়া বিশেষ কাউকে কিছু কিনে নিয়ে আসতে দেখা গেল না। একটি বাঙালী মহিলা মন্তব্য করলেন কলকাতার চেয়ে দাম বেশি।

এখন চা পানের বিরতি। বেশ একটি বড়সড় দোকানের সামনে এসে বাসটি থামল। দোকানের একাংশ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। দোসা

বড়া আর কফি দিয়ে আমাদের সৎকার করা হল। এ খাদ্যে আমরা অনভ্যস্ত। তবু কিছু খেতে হল। চা পানের পর আমরা বরদারাজা বিষ্ণু মন্দির দেখতে গেলাম।

বরদারাজা মন্দির বিজয়নগরের রাজাদের কীর্তি বলে দাবি করা হয়। ভ্রমণ-পরিচালক বল্লেন, অনেকে মনে করেন এটি বুদ্ধ মন্দির ছিল। হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের পূজার্চনা গ্রহণ করেই এই বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরের বাইরে একটি শিল্পসমৃদ্ধ মণ্ডপে শ্রীবিষ্ণুর কূর্মমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাথরের মূর্তি। এই মণ্ডপের কার্ণিশ পাথর কেটে তৈরী শিকলে শোভিত ছিল। এখনও কয়েকখণ্ড দৃষ্টি গোচর হয়। বিস্ময়কর কীর্তি বটে।

মূল মন্দিরের সামনে গরুড় ও স্বর্ণ স্তম্ভ রয়েছে! শিবপুরবাসিনী জনৈকা প্রৌঢ়া যাত্রী অবাক হয়ে জিজ্ঞসা করলেন—এত সোনা পেল কোথায়? তখন তিন শ' টাকা করে সোনার ভরি! এতদিন ধরে এতসোনা এখানে রয়েছে অথচ চুরি চামারি হয় নি, লুঠপাট করে নেয়নি এটাও তাঁর বিস্ময়ের অন্যতম কারণ। উচ্চকণ্ঠে তিনি সে কথা সঙ্গীদের জানালেন। যাদের উদ্দেশ্যে বলা তাঁরা বিব্রত হলেন কিন্তু কিছু বল্লেন না। বাংলায় কথা। অতএব এখানকার কেউ এটা বুঝতে পারছিলেন না ভেবে আমরা যেন স্বস্তি বোধ করেছিলাম। মোহনদা তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা বলে মহিলাটির বিস্ময় যে স্বাভাবিক তা বোঝাতে চাইলেন।

মন্দির দেখার জন্য সময় ছিল আধ ঘন্টা। এখানেও দর্শনী দিয়ে ঢুকতে হয়। দর্শনার্থীকে যে পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয় সেখান থেকে দেবতার অবস্থান বেশ দূরে। স্তিমিত দীপালোকে দেবতা দর্শন করা যায় না। মধ্যে মধ্যে কর্পূর জ্বেলে আরতি করা হচ্ছে। একাজটি পূজার অঙ্গ। প্রত্যেকটি যাত্রীর পুজোপকরণের মধ্যে খানিকটা কর্পূর থাকে। এই রকম এক আরতির মুহূর্তে এক পলক দেখে নিলাম।

প্রবেশ পথে ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ-হিন্দুদের মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমাদের সহযাত্রিণী একটী সপ্তদশী ইংরেজ-কন্যা বিজ্ঞপ্তিটি পড়ে মুখটি কালো করে ফিরে গেলেন। আমার মনটি বিষণ্ণ হল। কি এর তাৎপর্য জানি না। তবে মন্দির অভ্যন্তরে ভক্তজনের প্রবেশাধিকার থাকা সমীচীন, ত তিনি যে ধর্মের মানুষ হোন না কেন। বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ল—"যদি ম্লেচ্ছেরা আমার মন্দিরে ঢুকে আমার প্রতিমা অপবিত্র করে, তোর তাতে কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি।" এর তাৎপর্য আমরা স্বীকার করিনি। ইংরেজ-নন্দিনী ছাত্রী। তিন মাসের ছুটিতে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে এসেছেন। মন্দির দেখাই তাঁর বিশেষ লক্ষ্য। এই বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি জানবার আশা নিয়ে উপাযাচক হয়ে আলাপ করেছিলাম। পণ্ডিচেরি, মাদুরা, রামেশ্বরম্, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি নানা স্থানে পরে আমাদের দেখাশুনা হয়েছে। মন্দির পরিক্রমার সময় নগ্ন পদেই তিনি চলেন। অতি সাধারণ পোশাক, এক কাঁধে ঝোলা, অন্য কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে নগ্নপদে জল কাদার মধ্যে আমাদের সঙ্গে সমান তালেই তিনি চলতেন। দেখা হলেই স্মিতহাস্যে সম্বর্ধনা জানাতেন। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশের বাধা-নিষেধ সম্পর্কে তিনি কোন আলোচনা করতে চান নি। দুইটি মাত্র শব্দে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—কোয়াইট ন্যাচরাল, খুবই স্বাভাবিক। হৃদয়ে পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকলে এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে করতে আমার মনে পড়েছিল নিবেদিতা, অ্যানি বেসান্ত আর ব্লাভাটস্কির কথা। এই মেয়েটির সঙ্গে আমার জীবনে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবু তাঁর ভারতপ্রীতি, ঔদার্য ও প্রচলিত রীতিনীতি বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা আমাকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি চিরকাল আমার স্মরণে ভাস্বর হয়েই থাকবেন।

আর একটি ছোট্ট চঞ্চল মেয়ের কথা অনেকদিন মনে থাকবে। বছর আড়াই মাত্র তার বয়স। নাম অর্চনা। সে বাংলা হিন্দী ওড়িয়া তিনটি ভাষায় অনর্গল কথা বলে আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছিল। মা তার ওড়িয়া, বাবা পুরুলিয়ার হিন্দীভাষী। থাকে জামসেদপুর লোহা কারখানার কলোনিতে। সেখানে জনৈকা বাঙালী প্রতিবেশিনী মেয়েটির পাতনো ঠাকুরমা। এই মেয়েটির কলকণ্ঠ আমাদের বাস-যাত্রার ক্লান্ত মুহূর্তগুলির শ্রান্তি অপনোদনের সহায়ক হয়েছিল। ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশান!

পক্ষীতীর্থ

কাঞ্চি ছেড়ে আমরা এলাম পক্ষীতীর্থে। রাজপথে মাদ্রাজ থেকে দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। স্থানটির আসল নাম লোকে আর বলে না। পক্ষীতীর্থ নামেই এর খ্যাতি সমধিক। পাহাড়টির নাম হল বেদাগরি। গ্রামের নাম তিরুকালিকুন্দ্রম। তিরুকুলুকুনরম লেখাও দেখেছি। অর্থ—পবিত্র পাখির পাহাড়। বৃষ্টির জন্য বাস তার নির্দিষ্ট গতিবেগে চলতে পারে নি। ফলে পাখি আসার সময় পেরিয়ে যাবার পরে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। মন্দির কর্মচারীরা জানালেন "তাড়াতাড়ি উঠে যান, ভাগ্যে থাকলে পাখি দেখতে পাবেন। পাখি ভগবান এখনো এসে পৌঁছোন নি।" পাখিরও বৃষ্টির জন্য দেরি হওয়া বিচিত্র নয়!

বাসে থাকতেই গাইড বলে দিয়েছিলেন, পাহাড় ও তার মন্দিরের ইতিকথা। সাবধান করে দিলেন—দুর্বল যাত্রীকে। খাড়া সিঁড়ি ভেঙ্গে পাঁচশ ফুট পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার ধকল তাদের সইবে না। একবার চেষ্টা করে দেখবার জন্য পনের পয়সার টিকিট কিনে আমরা সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম। ভয় ছিল সুধীরদাকে নিয়ে। ভদ্রলোক সত্তর পেরিয়েছেন। এমনিতে সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও বাতে

মধ্যে মধ্যে কষ্ট পান। অশক্ত লোকের জন্য ডুলি আছে। জনপ্রতি ভাড়া ৪ টাকা ২৫ পয়সা। সুধীরদা এ সুযোগ নিতে রাজি হন নি।

কষ্ট হয়েছিল তবুও প্রায় ৪০ তলা বাড়ির সমান উঁচু এই পাহাড়ে তিনি চড়েছিলেন এবং সে জন্য পরে যন্ত্রণা ভোগ করেন নি। কোন কাজে আসক্তি জন্মালে কষ্ট দূর হয়ে যায়, আনন্দ হলে কঠিনতা লোপ পায়। সিঁড়িগুলি এমন করে সাজানো যে মনে হয় ওপরের দৃশ্যমান ধাপগুলি অতিক্রম করতে পারলেই ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছে যাব। সেখানে গিয়ে দেখা যায় আমরা একটি বাঁকে এসে পৌছেছি মাত্র, লক্ষ্য আরও দূরে। তখন মনে হয়, এতদূর এসে ফিরে যাব ?—এত লোক যাচ্ছে, ওরা যখন পারেন তখন আমিই বা পারব না কেন ? আবার চলা শুরু হয়। এই রকম হাতছানি দিয়ে ডাক দেওয়া সিঁড়ি প্রায় সব মন্দিরে। ত্রিচিনপল্লীর রক টেম্পল বা শ্রাবণবেলগোলায় গোমতেশ্বর এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে।

পর্বত শীর্ষে হর-পার্বতীর ছোট্ট একটি বিশেষত্ব-বর্জিত মন্দির। পুরোহিতরা সকলেই নাকি অ-ব্রাহ্মণ। পূজার আয়োজন উপাচার খুবই সামান্য। পূজার পর প্রতিদিন এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে দুটো চিল জাতীয় পাখি এসে পুরোহিতের হাত থেকে প্রসাদ খেয়ে যায়। পাখি দুটি আসে, প্রসাদও খায়। কিন্তু এর পেছনে যে পৌরাণিক কাহিনী বা কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়েছে তা আজকাল বড় একটা কেউ বিশ্বাস করতে চান না। কথিত আছে সূর্য স্পর্শ করার অভিসারে বেরিয়ে জটায়ু ও সম্পাতি স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে ভ্রষ্টাচারের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছেন এই পক্ষীযুগল। প্রতিদিন রামেশ্বরম্ আর কাশীর মধ্যে যাতায়াত করেন। অবিশ্বাসীরা বলেন—শেখানো পাখি। সরকারী পক্ষীশালা বেদাণ্ডঙ্গল তো কাছেই ? আবার কেউ বলেন—আফিং-এর মৌতাত ধরিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ওদের এখানে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দানিকেন সাহেব এ সংবাদ শুনলে হয়ত বলতে বসবেন

ঘটনাটি গ্রহান্তরের। কোন বিস্মৃত ব্যাপারের স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে, আমরা এর প্রকৃত বা সত্য অর্থ উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ বলে নানা জনে নানান কথা বলছি।

আবহাওয়া খারাপ থাকায় আজ পাখি ভগবান এলেন না। খাবার জায়গাটিতে প্রশাদ তখনও রয়েছে। ওপর থেকে গ্রামটিকে দেখে যে আনন্দ পাওয়া গেল, পাখি না আসার দুঃখ তার চেয়ে বেশি মনে হয় নি। পাহাড়, তেঁতুলগাছের জটলা, দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত নারকেল, তাল আর সবুজ ধানে ভরা মাঠের মধ্যে লাল টালির কুটিরগুলি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়।

নামতে তেমন কষ্ট নেই। তবে বর্ষার জন্য সতর্ক হয়ে চলতে হল —পা পিছ্‌লে না যায়। খাড়াই যেখানে বেশি সে স্থানটিতে সরাসরি নিচের দিকে তাকালে পা'টা টলে যেতে পারে। মোড়ে মোড়ে যথারীতি ভিক্ষুক আছে। নিচেয় একটি মাত্র ফলের দোকান দেখা গেল। কলা আপেল আর মোসাম্বী পাওয়া যায়। দাম বাজার দরের অন্যূন দ্বিগুণ, তবু লোকে নির্বিচারে কিনছেন। একজন কয়েকটি ঢুমডো নারকেল নিয়ে বসেছেন। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কচি বেছে নিতে চেষ্টা করে ঠকে গেলাম।

মহাবলীপুরম্

এবার মহাবলীপুরম্। মাদ্রাজ থেকে সোজা পথে এলে মাত্র ৬০ কিলোমিটার। রেলগাড়িতেও আসা যায়। নামতে হয় চিঙ্গেলপুট স্টেশনে। সেখান থেকে যাত্রীবাস্ ধরে আসতে হয়। সমুদ্রতীরে ছোট্ট গঞ্জ মত জায়গা। হাজার দুই মাত্র লোকের বাস এখন। কিন্তু অতীতে এর সমৃদ্ধির কাহিনী স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে দূর দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

মামাল্লাপুর বন্দর নামে তখন এটি পরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে

পহ্লব রাজাদের অন্যতর প্রধান বাণিজ্য বন্দর এই মামাল্লাপুরে দেশবিদেশের বাণিজ্য তরীও আসত।

মন্দিরাদি দেখতে যাবার আগে আমরা একটি নিরামিষ ভোজনাগারে মাধ্যাহ্নিক আহারাদি সেরে নিলাম। দক্ষিণী ভাত ডাল দই। এ খাদ্য আমাদের রুচিকর হল না। টক ও তরকারী দিয়ে রান্না ডালকে এঁরা সম্বর বলেন। আমাদের টকের সম্বরার সঙ্গে এর কোন যোগ আছে কিনা না তাও জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। যাহোক ক্ষুন্নিবৃত্তি করে উঠে পড়া গেল।

মহাবলীপুরমে সাধারণতঃ কেউ রাত্রিবাস করেন না। মাদ্রাজ থেকে এসে দেখে চলে যান। যারা থাকেন, তাঁরা প্রায়ই বিদেশী মানুষ। সেজন্য থাকবার ভাল ব্যবস্থা আছে, দক্ষিণার হারটিও বেশ চড়া। ট্যুরিস্ট ডেভলেপমেন্ট কর্পোরেশনের কুটীরটি একেবারে সমুদ্র কিনারে। এর কৌলীণ্য বেশি। এছাড়া আছে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ার সরকারী ইনস্‌পেকশন বাংলো। পিকনিক করতে এখানে ভিড় জমে প্রায়ই। প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে মনোরম এই জনবিরল সমুদ্রতীর চড়ুইভাতির উপযুক্ত জায়গা বটে!

সমুদ্র এখানে শান্ত। এই শান্ত সমুদ্রগর্ভে মহাবলীপুবমের প্রাচীন বন্দরটি লুপ্ত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বিলীন হয়েছে অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত ছটি মন্দির। চলতি ভাষায় একে শোর-টেম্পল বলে অভিহিত করা হয়। একটি মন্দির এখনও অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। পূজা অর্চনার কোন ব্যবস্থা নেই। মন্দিরে বিগ্রহও কিছু নেই। তবে মন্দির গাত্রের ভাস্কর্য আপনাকে অবশ্যই মুগ্ধ করবে।

খানিকটা দূরে রয়েছে আস্ত একটা পাহাড় কেটে কুটে খোদাই করে তৈরি তুসারি ঘর। এর গঠন-বৈচিত্র্য আকার-আকৃতি পৃথক। প্রথম ঘরটি বাংলার চারচালা ঘরের অনুরূপ। এটি নিরাভরণ। মনে হয় সম্পূর্ণ করার আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবু স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ভরা।

অন্যগুলি যথেষ্ট কারুকার্য মণ্ডিত এবং আকারে বড়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এগুলি সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। বৌদ্ধ বিহারের প্রভাব সুস্পষ্ট। বর্তমানে এ-গুলিকে বলা হয় পাণ্ডব রথ। পঞ্চ পাণ্ডবের জন্য চারখানি, এবং দ্রৌপদীর একখানা। নকুল ও সহদেবের জন একটি গৃহ নির্দিষ্ট হয়েছে। পাশেই বিশাল ঐরাবত। সবই একটা পাহাড় কেটে করা। প্রাঙ্গণটিও খুব পরিচ্ছন্ন।

সরকারী ভাষ্যকার বলেন—মহাভারতের নায়কদের নামে এখন চিহ্নিত হলেও আদিতে তা ছিল না। দূর অতীতের কোন শিল্পী-সমাজ আপন খেয়ালে বা শিল্প সাধনার অঙ্গরূপে সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে এগুলি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালের মানুষ উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক যোগ সাধনের, আজকালকার ভাষায় ন্যাশনাল ইন্‌টিগ্রেশনের, উপায় হিসাবে পাণ্ডবদের নামে ও-গুলির নামকরণ করে থাকবেন। সত্য মিথ্যা যাই হোক, সরকারী ভাষ্যকারের বক্তব্য আমার ভাল লাগেনি। এই প্রচারের পিছনে মানসিকতাটি ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছে।

এখান থেকে আমরা গেলাম ভুবন বিখ্যাত অর্জুন তপস্যা দেখতে। পথে পড়ল সরকারী স্কাল্পচার ট্রেনিং সেণ্টার। ভারতের আর কোন রাজ্যে বোধ হয় এমন স্কুল নেই। ভাস্কর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মহাবলীপুরমকে কে নির্বাচন করেছিলেন জানি না—তবু সেই অজানা ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধা জানালাম। ঐ স্কুলের জন্য এর চেয়ে ভাল কোন কেন্দ্র হতে পারে না।

পাহাড়ের অসমান দেহকে চেঁচে-ছুলে কেটে-কুটে সমান করে নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বেস রিলিফ ছবি খোদাই করা হয়েছে এখানে। অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রের জন্য তপস্যা, হিমালয় থেকে গঙ্গাবতরণ, পঞ্চ-তন্ত্রের গল্প ইত্যাদি বিচিত্র সব ভাস্কর্য। দেব-দৈত্য-দানব নর-নারী পশু-পক্ষী সবই আছে এখানে। এটি ২৭ মিটার দীর্ঘ এবং নয় মিটার চওড়া।

তপস্যাজীর্ণ ঊর্ধ্ববাহু অর্জুনের পাঁজরার হাড়গুলো পর্যন্ত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে রসের যোগানও রয়েছে। ভাল করে দেখলে দেখতে পাবেন, একটি বিড়ালও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই থেকে বোধ করি বিড়াল-তপস্বী কথাটার উদ্ভব হয়ে থাকবে। আমাদের কর্ম জীবেনে পশুর ভূমিকা অনস্বীকার্য বলে ধর্মজীবনেও তাদের স্থান হয়েছে। আনন্দের আধাররূপেও তারা স্বীকৃত। আলোচ্য পর্বত দেওয়াল ভাস্কর্যে পশুপক্ষীর উপস্থিতি বেমানান হয়নি। সেগুলি বহুক্ষেত্রে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে।

প্রথম দর্শনে সবৎসা একটি বিশাল হস্তিনী যে কোন জনের দৃষ্টি কেঁড়ে নেবে। একেবারে নিরেট, শিল্পরুচিহীন মানুষকেও এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবেই। আর আছে সিংহ, বাঘ, হরিণ, গাধা বা ঘোড়া, বানর, ময়ূর ও অন্য কিছু পাখি এবং ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি। সব ছবিগুলিই জীবন্ত। এই ছবিটিকে বিশেষজ্ঞেরা গঙ্গাবতারণের ছবি বলে চিহ্নিত করছেন। তপস্যারত ঊর্ধ্ববাহু ব্যক্তি অর্জুন নন,ভগীরথ দ্বিধা বিভক্ত পাহাড়টিকে নদীর মত দেখতে।

খাজুরহো ও ওড়িশার অনেক মন্দির গাত্রে কাম ছবির ছড়াছড়ি! এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এটিকে দ্রাবিড় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে দাবি করা হয়ে থাকে। শিল্পী দ্রাবিড় হলেও মূর্তিগুলির মধ্যে আর্যাবর্তের মানুষের রূপ ফুটে উঠেছে বলেই মনে হয়। দ্রাবিড় শিল্পী তার সমাজের মানুষের মূর্তি গড়লেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি।

গুহা মন্দিরকে মণ্ডপ বলা হয়। পাহাড়ের গায়ে পোর্টিকোর মত করে কাটা ঘর। এই রকম গোটা দশেক মণ্ডপ আছে। এর শিল্পকলাও অপূর্ব। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণ ছবিটির সামনেই রয়েছে একটি বড় গাভী। জনৈক ব্যক্তি নিশ্চিন্তে দোহনকার্য করছেন। জন-জীবনের আরও কত ছবি ফুটে উঠেছে এখানে। কত শত শত বছর।

কেটে গেছে কিন্তু ছবিগুলির আবেদন হ্রাস পায়নি। শিল্প কাজও অক্ষত আছে।

মহিষাসুর-মর্দিনী গুহাটির প্রতি বাঙ্গালীরা বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে থাকেন। দেবী এখানে সিংহারূঢ়া অষ্টভূজা এবং অসুর-বধ কার্যে নিরতা। সে কি দৃপ্ত ভঙ্গী! দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঁধা সময়ে কতটুকু আর দেখা যায়। এক-আধ-দিন নয়, বহুদিন ধরে প্রত্যহ দেখলে তবে এর সত্য স্বরূপ জানা যেতে পারে। যতই দেখা যাক না কেন, এ কোন দিন পুরনো হবে না, শিল্প ও সৌন্দর্য প্রেমিক মানুষ কোনদিন ক্লান্তি বোধ করবেন না। বরাহ গুহাটিও চমৎকার। বরাহ ও বামন অবতারের ছবির সঙ্গে আরও কিছু দেব দেবী রয়েছেন এখানে। রাজা মাহেন্দ্র বর্মনের মূর্তিও স্থান পেয়েছে এই গুহায়। এখানে ছোট একটি যাদুঘর আছে। কিন্তু কখন খোলা থাকে তা জানা গেল না। একটি লোকও নেই তার ত্রিসীমানায়। যাদুঘরের সামনে খোলা পাহাড়ের বুকে একখানা বৃহৎ গোলাকার পাথর কাত হয়ে আছে। দেখলেই মনে হবে এই বুঝি পড়ল। কিন্তু শত শত বৎসর ও-খানা এমনি ভাবেই রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মাখন গোলা।

এবার ফেরার পালা। আকাশ এখন অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। সমুদ্রকিনার দিয়ে সড়ক ধরে আমরা ফিরেছিলাম। শান্ত সমুদ্র। তবু তার আহ্বান কানে বাজে। ইচ্ছে করে কাছে যাই। না, সব ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। শুধু চেয়ে দেখা। মধ্যে মধ্যে সযত্ন রচিত ঝাউবন দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। সমুদ্র তীরে একেবারে জলের ধারে কয়েকখানা করে কুটীর ছাড়া জন বসতির আর কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না।

যাবার সময় গিয়েছিলাম মাউণ্ট রোড ধরে, ফিরলাম সমুদ্র কিনারের পথ সাউথ বীচ রোড বরাবর। কুসুমিত পুষ্পবীথিকার বর্ণাঢ্যতার সঙ্গে আনন্দিত মানুষের অকারণ পুলকে চঞ্চল এই সমৃদ্ধ অঞ্চলটি মাদ্রাজ

শহরের গৌরব। এই পথে ভারতীয় জন নেতাদের সঙ্গে ইংরেজদের অনেক মূর্তি আছে। তামিলনাডু সরকার নির্বিচারে ইংরেজদের মূর্তিগুলি সব অপসারণ না করে ইতিহাসের প্রতি সুবিচারই করেছেন বলতে হবে! ইতিহাসকে বিকৃত করা অন্যায়। বিকৃত ইতিহাসকে মগজধোলাই বলে। চীন ইতিমধ্যে তার ইতিহাস তিনবার তিন রকম করে লিখেছে। রাসিয়ায় লেখা হয়েছে দুই বার। এগুলি ইতিহাসের বিকৃতি এবং ইতিহাসের শিক্ষার পরিপন্থী। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে অস্বীকার করলে কিংবা অপারক হলে জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। গৌরব এবং সমৃদ্ধি বঞ্চিত হয়ে সে জাতি জীবন ধারনের গ্লানি বয়ে চলতে থাকে মাত্র।

শহরে ঢুকবার মুখে আডিয়ার। এখানে মাদাম হেলেনা পেট্রনভা ব্লাভাট্‌স্কীর বিশ্ব থিওসফিকাল সোসাইটির সদর দপ্তর। যাত্রীরা ইচ্ছে করলে এখানে নেমে পড়তে পারেন। তবে শহরে ফিরবার ব্যবস্থাটা সে ক্ষেত্রে নিজেদেরই করতে হয়। যাত্রী বাস পাওয়া যায়। অন্যান্য যানবাহনও আছে। ফিরতে কোন অসুবিধা হয় না।

কথিত আছে মাদাম ব্লাভাট্‌স্কী তাঁর গুরু জনৈক তিব্বতীয় সাধুর নির্দেশে আডিয়ারে থিওসফিকাল সোসাইটির মূল কেন্দ্র স্থাপন করেন। অনেকে বলেন এই স্থানটি বিশ্বের কেন্দ্র স্থল বলে মাদাম এখানে কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। থিওসফিকাল সোসাইটি অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চার কেন্দ্র। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ ধর্ম প্রচার করে নি। সব মানুষ তার নিজের নিজের ধর্ম যথাযথ ভাবে অনুসরণ করুন—এই ছিল সংস্থার মূল সাধনা। থিওসফি এক সময় শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে বেশ প্রসারলাভ করেছিল, কিন্তু স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায় নি। আডিয়ারের প্রতি আমার আকর্ষণ থিওসফির জন্য নয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যাশনাল কনফারেন্সই প্রথম সর্বভারতীয় রাজনীতিক সম্মেলন। এটা যাদের ভাল লাগে নি বা এর

গুরুত্ব যারা অনুধাবন করতে পারেন নি তাদের দ্বারাই এই আডিয়ারে জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হয়েছিল। ভারত সভার (Indian Association) আন্দোলনের ফলে বঙ্গদেশে জন-জাগরণ ঘটেছিল। কংগ্রেস স্থাপনের দ্বারা জন আন্দোলন নূতন মোড় নেয়। এই কংগ্রেসের আন্দোলনে জনশক্তির কোন ভূমিকা থাকে না। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবর্গের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত সুফল থেকে জাতি বঞ্চিত হয়। এ. ও. হিউম কর্তৃক কংগ্রেস স্থাপনের ফলে জনশক্তির পুনর্জাগরণের জন্য আরও ত্রিশ বৎসরাধিক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

থিওসফিকাল সোসাইটির কেন্দ্র আডিয়ারে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে থিওসফিস্টরা মিলিত হতেন। ১৮৮৪ সনে এদেরই কেউ কেউ মাদ্রাজের দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের বাড়িতে বসে একটি সর্বভারতীয় রাজনীতিক দল গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন। সেই সভায় কলকাতার নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ এবং সি. সি. মিত্রও উপস্থিত ছিলেন। আডিয়ারের এই আলোচনার ফলেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বোম্বাইয়ে ১৮৮৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পণ্ডিচেরি

মাদ্রাজের অনেক দর্শনীয় বস্তুই আমাদের দেখা হয় নি। যে টুকু সামান্য দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার। মহাবলীপুরম্ থেকে ফিরেই আমরা পণ্ডিচেরি রওনা হলাম। পণ্ডিচেরি যাব মীটার গেজের গাড়ি চড়ে। বাসও যায়। গাড়ি ছাড়ে মাদ্রাজ এগমুর ষ্টেশন থেকে। সে ষ্টেশন মাদ্রাজ সেন্ট্রাল থেকে দেড় দুই কিলোমিটার দূরে। ট্যাক্সীতে ভাড়ার মিটার আছে। কলকাতার মত এখানেও বৃষ্টি বাদলের দিনে বা ভিড়ের সময় ঐ যন্ত্রগুলির কোন দাম নেই। বাড়তি ভাড়া দিতে হয়।

অবস্থাটা বুঝে উঠতে সময় লেগেছিল বলে নাকের সঙ্গে নরুনের মত বাড়তি ভাড়ার সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম।

মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর, তিরুচিরাপল্লী বা ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, পণ্ডিচেরি প্রভৃতি দূর দূর অঞ্চলে রাজ্য সরকারী বাস যাতায়াত করে। এ দিক্‌কার রাস্তাঘাট ভাল এবং বাসগুলি নিয়মিত চলে; গতিও যথেষ্ট। তথাপি ট্রেনে গেলাম এই জন্য যে, সারাদিন ঘোরাঘুরির পর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। এ ব্যবস্থায় শ্রান্তি দূর হয়, দিনের সময় নষ্ট হয় না। পরের দিন সকাল সাতটার কাছাকাছি সময়ে আমরা পণ্ডিচেরি পৌঁছেছিলাম। তখনও টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

আড়াই'শ বছরের ফরাসী শাসনের ক্ষুদ্র ভূখণ্ড পণ্ডিচেরি এখনও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। এটি এখন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। রেল স্টেশনটি অতি সাধারণ। তা দেখে মনেই হয় না যে এই শহরটির আন্তর্জাতিক আকর্ষণ রয়েছে। রিকশাই একমাত্র অভ্যন্তরীণ যান। শহরের মধ্যে ট্যাক্‌সী আছে। তারা গাড়ির সময় স্টেশনে আসে না।

স্টেশন থেকে সরাসরি আমরা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অতিথি অ্যাপায়ন দপ্তরে গেলাম। সেখান থেকে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হল আশ্রমের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। কলকাতার 'শৃণ্বন্তু' পত্রিকার জনৈক বন্ধুজনের একখানা পরিচয় পত্র ছিল আমাদের। সেই সুবাদে সহজেই আশ্রয় পাওয়া গেল। নিউ সুইট হোমের এক তলাতে স্থান পেলাম। নতুন বাড়ি, আশ্রম সংলগ্নই বলা চলে। আশ্রমের কাছাকাছি থাকবার সুবিধাটা যে কত বেশি তা পরে বুঝেছিলাম। খাওয়ার জন্য তো বটেই, অন্যান্য নানা প্রয়োজনে দিনের মধ্যে অনেকবার কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও আশ্রমের অনেক আপিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। আবাসটি দূরে হলে এ ব্যাপারে সময় নষ্ট এবং যাতায়াতের জন্য খরচটাও বেড়ে যায়।

নিউ সুইট হোমের নির্মাণ কাজ তখনও পুরোপুরি শেষ হয় নি। মোজাইক করা হল ঘরের মেজেতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা।

দারোয়ানজী একখানা মাতুর বিছিয়ে দিয়ে আমাদের জায়গাটি নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেখানে তখন আরও জনা ছয়েক যাত্রী। সকলেই বাঙ্গালী। স্নান ও শৌচাগারের সুবন্দোবস্ত আছে। পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর প্রয়াসের সঙ্গে সৌন্দর্যবুদ্ধি যুক্ত হওয়ায় বহু সামান্য জিনিস অসামান্য ও মনোহর মনে হয়েছিল।

কম্যুনিটি কিচেন বা সর্বজনীন রান্নাশালার খাবার খেলাম দুপুরে। সে জন্য আমাদের নিকট আগাম টাকা চাওয়া হয় নি। আশ্রম থেকে একখানা পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছে। সেটিও কেউ দেখতে চাইলেন না। মোট চারখানা ঘরে খাবার আসন পাতা। শ' দেড়েক লোক একত্রে বসে খেতে পারেন। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আহার্য পরিবেশন করা হয়। তাই সকলেই প্রায় এক সঙ্গে খেতে আসেন।

প্রাতঃরাশ পাওয়া যায় পৌনে সাতটা থেকে পৌনে আটটা পর্যন্ত। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সাড়ে এগারটা থেকে সাড়ে বারটা। বিকেলের জলযোগ পৌনে ছ'টা থেকে ছ'টা। সন্ধ্যার খাবার মেলে পৌনে আটটায়। তিন বছরের কম বয়সের শিশু অথবা চাকরদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। এখানে কিছু স্বাবলম্বী ব্যবস্থা আছে। অনেকটা কাজ নিজের হাতে করতে হয়। শিশুদের পক্ষে ঐ কাজ করা সম্ভবপর নয়, আর নিজের হাতে না করে চাকর বাকর দিয়ে কাজটা কেউ করিয়ে নেবেন এটাও অনভিপ্রেত। তাই বোধ করি বহু জনে নিজ নিজ পাত্রে আহার্যটি নিয়ে চলে যান। একাধিক জনের খাবার নিতে বাধা নেই।

শতাধিক ব্যক্তি একত্রে বসে খাচ্ছেন, অথচ হাকাহাকি ডাকাডাকি নেই! কোলাহল কলরব চিৎকার চেচামেচি ছাড়াই এতগুলো মানুষের ভোজন পর্ব সমাধা হতে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। হৃষিকেশ, হরিদ্বার, সেবাগ্রাম প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য স্থানে অনেক সর্বজনীন ভোজন কক্ষ দেখেছি। মোটামুটি একই ব্যবস্থা। কিন্তু এখানকার ব্যবস্থার মধ্যে একটা মর্যাদা মণ্ডিত পার্থক্য

সহজেই অনুভবগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল। শান্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে নীরবে সব কাজ হচ্ছে। ভাত যিনি দিচ্ছেন, তার হাতের কাছে থালা সাজানো রয়েছে। একখানা থালা আপনি হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়ালেই তিনি আপনার প্রয়োজন মত ভাত দেবেন। রুটি চাইলেও পাবেন। এগিয়ে চলুন। পরের পরিবেশক আপনাকে এক বাটি স-তরকারী ডাল দেবেন। পরের জনকে আপনার বলতে হবে দুধ চাই না দই চাই। দই বা দুধের সঙ্গে দুটি কলাও আপনাকে তিনি দেবেন। এক টুকরো লেবু ও একটি চামচের দরকার থাকলে আপনাকে চেয়ে নিতে হবে। এবার চলে আসুন খাবার ঘরে। চেয়ার টেবিল ও ভূমি আসন—দু'রকম ব্যবস্থাই আছে। ভূমি আসনের সামনে ছোট ছোট জলচৌকি পাতা। তার উপর ভাতের থালাখানা রেখে জল নিয়ে আসতে হবে। নিকটেই বড় বড় জলের কুঁজো এবং গ্লাস রাখা আছে।

খাওয়া শেষ হলে পাতের কোলটা কুড়িয়ে বাসনগুলি গুটিয়ে নিন। অতঃপর চলে যান ধৌতাগারে। কলার খোসা ও খাদ্যাবশেষ ফেলবার জন্য পৃথক পাত্র রয়েছে। এই পৃথকীকরণের ফলে কলার খোসাগুলিকে সরাসরি পশু-শালায় পাঠানোর সুবিধা হয়, ও-গুলি পশু খাদ্য রূপে ব্যবহার করা চলে। তারপরেই রয়েছে কতকগুলি জল ভরা চৌবাচ্চা এবং একটি বালতি। চৌবাচ্চাগুলির কোনটিতে থালা, কোনটিতে গ্লাস বাটি এবং বালতিটিতে চামচখানা রেখে মুখ হাত ধোবার কলে চলে যান। এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশন সচরাচর দেখা যায় না। এখানে আশ্রমিক অভ্যাগত ও শিক্ষার্থী মিলে প্রতিদিন নাকি হাজার দুই মানুষকে অন্নাদি পরিবেশ করা হয়। এত লোক দিনে তিনবার করে খাওয়া দাওয়া করছেন তবু কোথায়ও বিন্দুমাত্র নোংরা বা দুর্গন্ধ নেই। আমার নিকট এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। কর্মীরা অধিকাংশ সাধক ও সেবক বলেই এটা সম্ভবপর হয়।

সর্বত্রই আধুনিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্মত বিধিব্যবস্থা। বাসনগুলো ভীম জাতীয় জিনিস দিয়ে প্রথমে ধোওয়া হয়। খাবার ঘরে পাঠানোর আগে নির্দিষ্ট সময় ধরে গরম জলে ফুটিয়ে কর্মীরা সুন্দর করে মুছে দেন। অধিকাংশ কাজকর্ম আশ্রমিকেরাই করেন। নানা বয়সের স্ত্রীপুরুষকে তাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ দেওয়া হয়েছে। দেখলাম প্রত্যেকেই নীরবে, আনন্দচিত্তে ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুচারুরূপেই নির্দিষ্ট কাজ করছেন। আশ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার পূর্ণ দায়িত্ব আশ্রমের।

খুশি মত কেউ আশ্রমে যোগদান করতে পারেন না। কাকে নেওয়া হবে তা শ্রীমাই ঠিক করেন। তিনি এই আশ্রমের সর্বময়ী কর্ত্রী। শ্রীঅরবিন্দ থাকতেই এই কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসে। মা এই আশ্রমে আসবার পূর্বে শ্রী অরবিন্দ সহকর্মীদের সঙ্গে একাসনে বসতেন, একত্রে শয়ন ভোজন করতেন। (এই লেখার সময় মা পার্থিব দেহে বিরাজিতা ছিলেন)। ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আশ্রমে নানা নিয়ম ও স্তরের সৃষ্টি হয়েছে। এখন আশ্রমে কেউ গৃহীত হলে তার সমগ্র পার্থিব সম্পদ্ আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে হয়। আর প্রত্যেক আশ্রমিক ও আশ্রমিকাকে চারটি নিষেধাত্মক বিধি মেনে চলতে হয়। সেগুলি হল :

(১) ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, (২) মদ্যাদি পান করা চলবে না, (৩) রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকতে হবে এবং (৪) যৌন জীবন পরিহার করে চলতে হবে।

দুপুরে খাওয়ার আগে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির সম্পাদক নলিনীকান্ত গুপ্তের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যে ক'জন বাঙ্গালী প্রথম এসেছিলেন ইনি তার অন্যতম। তখন তিনি আশ্রমের দ্বিতীয় ব্যক্তি। বয়সের ভারে দেহ অশক্ত, তবু কাজের চাপ খুব। সেজন্য একটু ক্লান্ত মনে হল। কলকাতার

স্বতন্ত্র পত্রিকার অমলেশ বাবুর কাছ থেকে একটি পরিচয় পত্র নিয়ে এসেছিলাম। কোন কাজ হল না। মায়ের সঙ্গে দেখা করবার ব্যাবস্থা তো দূরে থাক, তিনি আমাদের সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বললেন না, হয়তো কাজের চাপ ছিল বা ছিল অভ্যন্তরীণ কোন ঝামেলা।

শ্রীঅরবিন্দ যে গৃহে জীবনের চল্লিশটা বছর বসবাস করে গেছেন সেই তীর্থগৃহ দর্শন করেছি। এজন্য পূর্বাহ্নে অনুমতি পত্র নিতে হয়। বেলা বারোটার পূর্বে সিঁড়ির নিচেয় আমাদের জামায়েত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বারটার পরেই জনৈক মহিলা এসে আমাদের কার্ডগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে উপরে উঠবার অনুমতি দিলেন। পুরু কার্পেট বিছানো পরিচ্ছন্ন সিঁড়ি দিয়ে আমরা উপরে উঠলাম। সামনেই শ্রীঅরবিন্দের সেই ঐতিহাসিক কক্ষ। সব কিছু পরিপাটি করে গোছানো, ঝকঝকে তকতকে। সাধারণ ছোট একটি ঘর। শ্রীঅরবিন্দের একখানা বিরাট ছবি আছে। পদযুগল প্রসারিত করে কৌচে বসা সেই বিখ্যাত ছবির কৌচটিও রয়েছে। ছোট্ট খাটখানা মধ্যস্থলে পাতা। বিছানাটিও তেমনি আছে। বই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের কয়েকটি আলমারি ভিন্ন আর কোন আসবাবপত্র নেই। সামনের বারান্দাটা ঘেরা। ঘরের ন্যায় ব্যাবহার করা হয়। ওরই বাঁ হাতের ঘরে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের একটি যুগল ছবি আছে। কেউ কেউ সেখানে টাকা পয়সা দিয়ে প্রণাম করছেন। সর্বত্র ফুল ও ধূপের বহুল ব্যবহার সহজেই চোখে পড়ে। এর ফলে সহজেই একটি ভক্তি বিনম্র পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে।

আসবার পথে এই বাড়িরই এক তলায় ধ্যানের ঘরটি দেখলাম। এ ঘরের ছাদটি উজ্জ্বল এলুমিনিয়ম দিয়ে খিলানের আকারে তৈরি করা। এক প্রান্তে অশ্রম-প্রতীক আঁকা একটি কাচের বাক্সের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের একখানা ছবি এমন করে বসানো যে দেখলেই মনে হয়

তিনি বহু দূর থেকে এক মর্মভেদী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের লক্ষ করছেন। পরিবেশের প্রভাবে মনটা আপনা থেকেই মেহাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

নামবার সময় সিঁড়ির একটি বাঁকে 'Cling to Truth"—সত্যে নিষ্ঠ থাক, মায়ের এই বাণীটি আমাদের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। গান্ধীজি বলেছেন সত্যই হল ভগবান্। অতএব মানুষকে সত্যনিষ্ঠ করে তুলতে পারলে তার সব দুঃখকষ্ট দূর হবে, সে ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছে যাবে অন্য কোন সাধনা ব্যতিরেকেই।

এই বাড়িটির প্রাঙ্গনে একটি নিমগাছ তলায় শ্রীঅরবিন্দের নশ্বর দেহ সামাধিস্থ হয়েছিল। তার উপর শ্বেত পাথরের একটি অতি সাধারণ বেদী রচনা করা হয়েছে। কিন্তু দেখতে সেটি খুবই চমৎকার। সারাদিন ধরে এখানে পুষ্পার্ঘ্য দেবার বোধ হয় কোন সরকারী ব্যবস্থা আছে। প্রচুর ফুল, ধূপ ও ভক্ত মানুষের নীরব শ্রদ্ধা জায়গাটি ঘিরে রেখেছে। স্থানটির মাহাত্ম্য সহজেই অনুভূত হয়। আমরা আমাদের নীরব প্রাণামটি রেখে এলাম এই বঙ্গ সন্তানের উদ্দেশ্যে। স্মরণ করলাম তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীকে, দেখা না পেয়েও ষষ্টাঙ্গ হলাম শ্রীমায়ের নিকট।

শ্রীমাধব পণ্ডিত মায়ের দর্শনের ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি জানালেন এ সপ্তাহে আর কোন দর্শন হবে না। মায়ের বয়স হয়েছে। চুরানব্বুই বছর বয়সের কোন মহিলার পক্ষে হাজার হাজার মানুষের সুবিধা মত দর্শন দেওয়া সম্ভব হতে পারে না। তাই দর্শন না পেলেও দুঃখিত হলাম না। তবে আশ্রম কর্তৃপক্ষ লোকবিশেষের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা যে করে থাকেন তার নমুনা অমরা ওখানে থাকতে থকতেই পেয়েছিলাম। এখন বৎসরে চারটি দিন মায়ের সর্বজনীন দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন (১৫ই আগস্ট) সিদ্ধির দিন (২৪ নভেম্বর), মায়ের জন্মদিন (২১ ফ্রেব্রুয়ারি) এবং তাঁর আশ্রমে স্থায়ী ভাবে যোগদানের দিন ২৪শে এপ্রিল।

প্রথম দর্শনে মনে হবে পণ্ডিচেরি শহরটা আশ্রমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি আশ্রমের কাজকর্মের পরিচালক। কিন্তু সর্ব বিষয়ে সর্বময় কর্তৃত্ব মায়ের হাতে! ক্ষেত খামারে শাকসবজি ফলমূল ও শস্যাদি উৎপাদন থেকে শুরু করে গোশালা পশু-পাখি পালন, ইট টালির ভাটা, গেঞ্জী-মোজার কল, রুটি বিস্কুটের কারখানা, তেলের ঘানি, দর্জিখানা, রেস্তোরাঁ, ছাপাখানা মোটরগাড়ি সারানোর দেকান ইত্যাদি যাবতীয় প্রতিষ্ঠান আশ্রমের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পরিচালিত হয়।

আশ্রম পরিচালনা ও সংরক্ষণের নানা বিভাগ আছে। এ ছাড়া আছে নানা রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ কর্মীই আশ্রমিক ও আশ্রমিকা। সর্ববিধ কাজকর্ম ঈশ্বর সেবার অঙ্গরূপেই সম্পাদিত নয়। মা বলেন এটা তাঁর নির্দেশও বটে। ঈশ্বরের জন্য কাজ করার অর্থ দেহের দ্বারা প্রার্থনা করা। এখানে কর্ম বিভাগ আছে কিন্তু ছোট বড় ভাগ বা স্তর নেই। কর্মীদের পদমর্যাদার ক্ষেত্রে উচ্চ নিচ ভেদ নাই। নিয়ম এখানে হৃদয়কে অতিক্রম ক'রে যান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে নি। তাইতো ব্যাক্তি মানুষের যোগ্যতা বা দক্ষতা প্রধান্য পায় না, প্রনোজনীয়ও বিবেচিত হয় না। কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা এবং শক্তি অনুসারে সর্বোত্তম রূপে তা সম্পাদনের উদ্যমকে গুরূত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছে।

আশ্রম বলতেই শহরের কোলাহল থেকে দূরে নিভৃত স্থানে পত্রপুষ্প বেষ্টিত একটি শান্ত স্থানের কথা আমাদের মনে পড়ে। সেখানে অধ্যাত্ম সাধনার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সত্তা সংস্কৃতি এবং সম্পত্তিকে আসুরী সম্পদ মনে করা হয়। তার কোন চিহ্ন নেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। এখানে পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও কোন নিয়ম নেই বলেই মনে হল। যার-যা-অভিরুচি তিনি তেমনি পোশাক পরেই চলা-ফেরা কাজ-কর্ম করছেন দেখলাম। তবে

ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু বিশেষ নিয়ম আছে। কাজের সময় স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীকেই হাফ প্যাণ্ট ও হাফ শার্ট পরতে হয়। প্রাচীন আশ্রম জীবনে প্রাচুর্যকে পরিহার করে চলার রীতি ছিল। এই আশ্রমে প্রতিপদে প্রচুর্যের অফুরন্ত স্পর্শ।

আশ্রমের তত্ত্বাবধানে উৎপাদিত দ্রব্যাদির একটি বিক্রয় কেন্দ্র আছে সম্পাদকীয় দপ্তরের বাড়িতে। এখানে জিনিস-পত্রের দাম বাজার দরের তুলনায় অনেক বেশি। "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম" নামক একখানা ২৩ পৃষ্ঠার ১/১৬ ক্রাউন সাইজের চটি বইয়ের দাম এক টাকা। অতি সাধারণ একটি মানিব্যাগের মূল্য দশ টাকা। হ্যাঁ, তবে থাকা-খাওয়াটা বাজার দরের তুলনায় বেশি নয়। সাধারণ অতিথিদের জন্য থাকা খাওয়ার সর্বনিম্ন জনপ্রতি দৈনিক ব্যয় এই রকম: থাকার জন্য ঘর ভাড়া এক টাকা। সকালের চা, দুপুরের ভাত এবং রাত্রের রুটির দাম মোট আড়াই টাকা। সর্বসাকুল্যে এই ৩৷৽ টাকায় ভদ্রভাবে থাকা যায়। বিকেলে একবার চা জলখাবার বাইরে খেয়ে নিতে হয়। আশ্রমের রেস্তোরাঁ আছে। একটি চপ ও এক কাপ কফির দাম সত্তর পয়সা।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানস ও দিব্যচেতনার আলোর অবতরণ ব্যাপারটি আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারি না। যেটা সহজে বুঝি তা হল, মানুষ তার সত্যাশ্রয়ী আচরণ ও সেবাময় জীবনধারনের দ্বারা সকল জৈব দুর্বলতা পরিহার করে ত্রুটিমুক্ত হলে দেবত্বলাভ করতে পারে। মানুষ অনন্ত সম্ভাবনার আধার। অতিমানস ইত্যাদি না বুঝলেও শ্রীঅরবিন্দের মহত্ত্ব অনুভব করতে অসুবিধা হয় না। তিনি বলেছেন —আমরা সরকার বা বাইরের জাগতিক কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের বিবিধ প্রয়োজন মেটাবার প্রত্যাশা করি, এটা ভুল। মানুষ তার আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। এই কথাটা বুঝতে বা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না। মানুষ পরনির্ভরতা

ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হোক্—এটা তো সকল জনের সর্বকালীন প্রার্থনা।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মুখ্য কথাটি ছাত্রদের বোধগম্য করে আশ্রম প্রকাশ করেছেন। তাতে পাই: "প্রকৃতির আছে এক ঊর্ধ্বমুখী ক্রমগতি—তা চলেছে, পাথর থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে পশুতে, পশু থেকে মানুষে। আপাততঃ পৈঠার শেষ ধাপ বলে মানুষ নিজেকে এই উন্নতির চরম বলে মনে করে, মনে করে পৃথিবীতে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। এটা তার ভুল। স্থূল প্রকৃতিতে এখনো সে প্রায় পুরোপুরি পশুই, একটা চিন্তাশীল, বাক্যশীল পশু, কিন্তু তবুও পশু, শারীরিক অভ্যাসে এবং প্রবৃত্তিতে। প্রকৃতি এই ত্রুটিপূর্ণ ফল নিয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না; তাঁর প্রয়াস এমন জীব গড়ে তুলতে যার সঙ্গে মানুষের পার্থক্য হবে মানুষ আর পশুর মধ্যেকার পার্থক্যেরই মত, এমন জীব যা শুধু আকারেই থাকবে মানুষ, কিন্তু তার চেতনা মন ছাড়িয়ে, অজ্ঞানের দাসত্ব মুক্ত হয়ে বহু দূরে উঠে যাবে।"

বিজ্ঞান ও যন্ত্রকুশলতার শ্রীবৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর মানুষ আজ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। বহির্জগতের এই অমিত শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে মানুষের মনোরাজ্যের ক্ষমতাও বাড়াতে হবে। পি. বি. এস হিলারী Sri Aurabindo & The Future Evolution of Man নামক গ্রন্থে লিখেছেন—

"Without an inner change man can no longer cope with the gigantic development of the outer life. If humanity is to survive a radical transformation of human nature is indispensable.—(শ্রীসমর বসুর মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থে উদ্ধৃত)। শ্রীঅরবিন্দ এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি প্রথম বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সেই লক্ষে পৌঁছোবার একটা উপায়ও নির্ধারণ করেছেন। কেবল তাই নয়, তিনি তাঁর নিজের সাধনালব্ধ শক্তির দ্বারা বিশ্ববাসীকে এই কাজে সাহায্য করছেন।

মা বলেছেন ১৯৫৬ সনে একটি স্বর্গীয় আলোক শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ফলে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে নেমে এসেছে। সেটি এখন সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া যেমন দেহকে উষ্ণ বা শীতল রেখে আমাদের সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখে, এই দিব্য আলোর অবতরণ তেমনি আমাদের আত্মার উন্নয়নে সাহায্য করবে। এর দ্বারা দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের তাবৎ মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে। মানুষ স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে দিব্যজীবনের দিকে অগ্রসর হবে। আমি এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে অসমর্থ হলেও বিশ্বাস করতে চাই। যত্নের দ্বারা মানুষ যে উন্নত হতে পারে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুনি-ঋষিরা এই পথের অনুসন্ধান করতে গিয়েই তো বলেছিলেন —আত্মনং বিদ্ধি— নিজেকে জান।

মানুষ অমৃতের পুত্র। দিব্য জীবনলাভের স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে সে জন্মেছে। অতএব বুঝি বা না বুঝি শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনতত্ত্বে বিশ্বাস করি। জীব মাত্রই নারায়ণ—এই হল সনাতন ভারতবর্ষের সাধনা ও বাণী। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন তাই ভারতবাসীর নিকট নতুন কথা নয়। সোনাও অব্যবহারের দ্বারা কিম্বা ধূলামাটির সংস্পর্শে এলে উজ্জ্বলতা হারায়, এমনকি কাজের বারও হয়ে পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। তেমনি আমাদের অন্তবস্থ নারায়ণও কাজের হেরফেরে সুপ্ত থেকে যান। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকেই জাগ্রত করে লোকহিতব্রতী করে তুলতে চেয়েছেন বল্লে বোধ হয় বেশি ভুল হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করবার জন্য যোগ ও ধ্যানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গীতায় যোগকে কর্মের কৌশল বলা হয়েছে। ধ্যান ও কর্মের গুরুত্ব যতটা স্বীকৃতি লাভ করেছে প্রচলিত কর্মত্যাগরূপী সন্ন্যাস ততটা নয়। পূর্ণ সন্ন্যাস এবং কর্মযোগে কোন পার্থক্য নেই। এই মহাসত্য আশ্রমের চিন্তা ও কর্মে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দের অভিধ্যানকে কর্মের মধ্যে রূপায়িত করবার অন্যতম উপায় হিসাবে

এখানে ১৯৪৩ সনে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি এখন নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। ১৯৫০-এ শ্রীঅরবিন্দের পরলোক গমনের পর তাঁর স্মারকরূপে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা করা হয় ১৯৫২ সনে। নাম দেওয়া হয় 'শ্রীঅরবিন্দ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'। শোনা গেল রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিতে হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের নামে বিশ্ববিদ্যালয় হোক সেটা একশ্রেণীর স্থানীয় ছাত্র ও রাজনৈতিক মানুষ পছন্দ করেন নি। তারা দাবি করেছিলেন স্থানীয় কোন মানুষের নামে বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে। সহজবোধ্য কারনেই অরবিন্দ সোসাইটির পক্ষে এমন কোন দাবি মেনে নেওয়া সম্ভবপর নয়। এই বিরোধিতা সত্ত্বেও কিছু করতে গেলে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। আশ্রম খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে সর্ববিধ রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিহার করে চলেন। তবুও দ্বন্দ্বসংঘাত সর্বদা এড়ান সম্ভব হয় নি। আশ্রমের উপর সশস্ত্র হামলা পর্যন্ত হয়েছে।

অরবিন্দ বিশ্ববিদ্যালয় এখন শ্রীঅরবিন্দ ইনটারন্যাশনাল সেণ্টার অব এডুকেশন। এ পরিবর্তন ঘটেছে ১৯৫৯ সনে। আশ্রম থেকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে অধিকতর ফলপ্রসূ করবার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় কিণ্ডারগার্টেন থেকে উচ্চতম পর্যায়ের ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা, শারীরবিদ্যা ইত্যাদির পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। বিশেষত্ব হল পঠন-পাঠনের রীতি-পদ্ধতি ও পরীক্ষা বর্জন এবং কোন প্রকার সার্টিফিকেট, ডিগ্রি কিম্বা ডিপ্লোমা না দেওয়া। এঁরা বিশ্বাস করেন—চরিত্র গঠনের জন্যই জ্ঞানার্জন। বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ব্যবস্থা তার সহায়ক হয় না।

আমরা বলি দেহে আত্মা আছে। এখানে প্রাধান্য দেহের।

এঁরা বলেন আত্মা দেহের আধারে অবস্থান করছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এই দৃষ্টিতে দেখা হয়। প্রত্যেকের সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুসারে তিনি যাতে পূর্ণতা পেতে পারেন তার সর্ববিধ আয়োজন রয়েছে এই শিক্ষাকেন্দ্রে। চলতি ছাত্র-শিক্ষক, শ্রেণী, পঠন-পাঠনের ধারণা এখানে অচল ও অপ্রচলিত।

The child is a soul with a body, life-energy and mind to be harmoniously and integrally developed. দেহ, মন ও শক্তির সমন্বিত বিকাশের জন্য সুস্থ স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাস্থ্যদীপ্ত ছাত্রছাত্রীদের দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সকলেই সুগঠিত স্বাস্থ্যবান এবং উৎসাহে ভরপুর। স্বাস্থ্যের নিয়ম মেনে চললে প্রতিটি কিশোর-কিশোরীই এমন সুন্দর হতে পারে—পশ্চিম বঙলার স্কুল কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্তৃপক্ষদের এটা একটু বিশেষ করে জানা দরকার।

শিক্ষকেরা পড়ান না, সাহায্য করেন। কোন্ বইতে আছে, কোথায় আছে, কেমন করে হয়, ছাত্রদের সেই সব তথ্য সরবরাহ করে শিক্ষকগণ সাহায্য করেন মাত্র। এ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের একটি বাক্য স্মরণ করা যেতে পারে।—The first principle of teaching is that nothing can be taught অর্থাৎ কিছুই শেখান যায় না এই হল শিক্ষার প্রথম নীতি। এই নীতি এখানে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়।

এঁরা বলেন Education is a process of the discovery of one's true place and function in the totality of existence and of the progressive lifting of one's station to the highest possible reach of consciousness and action. শিক্ষা হল জীব জগতে মানুষের সত্য স্থান ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং ধীরে ধীরে চৈতন্য ও কর্মের শিখরে উন্নীত হওয়া।

মায়ের একটি কথা এ বিষয়ে স্মরণ করি। তিনি বলেছেন উন্নতিকে বাধাবন্ধহীন হতে হবে। কোন্ উন্নতিকে আমরা নির্বাধ বলব? তাঁর নির্দেশ হল: যে উন্নতি বাইবের প্রভাব বর্জিত এবং চলতি বিধি বিধান ও ধ্যান ধারণার দাসত্ব মুক্ত হয়ে আত্মার শক্তিতে পরিচালিত হয় সেটাকে আমার নির্বাধ অগ্রগতি বা উন্নতি বলব।

আশ্রমের শিক্ষায়োজন এই ধ্যান-ধারণানুসারেই গড়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীরা বই যেমন পড়েন, তেমনি আশ্রমের নানা কাজে শারীরিক শ্রম করেন। গান বাজনা খেলাধুলাব বিবিধ ক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে চলেন। পাঠক্রমে অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও নৃত্যের স্থান স্বীকৃত হয়েছে। ছাত্রচিত্তের উদ্বোধন ও দৈহিক শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে আশ্রমের শিক্ষা সার্থক হচ্ছে বলেই আমার ধারণা।

কী পড়ানো হয় সেটা জানতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। প্রথম তিন বছর কিণ্ডারগার্টেন। পরের পাঁচ বছর ধরে মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতীয় ভাষা, ইংরেজী, ফরাসী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, চিত্রাঙ্কন, প্রভৃতির সঙ্গে উদ্যান রচনা, টাইপরাইটিং ইত্যাদি হাতের কাজ হল শিক্ষণীয় বিষয়। মাধ্যমিক স্তরের পরের পড়াশুনাকে বলা হয় হায়ার কোর্স বা উচ্চতর পাঠক্রম।

হায়ার কোর্সেব দুটি ভাগ রয়েছে। কলা ও বিজ্ঞানের স্নাতক পাঠক্রম আর প্রযুক্তিবিদ্যা। প্রথম বিষয়ের জন্য তিন বছর এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রযুক্তি বিদ্যার জন্য ছ'বছর পঠন পাঠনের সময় ধার্য আছে। শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ ধ্যান ও যোগ। যোগীর দৃষ্টিতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ব্যবহার দিব্যজীবনে প্রবেশের উপায় বলে কথিত হয়। যে সম্পদ ও সামর্থ্য (means) ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন তার পূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সদ্ব্যবহারের দ্বারা যাতে আত্মার চৈতন্যময় ভ্রান্তিহীন বিকাশ ঘটে এবং আমরা আনন্দময় পূর্ণতা প্রাপ্ত হই সেই জন্যই তো জ্ঞান আহরণের আয়োজন। দেহ বা মনের সৌন্দর্য পরিতৃপ্তির

মধ্যে কলাবিদ্যার জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়। সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রকাশ অনুভব এই কলা-বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য রূপে গৃহীত হয়েছে।

পাঠক্রমে যাহাই নির্দিষ্ট হোক না কেন, শিক্ষার্থী কি পড়বেন তা বহুলাংশ তিনিই ঠিক করে নেবার অধিকারী। পড়াশুনার বিষয়াদি নির্ধারণ করবার জন্য বছরের শুরুতে বিদ্যার্থীদের আহ্বান জানান হয়। শিক্ষকগণ এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করেন কিন্তু স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। কোন্ শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করবেন, কার অধীনে অনুসন্ধান কার্যে রত থাকবেন তাও বেছে নেবার অধিকার ছাত্রদের। এও এক প্রকার গুরু বরণ! প্রচলিত স্কুল-কলেজে যেমন ক্লাস নেওয়া হয় এখানে সচরাচর তেমনটি করা হয় না তবে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অনুরোধ এলে তেমন ক্লাসও কখন কখন করা হয়ে থাকে। আমার ধারণা হয়েছে, সমগ্র বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে এক দিকে ছাত্রচিত্ত উদ্বোধনের প্রয়াস যেমন রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তির সঙ্গে ভক্তির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলছে। আজকের পৃথিবীতে ভক্তির এই সমন্বয়ের প্রয়োজন সর্বাধিক। সুতরাং শিক্ষার যে আদর্শ এখানে রূপ পরিগ্রহ করছে অথবা শিক্ষা নিয়ে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে কালক্রমে সেটাই হতে পারে মানব সমাজকে অরবিন্দ আশ্রমের শ্রেষ্ঠ দান।

আশ্রম শিক্ষালয়ে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রারের নিকট ২০ শে অক্টোবরের মধ্যে পাঠানোর নিয়ম। ভর্তির পর যোগ্যতা বিচারের পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর পাঠক্রম বা পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ নির্ভর করে। ছ'বছরের কম বয়সের শিশু ভর্তি করা হয় না। মা নিজেই আবেদন পত্রগুলি বিচার-বিবেচনা করে আদেশ দিয়ে থাকেন। কোন রকম মাস মাইনে নেই। তবে থাকা খাওয়া ও স্কুলের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য মাসে

দেড়শ' টাকা দিতে হয়। আশ্রমের সাধারণ খাবার যাঁরা খাবেন না তাঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। সাধারণ পরিচ্ছদাদি বাড়ি থেকে দিতে হয়।

ভারতে শিক্ষা আদর্শ কোন দিন কোন পার্থক্যকে স্বীকার করে নি। বিত্ত সঙ্গতির তারতম্যে এ যুগে শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিভাগ ঘটেছে বটে, কিন্তু সেটা আমাদের ভাল লাগে না। জনমানসে এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেরালার কলেজী শিক্ষা নিয়ে সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল তার মূল এখানেই। প্রাচীন ভারতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।
কংস বধের পর কৃষ্ণকে সন্দীপন মুনির আশ্রমে পড়াশুনোর জন্য পাঠান হয়। মুনিবর শ্রীকৃষ্ণকে এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্র সুদামকে একসঙ্গে রাখলেন। উভয়কে একই ভাবে থকেতে হত, একই রকম কাজ করতে হত। আর্য ভারতে গুরুকুলের উপর রাজার কোন বিশেষ অধিকার ছিল না। বর্তমানেও অনুরূপ কথা শ্রুত হচ্ছে। আদালতের সর্ববিধ ব্যয় সরকার নির্বাহ করেন কিন্তু তার উপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। শিক্ষা ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই। নইলে শিক্ষিত-চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা যাবে না।

আর্য সভ্যতা মুলতঃ আশ্রম সভ্যতা। অরবিন্দ আশ্রমের বহিরাঙ্গে প্রাধান্য পেয়েছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, তথাপি তাঁরা যে আদর্শ অনুসরণ করছেন তার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবত্রয়ের মিল আছে। এই তিনটি প্রস্তাবের মর্ম হল—(১) আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস এবং শ্রমের সম্মান। (২) জাতীয়তা-বোধ ও সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করে ছাত্র শিক্ষকের সম্মিলিত সমাজ-সেবা। এবং (৩) ন্যায়-অন্যায় বিচার-বোধ ও ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধি।

অরবিন্দ আশ্রমের কাজকর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্র উভয় স্থান থেকে প্রতি-যোগিতার কাঁটাটি সযত্নে ও সচেতনভাবে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এখানে প্রমোশনের সুযোগ নেই, মাইনেও বাড়ে না। একজন অপরজনকে অতিক্রম করে যেতে পারেন একটি মাত্র ক্ষেত্রে, তা হল ধ্যান ও যোগ সাধনা। ফলে ঈর্ষা-বিদ্বেষ সৃষ্ট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। শিক্ষার বেলায়ও তেমনি—প্রথম ' দ্বিতীয় প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করার রেওয়াজ না থাকায় এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই প্রথম হন। যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাতে পাস ফেল নেই, প্রথম দ্বিতীয়াদি ক্রম নির্ধারণের ব্যবস্থা নেই। আমাদের মধ্যে যে সব গুণ আছে সুশিক্ষার দ্বারা সেগুলির বিকাশ ঘটে। আশ্রমের শিক্ষা এই পথে পরিচালিত হয়। এখানে শিক্ষিত ছাত্রের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। এই প্রচেষ্টার ফলাফল যথাযথ জানবার অবকাশ হয়নি। তবে অরভিলে দেখেছি শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, কালা মানুষ, সাদা মানুষ, দেশী-বিদেশী, মজুর, স্ত্রী- পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই, সকলেই একত্রে কাজ করছেন। নেংটি পরা এক স্থানীয় মজুর একটি শিকের একদিক ধরেছেন আর জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার অপর প্রান্ত ধরে কাজ করছেন—নির্মিত হচ্ছে বিশ্বশান্তি নীড়ের মধ্যমণি মাতৃমন্দির।

আশ্রমের কেউ প্রচলিত অর্থে সন্ন্যাসী নন। তাই মায়ের অবর্তমানে এত বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযুক্ত কর্মীর অভাব ঘটবে বলে অনেকে আশঙ্কা করেন। বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসীরা আছেন তাই দিন দিন তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আজ কলেবরে অনেক বড় হয়েছে কিন্তু কবি যা করতে চেয়েছিলেন তা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। অরবিন্দ আশ্রমে সন্ন্যাসী না থাকলেও কর্ম-যোগী আছেন। সুতরাং আশঙ্কার বড় বেশি কারণ নেই।

অরভিল

বর্তমান আশ্রমের মাইল পাঁচেক দূর থেকে আন্তর্জাতিক শহর

অরভিল শুরু হয়েছে। প্রস্তাবিত শহরের আয়তন হবে বেশ কয়েক বর্গ কিলোমিটার। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ বিকেলের দিকে জনপ্রতি পাঁচ টাকা ভাড়ায় বাসে করে অরভিল দেখানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। আমরা যখন গেলাম তখন বর্ষার জন্য এ ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়েছিল। অরভিলের মধ্যে পথঘাট এখনো ঠিকমত তৈরী হয় নি। যা হয়েছে সেগুলি বর্ষা একটু বেশি হলেই অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। মেরামত না করে বাস চালান সম্ভবপর হয় না। তাই আমরা উচ্চ মূল্য দিয়ে একখানা ট্যাক্সী ধরলাম জহরলাল নেহেরু রোডের পেট্রল পাম্প থেকে।

অরভিলের শুরু পর্যন্ত সুপ্রশস্ত জাতীয় সড়ক। সুন্দর তরুবীথি সমন্বিত রাজপথ। নারকেল কুঞ্জ, কাজু বাদামের বন,—আরও সব কত চেনা-অচেনা গাছগাছালি। পথে একটি হাসপাতাল শহর পড়ে। নামটি চমৎকার। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন ধন্বন্তরি। তারই নামে এই শহরের নাম হয়েছে ধন্বন্তরি নগর।

প্রথমেই আমরা অরভিলের কেন্দ্রবিন্দু মাতৃমন্দির নির্মাণ কেন্দ্রে গেলাম। ১৯৬৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই আন্তর্জাতিক শহরের ভিত্তিশিলা ন্যাস হয়। অনন্য সুন্দর উপায়ে আন্তর্জাতিকতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই ভিত্তি রচনায়। ভিত্তি প্রস্তর হল মোচার আকারে গঠিত একটি পাত্র। পৃথিবীর বহু দেশের যুবক যুবতী এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসবার সময় তাদের নিজ দেশ থেকে এক মুঠো করে মাটি সঙ্গে আনেন। ভিত্তি স্থাপনের শুভ লগ্নে সেই মাটি তাঁরা নিজের হাতে ঐ ভিত্তিপাত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

"শ্রীঅরবিন্দ স্বপ্ন দেখতেন—There should be somewhere upon the earth a place which no nation could claim as its sole property, a place where all human beings of goodwill sincere in their aspiration could live freely as citizens of the world obeying one single authority,

that of the Supreme Truth". বিশেষ কোন জাতির কর্তৃত্ব বহির্ভূত বিশ্বনাগরিকের শহর রচনার এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিচ্ছেন অরবিন্দ সোসাইটি। খুব সঙ্গত কারণেই এই আন্তর্জাতিক শহর অরভিলের প্রতিভূ হয়েছেন ইউনেসকো।

অরভিল শব্দের অর্থ উষা নগরী—City of Dawn. মানব সভ্যতার নতুন প্রভাত এখান থেকে যে শুরু হবে না সে কথা কে বলতে পারে? সকল মানুষের সার্বিক ঐক্যের স্বীকৃতি দিতে না পারলে মানুষের নতুন অভ্যুদয় ঘটতেই পারে না। অরভিলে সেই প্রাথমিক বাধাটি নেই। সব মানুষ এক নয়। তবু সকল মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই মানুষকে এগোতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের মধ্যেও এই একই ভাবনা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। জীবনের প্রান্ত সীমায় এসে কবি তাঁর শেষ জন্মদিনের বাণীতে আশা প্রকাশ করেছিলেন পূর্বদিগন্ত থেকেই মানব সভ্যতার নূতন অভ্যুদয় হবে। আমাদের ভাবতে ভাল লাগে বাস্তব ক্ষেত্রে সেই মহান্ কাজ বুঝি শুরু হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের অরভিলে।

অরভিল আপাততঃ পঞ্চাশ হাজার মানুষের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। শহরটিকে শিল্পে স্থাপত্যে অপরূপ সুন্দর করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বাড়িগুলির মডেল দেখলেই বিস্মিত হতে হয়। সমগ্র এলাকাটি চারটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত হয়েছে। (১) বসবাসের এলাকা, (২) সাংস্কৃতিক পাড়া, (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র, এবং (৪) শিল্পাঞ্চল। পৃথিবীর সব দেশ তার সর্বোত্তম বিদ্যা বুদ্ধি ও সম্পদ দিয়ে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্যারীতে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯৬৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর অধিবেশনে (পঞ্চদশ অধিবেশন) অরভিলের অন্তর্নিহিত আদর্শ এবং তার বাস্তব রূপায়ণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশ্বশান্তি ও মানব

ঐক্যের ক্ষেত্রে অরভিলের সুমহান সম্ভাবনা সম্পর্কে ইউনেসকোর ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ ম্যালকম আদিশেশিয়া বলেছেন :

"We in UNESCO and outside of Aurovile have tried other ways of living together and have seen them ending in stark tragedy. We have arrived everywhere in Europe as in Asia, North America, Africa—at a stage which drives home to us the faith that for us there is no way forward except a conscious spiritual devolopment.

And so now turn to Aurovile and to its founding. The founding of Aurovile is a new kind of spirituality, a new consciousness which is la king in our world to day……on behalf of UNESCO……I hail Aurovile, its conception and realisation, as a hope for all of us………"

দ্বন্দ্ব সংঘাত পীড়িত বিশ্বে অরভিলের কল্পনা সকলকেই আশান্বিত করবে। মিলে মিশে বেঁচে বর্তে থাকার একমাত্র উপায় হ'ল সচেতেন-ভাবে অধ্যাত্মবাদের বিকাশ সাধন। স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতবর্ষ তো এই কথাই বলে আসছে।

মাতৃমন্দিরকে কেন্দ্র করে অরভিল গড়ে উঠবে, এ কথা আগে বলেছি। চারটে স্তম্ভের উপর একটি গোলাকৃতি বাড়ি তৈরী হচ্ছে। এই পরিকল্পনার একটা তান্ত্রিক ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। আমরা তা জানতে পারি নি। সঙ্গে থাকবে বারটি বাগান। কাছেই একটা বৃহৎ বট গাছ আছে। তাকে ঘিরে তৈরী করা হবে ত্রয়োদশ বাগান বা ঐক্য কানন। মা বলেছেন মাতৃমন্দির হচ্ছে মানুষের পূর্ণতির আকাঙ্ক্ষার ঐশ্বরিক পূর্তি। এখন নির্মাণের কাজ চলছে (অক্টোবর, ১৯৭১)।

অরবিন্দ ও মায়ের ছবি পাশে রেখে কর্মীরা কাজ করছেন। ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে। প্রত্যহ কাজ সুরু হয় পূজা ও পুষ্পাঞ্জলির পর।

অরভিলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সরকার একটি করে কেন্দ্র গড়ে তুলতে স্বীকৃত হয়েছেন। ভারত সরকার 'ভারত নিবাস'টি গড়ে তোলার কজে হাত দিয়েছেন। পরিকল্পনাটি এর খুবই চিত্তাকর্ষক। একটি অঙ্গনের মধ্যে মূল ভবনের সঙ্গে ১৯টি একই প্যাটার্ণের পৃথক পৃথক বাড়ি হবে ভারতবর্ষের ১৯টি রাজ্যের প্রতীক স্বরূপ। সঙ্গে থাকবে রেস্তোরাঁ, সাংস্কৃতিক মণ্ডপ ইত্যাদি। 'ভারত নিবাস' সম্পূর্ণ করতে মোট ব্যয় হবে আড়াই কোটি টাকা। প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে, খরচ হবে ৪০ লক্ষ টাকা।

জনহীন এই প্রান্তরে কিছু কিছু কর্মী ইতিমধ্যে বসবাস করতে শুরু করেছেন। দেশী বিদেশী মিশ্র ধরণের বিচিত্র সব আবাস। নানা ক্ষেত্রে কাজ চলছে। একটি স্কুল আছে। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ চলছে। দেখবার বড় বেশি কিছু নেই, তবে ঘুরে এলে এর বিশালতার আন্দাজ পাওয়া যায় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা প্রত্যয় হয়।

আমাদের পণ্ডিচেরি অবস্থান শেষ হয়ে এসেছে। ছেড়ে আসবার পূর্বে সংগোপনে একবার জানতে চেষ্টা করলাম শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী সম্পর্কে এদের মনোভাব কি। অনেকে নামটি পর্যন্ত শোনেন নি। আশ্রমের কোথায়ও তাঁর একখানা ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। বিবাহিত ভারতীয় সাধকদের স্ত্রীগণকে, কোন বিচার না করেই ভারতবাসী পূজা করে এসেছেন। সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আধুনিক কালের বিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, কস্তুরবা গান্ধী প্রভৃতির কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। বিবাহ কোন আকস্মিক ঘটনা বলে আমরা মনে করি না।

আশ্রমের নানা কাজে প্রচুর কর্মী রয়েছেন। অধিকাংশ-গুরুত্বপূর্ণ পদে এখনো বাঙালী আছেন। মায়ের পুত্র মঁসিয়ে আঁদ্রে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মী। আশ্রমের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারিণী হওয়া সত্বেও মা নিজের ছেলের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেন নি। আশ্রম জীবনে যোগদান করার পর কেউ কেউ মতাদর্শের গোলমাল প্রভৃতি বিবিধ কারণে সংস্রব ত্যাগ করেছেন।

সমুদ্রতীরে অনেকগুলি বিক্ষিপ্ত বাড়ি নিয়ে আশ্রম। শহরের নানা স্থানে এখন নতুন নতুন অনেক বাড়িঘর নির্মিত হচ্ছে। আশ্রমে নারী পুরুষে কোন ভেদাভেদ করা হয় না। ছাত্রীরা সকলেই হাফ-প্যাণ্ট হাফ-সার্ট পরেন, সাইকেল চড়েন। মেলামেশা অবাধ। নারীকে নানা বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে আমরা অভ্যস্ত। এখানে সে সব নিয়ম অচল বলেই মনে হয়। নারী পুরুষের সমানতা খুবই সুন্দর মনে হ'ল। নারীকে অনুগ্রহ করে, তাদের আমবা অপমান অসম্মান করেই থাকি। গান্ধীজি বলেছেন নারী পুরুষ উভয় উভয়ের পরিপূরক। ঐ সত্যটি এখানে অনুভব করা যায়। মনু বলেছেন মানুষকে মা ও কন্যা থেকেও সর্তক থাকতে হবে। এ দিক থেকে আশ্রম এ দেশে বোধ হয় একটি নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষাই করছেন।

ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্য আশ্রম সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের ধারণা কি তা জানতে পারি নি। আড়াই শ' বছর ধরে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত থাকার ফলে রাস্তাঘাটের নামে ফরাসী ভাষার আধিক্য তো চোখেই পড়ে। জনজীবনে তার কি প্রভাব তাও জানবার অবকাশ হ'ল না। আশ্রমের কেন্দ্র থেকে স্থানীয় লোকদের নানাবিধ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে দেখা গেল। আশ্রমের সঙ্গে এদের যোগ ঘনিষ্ঠ। এরা সকলেই সাধারণ মানুষ। যেচে আলাপ করলেও কোন কথা বলতে চান না। ভাষার অসুবিধা ছাড়া এ ক্ষেত্রে আর কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে একশ্রেণীর স্থানীয় মানুষ

আশ্রমের উপর প্রসন্ন নন তা বেশ বোঝা গেল। কিছুকাল আগে একবার সশস্ত্র হামলাও নাকি হয়েছিল।

আশ্রমের পুরণো কর্মী মরিস সাহেব—স্থানীয় খ্রীস্টান। পঁচাত্তর বছরেরও বেশি হবে তাঁর বয়স। তিনি অনেক খবর রাখেন। আর্য পত্রিকা যে প্রেসে ছাপা হ'ত সেখানে তিনি প্রুফ বয় ছিলেন। প্রুফ নিয়ে অরবিন্দের নিকট যাতায়াত করতেন। প্রায় প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত আশ্রমের রূপান্তর তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। শ্রীমায়ের স্বামী যে নির্বাচন লড়েছিলেন পণ্ডিচেরি থেকে তাও তিনি মনে করতে পারেন। নির্বাচনের কাজেই তাঁরা প্রথম পণ্ডিচেরি আসেন। সে সম্পর্কে গল্প বলতে মরিস সাহেব বেশ উৎসুক। অনেক কথা তিনি জানেনও। কিন্তু কোন এক দুর্বোধ্য কারণে মুখ খুলতে চান না। কোন দুর্বল মুহূর্তে এক আধটা কথা বের হয়ে গেলে প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন চট করে। তবে তিনিও বুঝে ফেলেছেন, মা মারা গেলে আশ্রমের ভার কোন তামিল লোক বা মাড়োয়ারী পাবেন না, পাবেন 'শ্রীনীলনীবাবু'। অরবিন্দের সঙ্গে যে ক'জন বঙ্গ সন্তান এসেছিলেন শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁদের অন্যতম। তিনি এখন অরবিন্দ সোসাইটির সম্পাদক এবং আশ্রমে মায়ের পরেই তাঁর স্থান। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবন অধ্যায়ে আর এক বঙ্গ সন্তানও বিশেষ স্মরণীয়—প্রবর্তক সংঘ গুরু মতিলাল রায়।

চিদাম্বরম্

অরবিন্দ আশ্রমের সার্বজনীন ভোজনালয়ে দুপুরে খেয়ে সাড়ে বারটার বাস ধরে প্রায় ৪টায় সময় আমরা চিদাম্বরম এলাম। বৃষ্টির জন্য রাস্তা খারাপ ছিল, তাই একটু বেশি সময় লাগল। সাধারণতঃ দু ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। চিদাম্বরম্ বাস টারমিনাস থেকে রেল স্টেশন কাছেই। আমরা স্টেশনে এসে উঠেছিলাম। এটা ভুল হল। শহরের মধ্যস্থলে নামলে একটা ধর্মশালায় বিনামূল্যে জিনিসপত্র রেখে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় ও নটরাজ মন্দির দেখে আসা সুবিধাজনক হয়।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি কারণে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের যোগ হ'ল প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণটি অপ্রত্যক্ষ হলেও আমার নিকট বেশ মূল্যবান্। গান্ধীজি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় যোগদান করতে যাবার পথে জনতার হাতে আটকা পড়েছিলেন। জনতার দাবি, তাদের পঙ্‌ক্তি-ভোজনে গান্ধীজিকে একবার যেতেই হবে। গান্ধীজি বলেছিলেন কার্যসূচিতে ওটা নেই, অতএব যাওয়া হবে না। জনতা নাছোড়বান্দা, গান্ধীজিও অটল। মহাত্মার সঙ্গী ডঃ রাজন জনতাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করছেন, জনতার সঙ্গে তাঁর উত্তেজিত কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। এই অবসরে গান্ধীজি সকলের অলক্ষ্যে গাড়ি থেকে নেমে গুটিগুটি পায়ে হেঁটে পালিয়ে গেলেন। পেছন থেকে আর একটা গাড়ি তাঁকে তুলে নিল। জনতা যখন বুঝল ব্যাপারটা গান্ধীজি তখন তাদের নাগালের বাইরে। রাগটা গিয়ে পড়ল ডাঃ রাজনের উপব। নিগৃহীত হতে হল তাঁকে। গান্ধী-জীবনে পালিয়ে থাকার দ্বিতীয় ঘটনা দুর্লভ।

নটরাজ মন্দিবটির খ্যাতি খুব। শিবের রুদ্র মূর্তির উপর বাঙ্গালীর একটু বেশি আকর্ষণ আছে। নটরাজেব মূর্তির পরিকল্পনা ও শিল্প-সুষমাব আবেদন সর্বজনীন। শ্মশানের চিতাভস্মের উপর নবজন্ম পরিগ্রহ করে এই বিশ্বাসের দ্বারাই মৃত্যু অমৃত হয়েছে। মা কালীকে তাঁর রুদ্র ভীষণ ও ভয়ঙ্কর মূর্তিতেই আমবা পূজা করি, ভালবাসি। কেননা বাইরের কৃষ্ণ অন্ধকাবের মধ্যে আমরা আলোর বন্যা প্রত্যক্ষ করি। অন্ধকারের পরপাবেই তো আলো। আলো পেতে হলে তা অতিক্রম করতেই হবে, ধ্বংস তাই তো একরকমের সৃষ্টির উৎসব। নটরাজের প্রলয় নাচন সৃষ্টিকে রসাতলে পাঠিয়েই শেষ হয় না: নূতনতর সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আসে।

চিদাম্বরম্ ছোট জায়গা। অনেকে গোবিন্দ রাজাও দেখতে যান। তা সত্ত্বেও এখানে রাত্রিবাসের প্রয়োজন হয় না।

তাঞ্জোর

সন্ধ্যার অল্প পরেই আমরা চিন্দাম্বরম থেকে ট্রেন ধরে তাঞ্জোর যাত্রা করলাম। দূরত্ব বেশি নয়। গাড়িতে ভিড় ছিল না একেবারে। রাত দশটা নাগাদ তাঞ্জোর ষ্টেশনে পৌঁছাই। তাঞ্জোরের নতুন নাম তাঞ্জাভূর। আমরা তাঞ্জোরই বলব। দারুণ বর্ষা হচ্ছিল বলে রেলের রিটায়ারিং রুমে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। দোতলায় ঘর। ব্যবস্থাদি ভাল কিন্তু ছাদ ফুটো, মেজেয় জল থৈ থৈ করছে। স্টেশন এলাকার বাইরেই অনেক ভাল থাকা-খাওয়ার জায়গা আছে, খরচও সেখানে কম। মিউনিসিপ্যাল রেষ্ট হাউসটির সুখ্যাতি শুনেছি অনেকের মুখে। রাজছত্রমও আদর্শ বাস ভবন বলে বিবেচিত হয়।

চিদাম্বরম্ থেকে তাঞ্জোর আসার পথে কুম্ভকোনম্ পড়ে। সেখানে মুগ্ধ হয়ে দেখবার যোগ্য কয়েকটি বিখ্যাত গোপুরম্ ও মন্দির আছে প্রধান দুটি মন্দির হ'ল শিব ও বিষ্ণুর। জনৈক সহযাত্রী এখানে নামবার জন্য আমাদের পীড়াপীড়ি করলেন। তাঁর ধারণা কুম্ভকোনম্ না দেখলে দক্ষিণ ভারতের কিছুই দেখা হল না। বিশাল ভারতের সব কিছুই দেখা একবার বেরিয়েই শেষ করে ফেলব এমন কোন দুরাশা আমরা পোষণ করি না। সহযাত্রীর নিজ বাসভূমির গৌরব-সচেতনতা বুঝতে কষ্ট হয় না। এরকম মানসিকতা আমাদের অনেকেরই আছে। তাই তাঁকে বিনয়ের সঙ্গে আমাদের অক্ষমতা জানালাম। ভ্রমণের সূচিতে রাত্রিটা বিশ্রামের সময়। তা সে গাড়িতে হোক বা হোটেলে হোক।

খুব ভোরে উঠে মালপত্র গুছিয়ে রেখে স্নানাদি সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রির ধারা বর্ষণের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। প্রসন্ন সূর্যালোকে আলোকিত শহরে সবই শুকনো খট্‌খটে। স্টেশনের বাইরে গরুতে টানা টাঙাগাড়ি। স্থানীয় নাম—বাইণ্ডি। চিদাম্বরমেও দেখেছি এমনি যান। গরুগুলি ছোটখাটো কিন্তু শিং তাদের দর্শনীয়। তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শিং জোড়া খাড়া হয়ে উঠেছে সমান্তরাল ভাবে।

শিংএর শীর্ষবিন্দুতে পিতলের টোপরও কেউ কেউ পরিয়েছেন। এই বিচিত্র যানে সওয়ার হওয়ার লোভ সম্বরণ করতে হল। কারণ চিদাম্বরমেই তাদের শ্লথগতির পরিচয় পাওয়া গেছে। আমাদের সময় এখন ঘন্টা-মিনিটে বাঁধা। তাই দ্রুতগামী যানবাহন ছাড়া উপায় নেই। প্রথম আমরা বৃহদেশ্বর মন্দিরে গেলাম।

সরকারী প্রচার পুস্তিকায় বলা হয়েছে, কাবেরী উপত্যকার সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি হ'ল তাঞ্জোর। বৃহদেশ্বর মন্দিরের বিশালতা, শিল্পরীতি, স্থাপনার কৌশল এবং সুরক্ষার বন্দোবস্তের অবশেষ দেখে সহজেই তার পূর্ব সমৃদ্ধি অনুমান করা যায়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ। বাইরের পাঁচিলটি দোতলা বাড়ির সমান উঁচু। সমগ্র পাচিলটির শীর্ষদেশে কয়েক ফুট অন্তর অন্তর অন্তর উপবিষ্ট বৃষমূর্তি। পাঁচিলের সঙ্গে অজস্র ব্যারাক টাইপ ঘর। মনে হয় এগুলি সৈন্য নিবাস ছিল। প্রবেশপথে একখানা সরকাবী বিজ্ঞপ্তিতে লেখা আছে প্রায় ৯০ বিঘা পরিমিত ভূমিখণ্ডে মন্দিরটি স্থাপিত। ১৯২৯ খ্রীঃ থেকেই এই মন্দির হরিজনদের নিকট উন্মুক্ত।

মূল মন্দিরটিতে এক বিশাল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য বহু মন্দির এই চত্বরে রয়েছে। শিবলিঙ্গের এখানে ছড়াছড়ি। দুর্গা ও শিবের ভিক্ষুক মূর্তি, আমরা যাকে অন্নপূর্ণা বলি, সরস্বতী, অর্ধনারীশ্বর, নটরাজ, কার্তিক সবই আছে। ইংরেজ পূর্ব ভারতের রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মবোধ, ঐশ্বর্য ও শিল্পরুচির যে সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল, এই মন্দিরটি তার নির্ভুল সাক্ষ্য বহন করে আজও দাঁড়িয়ে আছে। যেদিনকার রাজারা দেবতার প্রতিনিধি হয়েই রাজ্য শাসন করতেন। রাজ্যের সমস্ত সম্পদ দেবতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। রাজা নিজে যে কদাচিৎ কিছু গ্রহণ করতেন না তা নয়, অধিকাংশই তা সেবকের মনোবৃত্তি নিয়েই নিতেন। নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের, ও পাল-পার্বণের মধ্য দিয়ে রাজভাণ্ডারেব ধন জনসাধারণের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ত। খারাপ দু-চারজন যে ছিলেন

না, তা নয়। কিন্তু তা ব্যতিক্রম মাত্র। আজকের দিনেও, ব্যবস্থা যত ভাল হোক না কেন, মানুষটি খারাপ হলে তা কোন কল্যাণ করতে পারে না! আওরঙ্গজেবের মত অত্যাচারী মুসলমান সম্রাটও কোরাণ নকল করে যে পারিশ্রমিক পেতেন তা থেকেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখনকার সমাজচেতনা ও বিচারবোধে এটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়েছে। তাঞ্জোর তাই আমাদের সামনে সমগ্র ইতিহাসটা জীবন্ত করে তুলে ধরে। পুরোহিত পরিকর ছাড়া দেবদাসীই ছিলেন চার'শ। তারা সকলেই বৃত্তি পেতেন। তাদের নাচ গান শেখাবার জন্য নিযুক্ত ছিলেন আড়াই শতাধিক শিল্পী। তাঞ্জোরের প্রাচীন নাম নাকি অলকাপুরী। বিষ্ণু এখানে তাঞ্জো নামক দৈত্যকে হত্যা করেন। দৈত্যের প্রার্থনানুসারে এই শহরের নাম হয়েছে তাঞ্জোর। সত্য হোক মিথ্যা হোক শুনতে ভাল লাগে।

বৃহদেশ্বর শিবের মন্দির। সুতরাং নন্দী থাকবেই। এই মন্দিরের নন্দী মহারাজ বেশ বড় এবং দেখতে ভাল। আমার চোখে চামুণ্ডি পাহাড়ের মূর্তি অপেক্ষা সুন্দরতর মনে হয়েছে।

কার্তিকের একটি ময়ূর বিশেষ করে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এত অল্প পরিসরে এমন সুন্দর শিল্প রস সমৃদ্ধ রচনা খুব কমই আছে। আর একটি মন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ঋষি কারুভূয়ার মন্দির। ইনি কোন দেবতা নন। লোকশ্রুতি চিদাম্বরের বিখ্যাত নটরাজ মূর্তির নির্মাতাকে এই সম্মান দেন চোল সম্রাট। ঐ মন্দিরের বিমানটি এমনই কৌশলে স্থাপিত যে দিনের যে কোন সময়েই তার ছায়া ভূমি স্পর্শ করে না।

বৃহদেশ্বর মন্দির থেকে আমরা সরস্বতী মহলে এলাম। এটি মারাঠাদের কীর্তি। সামান্য কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে দারোয়ান আমাদের রাজবাড়ীটি দেখালেন। অযত্ন-রক্ষিত। ইতিহাসের অনেক পর্ব এর কক্ষে কক্ষে অভিনীত হয়েছে। লাইব্রেরীটি বন্ধ ছিল। যেমন

তেমন বন্ধ নয়। তালাগুলি পর্যন্ত সিল করা। তা থেকে অনুমান করলাম, অনেক মূল্যবান্ নথীপত্র, পুস্তক-পাণ্ডুলিপি এখানে রয়েছে। শুনেছি সংস্কৃত পুঁথির অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার এটি। বহু গবেষক নানা বিষয়ে এখানে গবেষণায় রত আছেন। তাঁদের জন্য এই পাঠাগারে একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে।

পাঠাগারের প্রবেশ পথে রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের একটি ছোট্ট মন্দির। রামদাস বাবাজীরও ছবি আছে একটি মন্দিরে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সরস্বতীর বরপুত্রদের সাক্ষাৎ মিলল না। পাশেই ছিল একটি নির্মীয়মাণ যাদুঘর। নগদ দক্ষিণা দিয়ে সেটাই ঘুরে ফিরে দেখলাম। নতুন কিছু নেই। মাদ্রাজ শহরের মিউজিয়ম দেখার পর এ সব কারো চোখে ধরবে না। সুদূর দক্ষিণেও যে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারিত হয়েছিল তার কিছু চাক্ষুষ প্রমাণ অবশ্য এই জাদুঘরে মিলবে। সঙ্গে একটি আর্ট গ্যালারিও আছে। দেখবার অবকাশ হয়নি। একজন ভাস্কর বসে কাজ করেছেন। তিনি দুইটি মূর্তি করে রেখেছেন—আন্নাদুরাই ও রবীন্দ্রনাথ—লোকজন ডেকে ডেকে দেখাচ্ছেন। প্রথমে মনে হল পয়সা চাইবেন। তাই আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। পরে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দেখে গেলাম সেখানে। ফিরে আসবার সময় তাঁকে কিছু দিতে গেলে তিনি সবিনয়ে তা নিতে অস্বীকার করলেন।

দুপুরে আমাদের ত্রিচিনাপল্লী রওনা হতে হবে। ত্রিচিনাপল্লীর নাম হয়েছে তিরুচ্চিরাপল্লী। আমরা পুরানো ত্রিচিনাপল্লীই ব্যবহার করব, এটা অনেক মধুর নাম। তাঞ্জোর থেকে দূরত্ব মাত্র ৫৬ কিলো-মিটার। অধিকাংশ লোক বাসেই যান। ষ্টেশনে মালপত্র রেখে বেড়াতে বেরোবার সুবিধা হবে বলে আমরা গাড়ীতেই গেলাম।

তাঞ্জোরে ভাষা-বিভ্রাট, খাদ্য-সঙ্কট। এখানে খুব কম লোক ইংরাজী বা হিন্দী জানেন। খাদ্য আমাদের গলা দিয়ে নামে না। সে

তুলনায় ত্রিচিনাপল্লী স্বর্গ। ষ্টেশনেই একজন রেলকর্মী বিনা ভূমিকায় বললেন, ধুতি পাঞ্জাবি দেখেই ধরে ফেলেছি বাংলা থেকে আসছেন। তিনি হাওড়া আমতা রেলের কর্মী। ঐ রেল বন্ধ হওয়ায় কর্মীদের অধিকাংশকে দক্ষিণ ভারতে বিকল্প চাকরী দিয়ে পাঠান হয়েছে। সকলেই যুবক, তাই বেপোরোয়া ভাবটা আছে। ভাল লাগল এঁদের কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে। এঁরাই পথঘাটের হদিস্ দিলেন, ভাল হোটেলের সন্ধান দিলেন।

ষ্টেশনের লেফট লগেজে মাল জমা দিয়ে আমরা প্রথমেই খাবার পাঠটি চুকিয়ে নিলাম। এত ভাল খাবার মাদ্রাজ ছাড়বার পর জোটেনি। হাফ-প্লেট বিরানি খেয়ে ওঠা দুঃসাধ্য।

শ্রীরঙ্গম্ ঃ রঙ্গনাথ মন্দির

ষ্টেশন থেকে এক নং বাস যায় শ্রীরঙ্গম্ রকফোর্ট ও রঙ্গনাথ মন্দিরে। শহরের পথ—কিন্তু নানা ফল ফুলের গাছে ছেয়ে আছে। শহর ও গ্রাম মিলে মিশে রয়েছে। প্রথমে আমরা রঙ্গনাথ মন্দিরে গেলাম। ভারত সরকাররের দপ্তর থেকে আমি যে সাইক্লোষ্টাইল করা ভ্রমণ সূচি পেয়েছিলাম তাতে রঙ্গনাথ স্বামী মন্দিরের নাম নেই। আমাদের পথের বন্ধু টেলকোর যুবক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এই মন্দিরের কথা বিশেষ করে আমাদের বলেছিলেন। বিশাল মন্দির। কোথায় শুরু আর কোথায় যে শেষ তা বুঝতে সময় লাগে। এক-দুদিনে ঠিক মত জেনে নেওয়া অসম্ভব। মূল মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ। তাই ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করছিলাম। ফল-ফুল কাপড়-চোপড় বাসন-কোসন চা জলখাবার এমন কি আনাজপত্রের দোকান পর্যন্ত রয়েছে মন্দির চত্বরে। এক জায়গায় দেখলাম মন্দিরে প্রাপ্ত কাপড়-চোপড়ের নিলাম হচ্ছে। শুনলাম এর মধ্যে একটি ডাকঘরও আছে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে হয়ত কিছু সন্দেহ হয়ে থাকবে—শ্রী ই. সম্পত নামে জনৈক বাঙ্গালোরবাসী উপযাচক হয়ে

আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কলকাতা থেকে আসছি কি না। আমাদের ইতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি ভাঙ্গা বাংলায় বললেন—অনেকদিন আমি কলকাতা ছিলাম। সে বছর কুড়ি হল। কলকাতার খেলাধূলার জগতে তখন সম্পত বাবুর একটা শ্লাঘনীয় পরিচয় ছিল। আরও বললেন —বাংলার প্রতি তাঁর অনুরাগের ফলে তিনি বাঙ্গালী পেলেই যেচে আলাপ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। ব্যাপারটা যাই হোক তিনি ভগবানের আশীর্বাদ হয়েই যেন আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য ছাড়া মন্দির দেখা সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেও প্রথমে আমরা তাঁকে পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারি নি। বিদেশ বিভূঁই, কার মনে কি আছে কে জানে। তাই গোড়ায় তাঁকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের আশঙ্কা আচরণে নিশ্চয়ই অপ্রকটিত ছিল না। ভদ্রলোক তা বুঝতে পারেন নি, এমনও নয়। তবু তিনি আমাদের সঙ্গ ছাড়েন নি। পরে বুঝেছি, ইনি নবকুমারের সমধর্মী মানুষ। আমাদের চিত্তের ক্ষুদ্রতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি।

সম্পত বাবু এখন বাঙ্গালোরে 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' কাগজের কর্মী। ত্রিচিতে বাড়ী। তাঁর দাদা এখানে থাকেন। মা অসুস্থ তাই ছুটি নিয়ে এসেছেন। স্থানটি যেমন তিনি চেনেন, এখানকার বহুজনেও তেমনি তাঁকে জানে।

মন্দিরের আহ্বান সম্পতবাবুর নিকট অপ্রতিরোধ্য। নগ্ন পদে মন্দির পরিক্রমা করা ওঁর নিত্যদিনের কাজ। ভক্ত মানুষ তিনি। আধুনিক শিক্ষা এই দক্ষিণের মানুষের হৃদয় থেকে ভক্তি ও বিশ্বাসের আসনটি টলাতে পারে নি। গীতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিনোবাজী বলেছেন, জ্যামিতির প্রমাণ উপস্থিত করতে আমরা বিনা তর্কে

মেনে নেই ক খ গ একটি ত্রিভুজ। শুরুতেই যদি তর্ক তুলি তা হলে সবই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অথচ ভগবানের বেলায় এতটুকু ঔদার্য অনেকের নেই। ক খ গ একটি ত্রিভুজ মনে করতে পারি কিন্তু বিগ্রহের শিলাখণ্ডে ঈশ্বর রয়েছেন এটা মনে করতে পারব না কেন? এই মনে করতে না পারলে অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে অসমর্থ হলে ঈশ্বর লাভ তো দূরের কথা, জ্যামিতিই শেখা হয় না। আমরা একজাতীয় তথাকথিত বুদ্ধিমান্ মানুষ অন্ধ বিশ্বাস ব'লে একটা কথা আবিষ্কার করেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব তাদের বিকৃত বুদ্ধির উপর কশাঘাত করেছেন দু'টি মাত্র কথায়—বিশ্বাস বিশ্বাসই, চক্ষুষ্মান বা অন্ধ বিশ্বাস বলে কিছু নেই।

সম্পত বাবু প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে বিশাল এই মন্দির কমপ্লেক্সটি আমাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখান। তাঁর মুখে এর অতীত ইতিহাস, নানা অলৌকিক কাহিনী আর কিংবদন্তি মিলে মন্দিরের নির্মাণ কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সহস্রাধিক বর্ষের ইতিহাস ছায়াছবির মত ভেসে উঠেছিল। সে এক দুর্লভ আনন্দময় অভিজ্ঞতা। শুধু গল্প শোনান নয়, প্রয়োজন মত ডেমনেষ্ট্রেশন দিচ্ছিলেন। একটা বিশেষ স্থানে গিয়ে বললেন এবার তাকান ঐ গবাক্ষ দিয়ে। মন্দিরের স্বর্ণচূড়া আর মন্দির রক্ষকের বিগ্রহ এত সুন্দর আর কোন স্থান থেকে নাকি দেখা যায় না। মূল মন্দির আর মন্দিরের শস্য-গোলার মধ্যে একটি দীর্ঘ ও উঁচু পাঁচিল আছে। সম্পতবাবু তার পাশে এসে বললেন—চিৎকার করে কাউকে ডাকুন। আমরা আর কাকে ডাকব? সবাই চুপ করে আছি। তিনি নিজেই চিৎকার করে কাউকে আহ্বান জানালেন। মিনিট খানেক ধরে সেই শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল। এরপর আমরাও দু'একবার চিৎকার করে প্রতিধ্বনি শুনেছিলাম।

মন্দির কমপ্লেক্সের কোন্‌খানে শুরু আর কোথায় শেষ তা বোধ

করি দু-চার-দশ দিনে মালুম হবার নয়। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ধরে এসেছিল, ক্লান্তিতে আমরা সবাই প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হাজার বছরের পুরানো এই মন্দিরটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শহর বিশেষ। ওঁরা বলেন 'মন্দির নগর'। পর পর সাতটা পাঁচিল দিয়ে মন্দিটি ঘেরা। সেই ঘেরা চত্বরের মধ্যেই জনবসতি, দোকান, বাজার, অসংখ্য দেব দেবী, পশু-পক্ষীশালা, শস্য-গোলা আপিস, ভাণ্ডার ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিগ্রহের নিত্য পূজা অর্চনা, সেই সঙ্গে ভক্তবৃন্দের সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য হাজার হাজার বিঘা জমি ছিল। উৎপন্ন ফসল সংরক্ষণেরই বা কি চমৎকার ব্যবস্থা। সাত সাতটা পাকা দোতালা গোলাঘরের ভগ্নাবশেষ এখনও এই মন্দির সীমানার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পশু-শালায় একদা বহুসংখ্যক হাতী ঘোড়া, গাই, বলদ ইত্যাদি ছিল। এখন একটি হাতী ও গোটা-কয়েক গাই মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। পক্ষীশালার আয়তনও হ্রাস পেয়েছে, দু'টি খাঁচায় সীমাবদ্ধ হয়েছে।

মূল মন্দিরে সর্প-শয্যায় শায়িত শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহ। অনন্ত শয়নে বিষ্ণু। ওরা বলেন রঙ্গনাথজী বা রঙ্গনাথ স্বামী। বিগ্রহের সামনে আছেন শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এবং ভক্ত কবি আলোয়ার। মূর্তি যেমন বিশাল অন্ধকারও তেমনি জমাট। বহুজনেব বিশ্বাস, ঐশ্বরিক নির্দেশে একরাত্রে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু উপচার সংগ্রহে ত্রুটি ঘটায় শেষ পাঁচিলটি সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই রাত শেষ হয়ে দিনমণির আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং দেবলোকের মিস্ত্রিরা কাজ শেষ না করে ফিরে যতে বাধ্য হন। আজও শেষ পাঁচিলটি অসম্পূর্ণ রয়েছে! এটিকে সম্পূর্ণ করার কোন চেষ্টাই কেউ যে কেন করেন নি, তাও আর এক বিস্ময়। দানিকেন সাহেবের এই মন্দিরটি দেখবার অবকাশ হলে—হয়ত গ্রহান্তরের মানুষের আর একটি অসম্পূর্ণ কাজের উদাহরণ তাঁর বইতে যোগ করতে সমর্থ হতেন।

একরাত্রে দেবস্থান নির্মাণের বিচিত্র কল্পকথা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত আছে, বহু মানুষ তা বিশ্বাস করে থাকেন। গ্রহান্তরের মানুষ একদা পৃথিবীতে এসে এসব শিল্পসমৃদ্ধ স্থাপত্যাদি নির্মাণ করেছেন তাঁদের উন্নততর যন্ত্রবিদ্যা ও প্রযুক্তিজ্ঞান প্রয়োগ করে। সাধারণ মানুষের অসাধ্য নানাবিধ কাজকর্মের নিদর্শন, এমন কি বুদ্ধির অগম্য (যেমন, দিল্লীর লৌহ স্তম্ভে মরচে পড়ে না কেন) বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে দানিকেন সাহেব গবেষণা করছেন। মানুষের পক্ষে গ্রহান্তরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বেশি অপেক্ষা করা যে সম্ভবপর নয় তা তো আমরা জানি। অনুরূপ ভাবে গ্রহান্তর থেকে যাঁরা আসতেন তাঁদের পক্ষেও ঘণ্টা মিনিট ধরে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই পৃথিবী ত্যাগ করতে হত। তাই সময় হলে হাতের কাজটি শেষ হোক বা নাই হোক, তাদের ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকার কথা নয়। দূর অতীতের এই রকম কোন ঘটনা থেকে এই জাতীয় কিংবদন্তির উদ্ভব হওয়ার বিষয় যাঁরা অনুমান করেন তাদের কথা এখন আর চট করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মন্দিরে মন্দিরে কত যে দেব দেবী তার কোন হিসাব করা শক্ত। একটি মন্দিরের মূর্তির স্থাপনা বিচিত্র ধরনের। সর্বত্র আমরা মূর্তিগুলি পাশাপাশি স্থাপিত দেখেছি। এখানে লাইন করে দাঁড় করান। সম্মুখে যিনি তাঁর আকার সব চেয়ে ছোট, নাম রঙ্গনায়িকা। তাঁর পশ্চাদ্দেশের জন্য একটু বড়, নাম—শ্রীভূমি দেবী। সর্ব পশ্চাতে আছেন শ্রীদেবী এবং তিনিই সর্ববৃহৎ। মন্দিরের দেওয়ালে আলপনা আঁকা। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির প্রতীকটিই যেন আলপনার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভূমিদেবী বোধ হয় ভূমাতা। এঁর কোন মূর্তি দেখিনি অন্য কোনখানে। তবে একখানা প্রার্থনা পুস্তকে একটি সুন্দর মন্ত্রে তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে। "হে, বসুন্ধরা মাতা! সমুদ্র তোমার বস্ত্র, পর্বত তোমার স্তন, বিষ্ণু তোমার স্বামী, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি পা দিয়ে তোমাকে স্পর্শ করে থাকি তুমি আমায় ক্ষমা করো।" ভূমিদেবী বিষ্ণুর স্ত্রী বলেই এখানে তাঁর অবস্থান অপরিহার্য।

মূল মন্দিরে ঢুকবার দর্শনী পঁচিশ পয়সা। ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। তারপর আছে দরজায় দরজায় প্রণামী। পাণ্ডা পুরোহিতের অবশ্য জুলুম নেই। সামান্য কিছু দিলে প্রসন্ন আশীর্বাদ পাবেন। না দিলে মুখটা অপ্রসন্ন হয় কদাচিৎ। দান সংগ্রহের জন্য ছোট বড় নানা আকারের সছিদ্র লোহার সিন্দুক ও বসান হয়েছে বেশ কয়েকটি।

সৌভাগ্যক্রমে রক টেম্পলে সন্ধ্যারতি ও এই মন্দিরের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। সুবেশী ব্রাহ্মণেরা বাদ্য ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে সুসজ্জিত রঙ্গনাথজীর একটি দণ্ডায়মান মূর্তি শিবিকায় বহন করে মন্দিরে থেকে অঙ্গনে খানিকটা দূর নেমে এলেন। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গার দাঁড়িয়ে বিবিধ আচার অনুষ্ঠান ও পূজা করা হ'ল। বিগ্রহ সহ শিবিকা কাঁধে করে বাহকেরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। পূজা পাঠ সমাপ্ত হলে তাঁরা পিছু হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরে প্রবেশ করলেন! শিবিকাটি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র একটা ভ্রূপসিনের মত ভারী বড় পর্দা ফেলে দেওয়া হ'ল। মন্দিরটি বেদী ফুল ও মালা দিয়ে সুন্দর করে সাজান ছিল। বৈকুণ্ঠ একাদশীতে (মাঘ মাসে) প্রধান উৎসব হয়।

আর এক জায়গায় দেখা গেল মালাকারের দল ফুল পাতার সাজ তৈরী করছেন। এই সজ্জা রচনায় নারকেল পাতার ব্যবহার প্রচুর। উৎসব-অঙ্গন নারকেল পাতা আর কাঁদি সমেত কলাগাছ দিয়ে সাজানো হয়।

মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে পুকুরও আছে। নাম তার চাঁদ পুকুর। গোল একটি পুকুর ইট দিয়ে বাঁধানো। ঠাকুরের জল বিহারের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী। বৃষ্টিতে জল একদিকে উপচে পড়ছে, তাতে অগণিত তেলাপিয়া মাছ। অনেক্ষণ ধরে ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পুকুরঘাটে একটু বসে জিড়িয়ে নিলাম। উৎসবের

দিন ছেলেরা এখানে নানা রকম সাঁতারের কসরৎ দেখায় বলে সম্পৎ বাবু জানালেন।

পুকুর থেকে উঠে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটি কলাপ্সিবল গেট দিয়ে বন্ধ করা হল ঘরের সামনে এলাম। সম্পৎবাবু বললেন—এটি সহস্র স্তম্ভ গৃহ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখানে অনেক মন্দিরেই নাকি সহস্র স্তম্ভের মণ্ডপ আছে। সম্পৎবাবু বললেন প্রায় সব মন্দিরে এই রকম একটা মণ্ডপ আছে, কিন্তু ঠিক সহস্রটি স্তম্ভ আর কোথায়ও নেই। এই স্তম্ভের অনেকগুলিতে হাতের আঘাতেই নাকি বাজনার বোল তোলা যায়। অনুরূপ বাদ্যময় স্তম্ভ আরও কয়েকটি মন্দিরে আছে।

এই মন্দিরের দণ্ডায়মান শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি আর তাঁর গলার শাল-গ্রাম শিলার মালা, দুটোই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মালাটি নাকি নেপালের মহারাজার অর্ঘ্য। পুরোহিতরা সেটা বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেন। বলবার মত কথাই বটে। সারা পৃথিবীতে নেপালের মহা-রাজাই একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজা। হিন্দু মন্দিরে তাঁর প্রদত্ত অর্ঘ্য বিশেষ মর্যাদা পাবে না কেন?

আমাদের চেয়ে সম্পতবাবুর আগ্রহই যেন বেশি। অন্যান্য মন্দির থেকে এই মন্দিরের নৃসিংহ মূর্তি, গরুড় ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য কি তা আমাদের বিশদভাবে বোঝাতে চাইলেন। আমাদের তখন শোনবার ধৈর্য নেই, মনও ছিল না। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ, আমাদের মনের অবস্থা বুঝে বললেন—চলুন, 'ক্লেভার কাবেরী' দেখে আসি। দুষ্ট সরস্বতীর কথা শুনেছি। নদীর বেলা পাগলা, প্রমত্তা, কীর্তিনাশা ইত্যাদি বাংলায় ব্যবহৃত হয়। ক্লেভার বা চতুর বিশেষণ ইতিপূর্বে কোন নদনদীর ক্ষেত্রে শুনি নি। জিজ্ঞাসা করলাম এই অঞ্চলের ঐশ্বর্যের সিংহ ভাগ কাবেরী দান—অথচ আপনারা তাকে চতুর বলে কটাক্ষ করছেন কেন? সম্পতবাবু বললেন—কাবেরী যেমন সম্পদ তেমনি বিপদও বটে। বন্যা ও গতিপরিবর্তন নাকি নিত্যকার ঘটনা।

মন্দিরের খানিকটা দূর থেকে কাবেরী দুটো ভাগ হয়ে মন্দির ভূভাগকে দ্বীপের আকৃতি ও নিরাপত্তা দিয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা নদী তীরে এসে পড়েছি। সম্পতবাবু কোন কথা না বলে তরতর করে হাটু অবধি জলে নেমে পড়লেন। আমাদেরও আহ্বান করলেন। আমরা ইতস্ততঃ করছি দেখে তিনি বললেন, নামলেই 'চতুর কাবেরী'র একটা পরিচয় হাতে হাতে পেয়ে যাবেন। এবার নামতেই হল। নদীর জল যথেষ্ট উষ্ণ। বৃষ্টিবাদলার দিনে স্রোতস্বিনীর জলে একটু গরমের আমেজ পাওয়া যায়; এটা তার চেয়ে নিশ্চয়ই বেশি। কেন এমনটি ঘটে সম্পতবাবু তা বলতে পারেন না। কাবেরী পুণ্যতোয়া।

কাবেরীর যে ঘাটে আমরা নেমেছিলাম তার পাশেই এ অঞ্চলের বিখ্যাত শ্মশান। নারকেল কুঞ্জের পট ভূমিকায় নদী তীরে বাঁধান একটি চত্বর। পোড়া কয়লা ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দেখে বুঝা যায় আজই এই স্থানটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের চোখে এর কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ল না। জনৈক সাংবাদিক বলেছেন মাদ্রাজী শবযাত্রা, কাবুলীওয়ালার বউ এবং পাঞ্জাবী ট্রাম কণ্ডাকটর কলকাতায় নেই। কয়েক ঘণ্টা আগে এলে অন্ততঃ মাদ্রাজী শবদাহটার রীতিনীতির কিছু দেখা যেত।

মন্দির থেকে নদী সামান্য পথ। তারই মধ্যে দু-চারটি চালা ঘর ও বসতি দেখা গেল। আসবার পথেই দেখেছি শহর আর গ্রাম এখানে একত্র হয়ে আছে। নদীতীরে একান্তই গ্রামীণ দৃশ্য, গ্রামের আবহাওয়া। কাছাকাছি ভাল ও বড় গ্রাম থাকতে পারে মনে করে সম্পতবাবুকে বললাম, আমাদের একটি গ্রাম দেখিয়ে দিন। একজন জানা চেনা লোক না থাকলে গ্রামে যাওয়ার অনেক অসুবিধা; তাতে পরিশ্রমই সার হয়, জানা হয় না তেমন কিছু। কেরলে গিয়ে বুঝেছিলাম একেবারে গ্রামে ইংরেজী জানা লোক একান্তই বিরল। তা ছাড়া স্থানীয় সামাজিক আদব-কায়দা রীতি-নীতি জানা না থাকলে লোক-ব্যবহার সম্ভব নয়।

সম্পতবাবু আমাদের প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দিয়ে বললেন—গ্রামে কিছুই নেই দেখবার। তিনি প্রায় সারা ভারত ঘুরেছেন—বাংলার চেয়ে (অবিভক্ত) সুন্দরতর গ্রাম কোথায়ও পান নি। তিনি বিশেষ করে বাড়ি করার বাঙলা পদ্ধতি এবং ঘরগুলির গঠন নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সম্পতবাবু পূর্ববাংলা দেখেন নি। পূর্ববাংলার কোন কোন এলাকায় গ্রামগুলি ছবির মত সাজান। এ দেশে গ্রামের সে সৌন্দর্য নেই।

আবার ফিরে এলাম মন্দিরে। কারণ মন্দিরের মধ্য দিয়েই পথ। অন্য পথ আছে কিন্তু নৈকট্যের জন্য এটাই সকলে ব্যবহার করেন। যা দেখেছি তার শতাংশের একাংশও লেখা সম্ভবপর নয়, মনেও থাকে না সব। এখানেই এ মন্দিরের কথা শেষ করি। শেষেরও শেষ কথা হিসেবে বাঙালী পাঠককে একটা কথা বলা দরকার। এখানেও নানা আকারের দুর্গা মূর্তি দেখেছি। দুর্গা বটে কিন্তু আমাদের মা দুর্গা নন।

রক টেম্পল

কখন যে সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রি এ'ল খেয়াল করতে পারি নি। মন্দির ও পথের উজ্জ্বল আলোর বন্যা থেকে বেরিয়ে এসে বুঝতে পারলাম বেশ রাত হয়েছে। হাতে আমাদের সময় কম। অতএব জম্বুকেশ্বর ও রক টেম্পল দুটো দেখা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। শরীরও আর বইছে না। ওদিকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। অতএব কেউ কেউ সরাসরি স্টেশনেই ফেরার প্রস্তাব করলেন। বাদ সাধলেন সম্পতজী। তিনি একেবারে রা রা করে উঠলেন। তাঁর কথার মর্ম হল জম্বুকেশ্বর মন্দিরে না গেলেও চলবে, অমন মন্দির আরও অনেক আছে এ দেশে। কিন্তু রক টেম্পলে যেতেই হবে, নইলে ত্রিচি (ত্রিচিনাপল্লীকে ছোট করে ত্রিচি বলেন স্থানীয় জনেরা) আসা মিথ্যে হয়ে যাবে। এক রকম জোর করে তিনি আমাদের বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

চোখের সামনে তৈরি করে দেয় এমন একটি আইস ক্রীমের দোকানে খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ করে নিয়ে মন্দিরের দিকে পা বাড়ালেন।

আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করি সম্পতজী জোর জবরদস্তি না করলে আমরা একটি দুর্লভ জিনিস দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম। এই মন্দিরের প্রবেশ পথে রয়েছে শহরের প্রধান বাজারটি। দেওয়ালী এসে পড়েছে তাই বাজার তখন জমজমাট। দেওয়ালী এ অঞ্চলের অন্যতম উৎসব হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর মুল না ক সমাজের গভীরে তেমন প্রবেশ করে নি। তাই এটা বহুলাংশে পোশাকী উৎসব। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পঙ্গাল নামে নতুন চাল ও নববস্ত্রের যে উৎসব হয় সেটাই এদের সত্যকার জাতীয় উৎসব। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত ছোট হলে কি হবে—ভ্রমণকারীদের কল্যাণে বেশ সমৃদ্ধ। বাজারে একাধিক শীত-তাপ-নিয়ন্ত্রিত দোকান, এমন কি, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সেলুন পর্যন্ত আছে।

পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির। তাই বুঝি নাম হয়েছে রক টেম্পল বা শৈল মন্দির। সদর রাস্তা থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি রাস্তা চলেছে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির প্রারম্ভ পর্যন্ত। তার দুপাশও দোকানপাটে ঠাসা। বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভ গণেশ ঠাকুরের মন্দির। সিঁড়ি গোড়াতেই একটি বেশ বড় সড় গণেশ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা কোন কারণে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে সমর্থ হন না তাঁরা এখানেই পূজা নিবেদন করে তৃপ্ত থাকেন। উপরে যাঁরা ওঠেন তাঁদেরও পক্ষেও এই মূর্তির পূজা করে ওঠা বিধেয়।

সম্পতবাবুর নির্দেশে আমরা কিছু কর্পূরের প্যাকেট কিনে নিলাম। তার থেকে একটু প্রথম গণেশ ঠাকুরের পূজারীর রেকাবীতে দিলাম। তিনি সেটি প্রজ্জ্বলিত করে ঠাকুরের আরতি দিয়ে অগ্নিশিখাটি আমাদের সামনে ধরলেন। সেই শিখার উপর ডান হাতের তালুটি ঘুরিয়ে হাত-খানা কপালে ও মুখে সকলে বুলিয়ে নিলাম। এটাই প্রচলিত নিয়ম।

এর তাৎপর্য জানতে পারি নি। আমাদের দেশে শ্মশান থেকে ফিরলে অগ্নি স্পর্শ করতে হয়। মন্দিরে কর্পূর আরতি হয়। প্রকার প্রথাগত কিছু কিছু ভিন্নতা সত্ত্বেও মূলে সব এক।

বঙ্গে হোমের যেমন গোলাকৃতি ফোঁটা দেওয়া হয় এখানে তেমনটির প্রচলন নেই। তবে ভস্ম মাখেন প্রায় সবাই। শৈব যাঁরা তাঁরা কপালে তিনটি সমান্তরাল রেখা টেনে মধ্যে ফোঁটা কাটেন। আর বিষ্ণুভক্তগণ হাড়িকাঠের উপরাংশের মত একটি চিত্র আঁকেন এবং তার দু বাহুর মধ্যস্থলে ফোঁটা দেন। অনেকের কপালে এই ফোঁটাটি রক্তবর্ণ দেখেছি।

যত্ন করে ভস্ম পরার সময় না হলে কপালে লেপ্টে নেন অনেকেই। বহু স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীর কপালে ভস্ম দেখেছি সর্বত্র। আমাদের এয়োস্ত্রীদের সিঁদুর পরার আর একটা রূপ কি এই ভস্ম মাখা? মানসিকতা ঐ একই তা বোধ হয় স্বীকার করতেই হবে।

মূল মন্দিরটি পাহাড়ের চূড়ায়। পাহাড় কেটে সিঁড়ি করা হয়েছে। বিজলি আলোয় সর্বত্র আলোকিত। সিঁড়িগুলি রং চং করা। সম্পত বাবুকে অনুসরণ করে আমরা উঠতে শুরু করেছি। অধিকাংশ পথটাতে মাথার উপর আচ্ছাদন আছে বলেই মনে হল। এক জায়গায় দেখা গেল অনেক উঁচু খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে সিঁড়ি চলেছে, মাথার উপর খোলা আকাশ। পাহাড়টির উচ্চতা বেশি নয় মাত্র ২২৩ ফুট। তবু ক্লান্ত দেহে উঠতে আমাদের বেশ কষ্ট হল। কিন্তু শীর্ষদেশে উঠে সে কষ্ট ভুলে গেলাম। মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়তি পাওনা জুটল। আলোকিত ত্রিচি শহরের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে। দীপাবলীর উৎসবে সজ্জিত আলোকোজ্জ্বল শহরটি মনে হল বাস্তবের ধরা ছোঁয়ার অতীত আমাদের নাগালের বাইরে সুন্দর এক স্বপ্নপুরী। শহরটি যে বেশ বড় হচ্ছে তা এখান থেকে সহজেই বুঝা যায়। এই শহরের নিকট অতীতের ইতিহাসও আপনার মনে হবে

এখানে দাঁড়িয়ে। চোখের সামনেই ভেসে উঠবে হায়দার, টিপু, চাঁদা সাহেব ইত্যাকার সব মানুষ। কেরাণী ক্লাইভের সৈনিক বৃত্তির সূচনা নাকি এই শহর থেকেই।

পর্বত শীর্ষ মন্দির প্রাঙ্গণ তখন জনবিরল। আমরা কয়েক জন ছাড়া অন্য কোন দর্শনার্থী দেখলাম না। তবে ঐ রাতের বেলাতেও সেখানে একটি ছাগল চরতে দেখা গেল। কি খেতে ও এসেছে এই পাহাড়ের চূড়ায় তা মালুম হল না। সবুজ ঘাসের নাম গন্ধ নেই এর ত্রিসীমানায়। সর্বত্রই কঠিন জমাট বাঁধা পাথর। আর ও উঠল কেমন করে সেও এক বিস্ময়। একটি হনুমান বাহাদুরও নিশ্চিন্ত মনে সিঁড়ির রেলিং এ বসে আছে। মন্দিরের কাছাছাছি সিঁড়ির শেষ বাঁকটিতে নানা প্রকার টুকি টাকি কিউরিয়োর ছোট একটি দোকানও আছে।

বিগ্রহ দর্শনের পর মন্দির প্রদক্ষিণ ভক্ত জনের অবশ্যকরণীয় কাজের অন্যতম। প্রদক্ষিণের সুবিধার জন্য পর্বত শীর্ষের এই মন্দিরটির চারি পাশে বারান্দা করা হয়েছে। সেই বারান্দার নানা স্থান থেকে তলদেশ এক দেড়শ ফুট পর্যন্ত গভীর। দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য বারান্দাগুলি মজবুদ গ্রীল দিয়ে ঘেরা হয়েছে হাল আমলে। কিছুকাল আগে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতাশ বা দেবতার পায়ে জীবন্ত উৎসর্গ করতে কৃতসঙ্কল্প ভক্তগণ এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন আহুতি দিতে শুরু করেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে মন্দির কর্তৃপক্ষ বারান্দাগুলি ঘিরে দিয়েছেন।

কয়েক দিন আগে এই শহরে ডি এম কে ও আন্না ডি এম কে দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে গেছে। সে উত্তেজনা তখনও পূর্ণ প্রশমিত হয় নি। জনজীবনে তার প্রভাব কিন্তু সামান্যই। তবুও অধিক রাত করা সমীচীন হবে না। এমনিতেই সাধারণ নিয়মে রাত আটটার পর পর্বত শীর্ষে উঠতে দেওয়া হয় না। তাই আমরা বেশি দেরি না করে নেমে

এলাম। নামতে কষ্ট কম। তখন ধীরে সুস্থে নামলে সিঁড়ির দু পাশ সহজে একটু মন দিয়ে দেখা যায়। সিঁড়ির পাশেই নানা ফলক বসান। তার একটি থেকে জানা যায় গবর্ণর জেনারেল লর্ড রীডিং ১৯২৩ সনের ৭ ডিসেম্বর এই মন্দিরে বিজলি আলো জ্বালিয়ে দেন। ১৯২৩ সনে সারা ভারতে যে ক'টি স্থানে বিজলি আলোর ব্যবহার ছিল তা তো হাতে গুনে ফেলা যায়। এই একটি মাত্র ঘটনা থেকে মন্দিরটির জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধ হতে পারে।

পাহাড়ের স্তরে স্তরে মন্দির সাজান। একটি শিব মন্দিরে ভোগ আরতি দেখবার সুযোগ হল। বিচিত্র সব বাজনায় আকৃষ্ট হয়ে আমরা সেদিকে গিয়েছিলাম। সম্পতবাবু ঐ বাজনার মানে জানেন। অর্থাৎ বাজনা শুনেই বুঝতে পারেন ব্যাপারটা কি ঘটছে। তাই দূর থেকেই বলছিলেন চলুন আরতি দেখে আসি। ওরা বলেন আরত্রিক।

ঐ পাহাড়েও নানা দেব দেবীর অর্চনা হয়। একটি শিব মন্দিরে আরতি হচ্ছিল। বৈকালিক ভোগ নিবেদন করার পর আরতি শুরু হয়। ভোগের সময় মুহূর্ত খানেকের জন্য দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রথমে দীপাবলী আরতি। একই দণ্ডে একাধিক প্রজ্বলিত প্রদীপ সাজান—দেখতে ভারি সুন্দর। দীপ-বৃক্ষ। আবার কলসের আকৃতি প্রদীপেরও আরতি করা হল। তারপর কর্পূরের আলোর আরতি। তিনটিতে মোট মিনিট দুই সময় লেগেছিল। সানাইয়ের মত লম্বা লম্বা বাঁশি, এরা বলেন নাদস্বরম্, ও দামামার মত ঢোলবাজনা ছিল সঙ্গে। জনৈক সাহায্যকারী পুরোহিতের হাতে খুবই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং একান্ত অনুগত ভঙ্গীতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তুলে দিচ্ছিলেন। আরতি শেষ হওয়া মাত্র অন্য এক ব্যক্তি সেগুলি সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এবং তৃতীয় এক জন দুর্বোধ্য গান শুরু করে দিলেন। মিনিট খানেক মাত্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দেখে মনে হল দীর্ঘকাল আচরিত কর্মের প্রাণহীন অনুবর্তন করা হচ্ছে। একদা এই অনুষ্ঠান নিত্য নবনব সৃষ্টির আনন্দ

ও ভক্তির লাবণ্যে যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্খলন কেবল মন্দির কিম্বা পূজা-আরতিতে সীমাবদ্ধ নেই। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই তো এই রকম দায়সারা গোছের কাজ করছি আমরা সকলে। অরবিন্দ বলেছিলেন, sprituality is the foundation of Indian culture। আমরা ভারত সংস্কৃতির সেই মূল ভিত্তি অধ্যাত্ম চেতনা থেকে সরে এসেছি বলেই হয়ত এই বিড়ম্বনা।

তুলনামূলক ভাবে রামেশ্বর মন্দিরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন। পূজা ও ও আরতির সুষমা অনেক বেশি ভক্তিবিনম্র এবং চিত্তাকর্ষক।

এই চত্বরেই কার্তিক ঠাকুরের ছয় মুখ বিশিষ্ট একটি মূর্তি আছে। কার্তিক এ দেশে জনপ্রিয় দেবতা। বহু নামে তাঁকে অভিহিত করা হয়। সুব্রহ্মণ্য, মুরুগা, সাস্তা, প্রভৃতি নামগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। তবে তাঁর ষড়ানন নামটি বাঙালী জানে। কিন্তু ছয় মুখের ছবি বা মূর্তি ইতিপূর্বে দেখি নি। ছ'টি মুখ বা মাথা ভগবানের ষড়্গুণের প্রতীক। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বল, কীর্তি, শ্রী এবং ঐশ্বর্যকে এই ষড়গুণ বলা হয়। অন্য মতে কার্তিক ঠাকুর চার মুখে চতুর্দিক দেখেন আর অবশিষ্ট দুই মুখে উর্ধ্ব ও অধোদেশের প্রতি নজর রাখেন। ছ'টা যখন মুখ তখন দুখানা হাত শোভন হতে পারে না। চারখানা হাতের তিনি অধিকারী এখানে। আজকাল বিদ্যুৎ শক্তিকে হর্স পাওয়ার বা অশ্বশক্তির হিসাবে নির্ণয় করা হয়। পৌরাণিক যুগে শক্তিধর মানুষের শক্তির তারতম্য অনুসারে দুহাতের বদলে চার আট বা দশ হাত। দেখানোর রেওয়াজ হয়েছিল কি না তা আজ জানবার উপায় নেই। তেমনি বুদ্ধি বুঝিবা নির্ণীত হত মাথার সংখ্যা দিয়ে।

এদেশে অনেক মন্দিরে দেবদেবীর সঙ্গে সাধুসন্তদের মূর্তি রক্ষিত হয়। এখানে তাঁরা সংখ্যায় কিছু বেশি বলেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকবেন। মূর্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি। গভীর অধ্যয়ন অনুধ্যান ছাড়া এর প্রকৃত ইতিহাস ও তাৎপর্য জানা যায় না।

নানা পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে এঁরা মিশে আছেন। কিংবদন্তি ও পৌরাণিক ঘটনার চিত্রও রয়েছে কিছু কিছু। এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সংযোজন। এই মন্দিরের একটি বহু-আলোচিত ছবি হল, দোলনায় শায়িত নবজাত শিশু, প্রসূতি ও দুই বৃদ্ধা—একজন চলমান, অন্যজন উপবিষ্ট। একটি মধুর কাহিনীর প্রতীক এটি। ভক্তের প্রয়োজনে ভগবান্‌কে অনেকবার ধরণীর ধূলায় নেমে আসতে হয়েছে তা আমরা জানি। গীত গোবিন্দের অসমাপ্ত শ্লোকের পদ পূরণ করেছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছেন মা কালী—এমনি কত কাহিনী আমরা জানি। আলোচ্য ছবির প্রসূতি হলেন শিবভক্ত রত্নাবলী। শিশু তাঁর নবজাত সন্তান। চলমান বৃদ্ধা শিবঠাকুর এবং উপবিষ্ট বৃদ্ধা রত্নাবলীর জননী।

প্রসব-বেদনা-ক্লিষ্টা রত্নাবলী সাহায্যের জন্য মাতৃদেবীকে আহ্বান করেছেন। মা থাকেন কাবেরীর অপর পারে। ঝড় তুফানের দুর্যোগে তিনি নদী পেরোতে না পেরে সারা রাত সেখানেই অপেক্ষা করতে বাধ্য হলেন। ইতিমধ্যে রত্নাবলীর সাহায্য না হলে চলে না। শিবের একনিষ্ঠ ভক্ত তিনি। তাই শিব ঠাকুর আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। রত্নাবলীর মায়ের রূপ ধরেই তিনি এলেন, তাঁকে প্রসবে সাহায্য করলেন ইতিমধ্যে রাত পোহাতেই রত্নাবলীর আসল মা এসে উপস্থিত। তার কয়েক মিনিট আগে মাতৃরূপী শিব ঠাকুর প্রস্থান করেছেন। রত্নাবলী তো এ রহস্য জানেন না! তিনি মনে করলেন মা কিছু ভুলে গেছেন,তাই ফিরে এসেছেন। প্রশ্ন করলেন: মা, তুমি যে আবার ফিরে এলে? মা বল্লেন—ফিরে এলাম কি রে? এই তো সবে আসছি। রত্নাবলী তো অবাক্। বুঝতেই পারেন না মা কি বলছেন। তবু প্রতিপ্রশ্ন করেন—এই আসবে কি, তুমি সারা রাত ধরে আমাকে সাহায্য করলে—এই তো কয়েক মিনিট হল ব্যস্ত হয়ে চলে গেলে। মাও মেয়ে এক সময় বুঝলেন স্বয়ং শিব ঠাকুর এসেছিলেন বিপন্ন ভক্তকে সাহায্য করতে।

গল্পটি নিয়ে অনেক উকিলি তর্ক বিতর্ক করা যেতে পারে। সত্য হোক মিথ্যা হোক কাহিনীটির মাধুর্য অনস্বীকার্য। গল্পটি শুনতে শুনতে আমার মনে পড়েছিল মনু গান্ধীর একখানা ছোট বইয়ের কথা—বাপু মাই মাদার।

মুগ্ধ বিস্ময় এবং মধুর স্মৃতি নিয়ে এক সময়ে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে জনাকীর্ণ রাজপথে বেরিয়ে এলাম। এ এক ভিন্ন জগৎ। মন্দির থেকে বেরোবার পর কিছু সময় লাগে এই জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে। হিসাবের বাইরে অনেক বেশি সময় খরচ হয়ে গেছে। অতএব ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম স্টেশনে। আমরা স্টেশনে পৌছুতে না পৌছুতে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। ভগবানের কি অসীম করুণা! দিনের বেলায় এমনি বৃষ্টি হলে সারাজীবনের মত আজকের এই দর্শনের দুর্লভ আনন্দ লাভের সৌভাগ্য হত কিনা সন্দেহ। টাকা এবং সময় কোনটাই আমাদের জীবনে সুলভ নয় বলে দ্বিতীয় বার আসবার কথা কল্পনাও করতে পারি না। তাই নীরবে শ্রীভগবানের চরণে শত কোটি প্রণাম নিবেদন করে আমরা রামেশ্বরম্ যাত্রা করলাম। রামেশ্বরম্ রেলপথে এখান থেকে ২৫৪ কিলোমিটার। ত্রিচি ছাড়বার আগে হাল আমলের একটি উৎসবের কথা একটু বলা দরকার। এবারই নতুন হল এটি।

কাঞ্চী কামকোটী পিতমের শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের (ইনি প্রধান শঙ্করাচার্য নামেও আভহিত হন) নির্দেশে এবার সর্বজনীন মঙ্গল কামনায় সুভাষিণী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০৮ জন সুমঙ্গলা নারী ৯ জন করে বারটি দলে ভাগ হয়ে এই পূজা করেন। গণেশ পূজা দিয়ে আরম্ভ হয়, পরে অন্নদান ও সমারাধনা হয়। এতে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই শঙ্করাচার্য বিশেষ আশীর্বাদ স্বরূপ একটী করে রৌপ্য মুদ্রা পাঠিয়েছেন। আমাদের দেশের সর্বজনীন পূজা থেকে এটি ভিন্ন। আমরা সকলে মিলে পূজা করি। এখানে পূজা হল সকলের জন্য।

ত্রিচির আর একটি আকর্ষণ জম্বুকেশ্বর মন্দির। এখানে অপরূপী লিঙ্গ মূর্তি। কাবেরীর একটি শাখা এখান দিয়ে প্রবাহিত।

রামেশ্বর

ত্রিচিনাপল্লী থেকে আমরা রামেশ্বর প্যাসেঞ্জার গাড়ি ধরলাম। এতে সময় একটু বেশি লাগে বটে, কিন্তু শয়নযানে সহজেই জায়গা মেলে। ভ্রমণকারীর পক্ষে রাতের বিশ্রামটা অপরিহার্য। পরের দিন সকাল দশটায় আমরা রামেশ্বরম্ এলাম। বাঙালীর নিকট স্থানটি রামেশ্বরম্ নয়, রামেশ্বর। বৃষ্টির নাম গন্ধ নেই। নির্মল নির্মেঘ আকাশে দীপ্ত সূর্য। আমাদের চেনা পৃথিবীর সঙ্গে এর মিল নেই। লোকের ভাষা বুঝি না। ইংরেজী ও হিন্দী জানা লোক দুর্লভ। প্রকৃতি অপরিচিত। রক্তরঙ্ বালির পাহাড় জমে আছে এখানে সেখানে নানা স্থানে। আসতে এক জায়গায় দেখেছি একটা পাকা বাড়ির ছাদের কার্নিস পর্যন্ত বালির তলায় ডুবে আছে।

মণ্ডপম্ ও পামবান (পাম বন ?) স্টেশনের মধ্যেকার দীর্ঘ পথ সমুদ্রের বুকে ট্রেনটি যেন ভাসতে ভাসতে আসে। সেতুটি সাধারণ কালভার্টের মত। উপরের দিকে ফ্রেম নেই, যেমন আছে হাওড়া বা দক্ষিণেশ্বরের ব্রিজে। যেদিকেই তাকাই কেবল দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে সামান্য স্থলভাগের আভাস। জলযান যে কিছু চোখে পড়ে না, তা নয়, তবে তা আমাদের মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। সেতুর পরে ধীর গতি ট্রেনে বসে সমুদ্র দর্শনের আনন্দ ও সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে সামান্য ভয় মিশ্রিত উৎকণ্ঠা যাত্রীদের একেবারে নীরব করে রাখে। হাওয়ার দাপটও বেশ। জল নিস্তরঙ্গ। মনে পড়ল, এই তো সেদিন ১৯৬৪ সনে রামেশ্বর আর ধনুষ্কোটির মাঝে একখানা যাত্রীবোঝাই পুরো গাড়ি সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেসে গিয়েছিল। কত লোক মারা পড়েছিল তা ঠিক মনে নেই। তারপর ঐ লাইন আজও খোলা হয় নি। ধনুষ্কোটি

যাবার কোন বাসনা ছিল না আমাদের। শুনেছি ওখানে সোনা ও রূপার তীর ধনুক দিয়ে সমুদ্রের পূজা দিতে হয়।

সেতুর নিচের জলের মধ্যে প্রচুর পাথর দেখা যায়। কেউ বলেন এটাই শ্রীরামচন্দ্র নির্মিত সেতু। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নাকি এখানে একটা সেতু নির্মিত হয়েছিল, পাথরগুলি তারই ভগ্নাবশেষ। এ সব তথ্য নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। সেতুটি যে এখনও আছে তাইতো আমরা সহজে রামেশ্বর যেতে পারছি—এর চেয়ে বড় পাওনা আর কি হতে পারে! এই সেতুটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। পুরানো হাওড়া পুলের মত মধ্যে মধ্যে খুলে দেওয়া হয় জাহাজ চলাচলের জন্য। পামবান থেকে রামেশ্বর ১১ কিলোমিটার পথ। পথ একান্তই বালুকাময় এবং বৈচিত্র্যহীন।

রামেশ্বর স্টেশনের মজুরদের প্রত্যাশা একটু বেশি। দু'চার পয়সা বেশি দিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি হয় না, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে ঠকিয়ে নিতে চাইলে অথবা আমাদের অসহায়তার সুযোগে বাড়তি মুনাফা উঠাবার ফিকির করলে মনটা অপ্রসন্ন হয়। ঠিক এই জিনিস ঘটল স্টেশনের মজুরটির সঙ্গে। গণেশ নামে সামান্য হিন্দী জানা একটি ছেলে আমাদের পিছু নিয়েছে স্টেশনে নামার সঙ্গে সঙ্গে। তাকে আমাদের প্রয়োজন নেই জানান সত্ত্বেও সে লেগে রয়েছে। মজুরের সঙ্গে গোলমালটার সময় সে নিরীহ দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যা হোক একটা ফয়সালা হয়ে যাবার পর সে যা বলল তার মর্ম হল—মজুরটি খুবই অন্যায় করেছে তবু সে কিছু বলতে পারে নি, তার কারণ ওদের সঙ্গে ভাব না রাখলে তার যাত্রী সেবার ব্যবসা অচল হয়ে যাবে। স্টেশন মাস্টারের নিকট থাকা খাওয়ার খোঁজ খবর করতে গিয়ে সুবিধা হল না। ইতিমধ্যে সূর্যের প্রখরতা বাড়তে শুরু করেছে। অতএব কালবিলম্ব না করে আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। গণেশই

একটা টাঙ্গা ডেকে এনে দিল। কারো আহ্বান বা সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে চালকের পাশে উঠে বসল।

আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখেই রামেশ্বরে গণেশ আমাদের কাণ্ডারী হয়েই রইল। তার কথা মতই টাঙ্গা সমুদ্র কিনারে রামেশ্বরম দেবস্থানম কমিটির আপিসে হাজির হল। মন্দিরের কাছাকাছি থাকার অনেক সুবিধা, স্বগতোক্তির মত করে গণেশ আমাদের জানিয়ে দিল। টাঙ্গাকে দাঁড় করিয়ে আমাদের নিয়ে আপিস ঘরে কর্মচারীর সঙ্গে কথা কইল। স্টেশন থেকে মন্দির দু কিলোমিটার হবে। তার পূর্ব দরজার অদূরে এই রামেশ্বরম দেবস্থানম কমিটি আপিস। দৈনিক আট টাকা ভাড়ায় মন্দির সংলগ্ন একটা পুরো বাড়ি পাওয়া গেল। রান্না ঘর, স্নান ও শৌচাগার সহ তিনখানা শয়ন ঘরের আধুনিক বাড়ি। আলো পাখা সবই আছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা যায়। বাড়ির সুবিধার জন্য একটা দিন বেশি এখানে থাকা হবে সিদ্ধান্ত করে দু দিনের ভাড়া জমা দেওয়া হল। বিশ্রামের আমাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু খেতে না পেয়ে বিশ্রাম আমাদের মাথায় উঠেছিল। পুরো একদিনের বাড়ি ভাড়া গচ্চা দিয়ে পরের দিনই রামেশ্বর ত্যাগ করেছিলাম।

তীর্থে এসে ধুলো পায়ে দেবতা দর্শনের বিধি। গণেশ আমাদের সে কথা মনে করিয়ে দিল। তবে সে জানে দিনকাল পালটে গেছে— যাত্রীদের সুবিধা মত বিধি বিধান না দিলে কাজ কারবার ঠিকমত চালান যায় না। তাই এক নিঃশ্বাসেই বলে ফেলল—এখন না গেলেও ক্ষতি নেই, স্নানাদি সেরে বিশ্রাম করে পবিত্র হয়ে একেবারে সেই সন্ধ্যারতির সময় গেলেই ভাল হবে। অমরা মুখ্যতঃ দেখতেই বেরিয়েছি। সঙ্গে বাড়তি পাওনা দেবপূজার পুণ্য। অতএব গণেশের নির্দেশ,— 'এখন আরাম কর, পিছে যাবে' আমরা শিরোধার্য করে নিলাম।

ঘরদোর পরিষ্কারই ছিল। গণেশই চাবি আনল, টুকিটাকি

কাজটুকু করে দিল। দুপুরের খাবারটা সে-ই আমাদের বাড়িতে আনিয়ে দিল। বাঙ্গালী হোটেলের ভাল খাবার এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গণেশ। কিন্তু তার অশেষ যত্ন এবং শ্রম সত্ত্বেও কেউ আমরা তা খেতে পারি নি। পুরো খাবারটা নষ্ট হয়ে গেল। তিন টাকা করে এক একটা মিলের দাম গচ্চা দিলাম। বিকেলে একটি মহিলা দুধ নিয়ে এলেন। মোহনদা বল্লেন এত ভাল দুধ অনেক দিন দেখেন নি। এক লিটার গরম করে আনতে বলা হল। ভাল দুধ গরম করতে গিয়ে খারাপ হয়ে গেল; সেটাও ফেলে দিতে হয়েছিল। এখানে ধর্মশালারও অভাব নেই। তার কোন কোনটির সুখ্যাতি শুনেছি! মন্দিরের গায়েই একটি সুন্দর ধর্মশালা দেখেছি।

রামেশ্বব বালুকাময় ভূভাগ। এখানে কিছুই হয় না। তবু দশ হাজারের বেশি লোকের বসতি এই দ্বীপে। দারিদ্র্য চিহ্ন এর সর্ব অঙ্গে। শুনলাম লবণাক্ত সমুদ্র বেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও লবণটুকু পর্যন্ত বাইরে থেকে আনতে হয়। রামেশ্বর মন্দিবের যজন যাজন পূজা পার্বণকে কেন্দ্র করেই অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্বাহ হয়। তীর্থযাত্রী পুণ্যার্থীর আনাগোনা প্রায় সারা বছর ধরেই চলে। তবে সব চেয়ে বেশি ভিড় হয় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। যাত্রী সেবা, থাকা খাওয়া ও বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর কাজেও অনেকের রুজি রোজগার হয়। মাছ ধরা অন্যতম প্রধান ব্যবসায়। শুনলাম নানা অসুবিধার জন্য এর ব্যবসায়িক সাফল্য অপেক্ষাকৃত কম। দূর সমুদ্রে মাছ ধরা দিনদিন ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। সাধারণ জেলেদের হাত থেকে ব্যবসাটা তাই বিত্তশালীদের হাতে চলে যাচ্ছে। শঙ্খ আর ঝিনুকের নানা ক্ষুদ্রাকার কুটীর শিল্প সামান্য আছে। রাম সীতা মূর্তি আঁকা একটি শঙ্খের উপর ক্রেতার নাম লিখে দেবাব মজুরী (শাঁখের দাম সমেত) আট আনার মধ্যে। ক্রেতার অভাবে উৎপাদকেরা সস্তা দরে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তালপাতার ব্যাগ টুপি খেলনা ইত্যাদি টুকিটাকি এঁরা সুন্দর করে তৈরি

করেন। বহিরাগত যাত্রীরাই একমাত্র ক্রেতা। সকলেই সস্তা কিনতে চান। এঁদেরও না বিক্রি করে উপায় নেই। তাই লাভ বড় বেশি হয় না। তালপাতার চাটাই দিয়ে ঝুড়ি মত তৈরি করে মাছ চালানের কাজে ব্যবহার করা হয়। আর আছে নারকেল।

যাই থাক, অধিকাংশ মানুষ কর্মহীনতার ফলে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না বলেই মনে হয়। প্রধান খাদ্য চাল ডাল। তার পুরোটাই বাইরে থেকে আনতে হয়। সুতরাং দাম একটু চড়া। একে রুজি রোজগারের অভাব, তায় চড়াঁ দর। কিন্তু বয়স্ক সকলেই কিছু না কিছু কাজের চেষ্টা করেন। সকালে যখন জেলেরা মাছ ধরতে যায় তখন গৃহিনীদের কোন কাজ থাকে না। স্বামী সন্তানেরা জোয়ার ভাটার হিসাবে কখন মাঝ রাতে কখন শেষ রাতে মাছ ধরতে বেরোন। ফিরতে ফিরতে কোন কোন দিন দশটা এগারটা হয়। সেই মাছ বিক্রি করে চাল ডাল কেনার পর গৃহিনীদের কাজ শুরু হবে। ইত্যবসরে কেউ কেউ অবশ্য কিছু জ্বালানী সংগ্রহ, কেউবা ছেঁড়া জাল মেরামত বা অন্য কিছু টুকিটাকি কাজ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য কোন কারনে একদিন মাছ ধরা কামাই পড়লে এদের সেদিন ধার করে চালাতে হয়, অথবা উপবাসে কাটে। শিশু ছেলেগুলি ভিক্ষার দ্বারা কিছু উপার্জনের চেষ্টা করে থাকে। জীবিকা অপেক্ষাকৃত সুলভ হলেই যে এরা ভিক্ষা করতে প্রলুব্ধ হত না তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। পাঞ্জাবী ও নেপালীদের মধ্যে ভিখারী নেই, জীবিকা তো সেখানে সুলভ নয়। এখানে বালক-বালিকা ভিখারীর সংখ্যা বেশি বলেই মনে হবে। আর এদের ধৈর্যও অসাধারণ। রামজি রোখা (এরা বলেন রামঝরোকা) থেকে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা টাঙ্গার (স্থানীয় নাম ঝটকা) পেছন পেছন ছোটে ভিক্ষার প্রার্থনা জানাতে জানাতে। এক সঙ্গে একাধিক শিশু থাকে। সামান্য কিছু পেলেই হাসিমুখে ফিরে যায়। কিছু না দিলে গালাগালি করে।

সারাটা দিন ধরে একের পর এক শঙ্খ-বিক্রেতা দুধওয়ালা প্রভৃতি হানা দিয়েছিল। তার একমাত্র কারণ যাত্রীর গন্ধ পেলেই এরা পিলপিল করে এসে হাজির হয়। রামেশ্বরের মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে কাটিয়ে দেবার লোকও আছে কিছু। এঁরাই গল্প করলেন মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বভারতীয় নেতা কামরাজ একদা এখানে বস্তিতে বাস করতেন, মন্দিরের প্রসাদে জীবনধারণ করতেন। বিকেলের দিকে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন মন্দির দেখতে বেরিয়েছিলাম। শহরের উপকণ্ঠে একটী টিলার উপরে এই মন্দির। টিলাটিকে বলা হয় গন্ধমাদন পর্বত। চলতি নাম রামঝরোকা বা রামজি রোখা। লঙ্কা বিজয়ের পর ফিরবার পথে শ্রীরামচন্দ্র এখানে থেমেছিলেন—রামজি রুখেছিলেন তাই এর এই বিচিত্র নাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল রাজা-ভাত-খাওয়া স্টেশনের নাম। কোন বিশেষ কর্মের স্মরণে স্থানের নাম বড় বেশি নেই। সে যাই হোক গন্ধমাদনের চেহারা ও ক্ষুদ্রাকৃতি দেখে আমাদের পছন্দ হল না। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সর্বদা তার আকার প্রকার সম্পর্কে যথার্থ ধারণা হয় না। আর এই গন্ধমাদনেরই একাংশই না আনবার পথে ভেঙ্গে পড়েছিল কন্যাকুমারী থেকে ত্রিবান্দ্রম যাবার পথে ভিরুৎ মালাই-এ। মালাই মানে পর্বত। এখানকার জঙ্গলে এখনও বিস্তর ঔষধি গাছ গাছড়া আছে। এখানেই তো ইন্দ্র চিকিৎসিত হতে এসেছিলেন বলে পুরাণ কথায় উল্লিখিত হয়েছে।

পাহাড়ের চেহারা যাই হোক, শীর্ষস্থিত মন্দিরের ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্র বেষ্টিত রামেশ্বর দ্বীপটিকে একবার দেখলে মুগ্ধ হবেন সবাই। সর্বাগ্রে মনে পড়বে কালিদাসের রঘুবংশের সেই বিখ্যাতপঙ্‌ক্তি দু'টি—যেখানে তিনি বলেছেন—ঐ দেখ লৌহ চক্র সদৃশ লবণ সমুদ্রের দূর হইতে সুক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান এবং তমাল তালীবন দ্বারা শ্যামবর্ণ তীরভূমি চক্রধারাশ্রিত কলঙ্ক রেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

উজ্জয়িনী থেকে এতটা পথ কবি যখন এসেছিলেন তখন পথঘাটের

অবস্থা কি ছিল, মণ্ডপম থেকে মান্নার প্রণালী পার হয়ে ছিলেন কেমন করে ইত্যাদি কত কথাই না মনে পড়বে আপনার এখানে দাঁড়িয়ে। আর মনে হবে শত শত বছরেও প্রকৃতির যেন কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। কবি সেদিন যেমনটি দেখেছিলেন আমরাও আজ ঠিক তেমনটিই দেখছি। পার্থক্য হল—কবি তা প্রকাশ করেছিলেন কালজয়ী কাব্যে, আমরা মূক, প্রকাশে অক্ষম; কিন্তু অনুভূতি যে এক তা হলফ করে বলা যায়। সূর্যালোকের শেষ রশ্মি পর্যন্ত এখানে দাঁড়িয়ে এই অপরূপ রূপের লীলা সমারোহ হৃদয় ভরে দেখে নিলাম, জীবনে দ্বিতীয়বার এ সুযোগ আসবে বলে ভাবতেই পারি না। সুন্দরই সত্য হয়ে শিবত্ব লাভ করে এই অনুভূতি সহজেই অন্তরে জাগ্রত হয়।

মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের যুগল পদচিহ্ন পূর্বেই দেখে গেছি। দীপালোকে আর একবার দর্শন করলাম। পাথরের উপর সুস্পষ্ট পদচিহ্ন। পুরোহিত কিন্তু ভীষণ-দর্শন; দেখলে ভয় হয়, ভক্তি জাগে না। এইখানে একটা কথা বলে রাখতে চাই। অনেকেই জানেন রামায়ণ সর্বভারতীয় গ্রন্থ। কিন্তু এই বইখানি মূল অখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটেছে তামিল ভাষার রামায়ণ লেখক কামবাণের হাতে পড়ে।

এবার ফেরার পালা। মন্দির পথ জনবিরল। অল্প দূরেই একটি হনুমান মন্দির। আমরা হেঁটে হেঁটেই চল্‌লাম। সুন্দর পীচ্ ঢালা পথ। কিন্তু চতুর্দিক্ বালুকাময়। কাঁটাগাছের ঝোপ আর তাল নারকেলের বনানী। অন্য কোন গাছগাছালি নেই বললেই চলে। তারই মধ্যে দারিদ্র্য লাঞ্ছিত তাল বা নারকেল পাতার কুঁড়ে ঘর। শহরের কাছাকাছি অবশ্য পাকা বাড়িই বেশি।

সুধীরদা প্রশ্ন তুললেন, গন্ধমাদন পর্বত তো হনুমান লঙ্কায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে সেটা ফেরত আনল কে? মোহনদা বললেন—রামায়ণের লঙ্কাই হল এই রামেশ্বর দ্বীপ। রামচন্দ্র বানর সৈন্যের সাহায্যে যে সেতু বেঁধেছিলেন সেটা আমরা রেলগাড়ি চড়ে পার

হয়ে এসেছি। আমার প্রশ্ন, রাবণের বংশধররা তা হলে গেল কোথায়? মোহনদা বলেন তারা সব পালিয়ে বর্তমান লঙ্কায় চলে গিয়েছিল, যেমন আমরা পালিয়ে চলে এসেছি পূর্ববাংলা থেকে। যারা পালাতে পারেনি তাদের অনেকেই মারা পড়ে। তারপরেও যারা ছিল তারা এই সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

গণেশ ভাই আমদের কয়েকটি কুণ্ড দেখালেন। ছোট ছোট পুকুর। ইট দিয়ে কুঁয়োর মত করে চার ধারে বাঁধানো। বালির দেশ—স্বাভাবিক ভাবে মাটি খুঁড়ে পুকুর কাটা যায় না। তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা! প্রত্যেকটি কুণ্ডের পৃথক নাম আছে। রামায়ণের সঙ্গেই তার বেশি ঘনিষ্ঠতা, সীতাকুণ্ড লক্ষ্মণকুণ্ড ইত্যাদি। এগুলি একান্তই নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন। এর জল যত পবিত্রই হোক আমরা স্পর্শ করতে পারিনি। পরিবেশও রুচিকর নয়।

কয়েকটি ছোট বড় নতুন পুরানো কুণ্ড ও মন্দির ঘুরে আমরা বাসায় না ফিরে শ্রীরামেশ্বর দর্শনে গেলাম। মন্দিরের একাংশে এখন সংস্কার কাজ হচ্ছে। সিংহল অধিপতি শ্রীপরাক্রম বাহু কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয় বার শতকে। মূল মন্দিরের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন রামনাদের রাজন্যবর্গ। বিক্ষিপ্ত-ভাবে ঘোরাফেরা করে আমরা ফিরে এলাম। উজ্জ্বল বিজলি আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকায় রাত্রের দর্শনার্থীর কোন অসুবিধা হয় না। আরতির দেরি আছে। ইত্যবসরে আমরা সমুদ্রতীরেও খানিকটা ঘোরাফেরা করে নিলাম। তেমন চিত্তাকর্ষক মনে হল না। মনে পড়ল জননী সারদেশ্বরী রামেশ্বর মন্দিরের লিঙ্গ মূর্তি দেখে বলেছিলেন 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম তেমনি আছে।'

শ্রীরামেশ্বর শিব ছাড়া গণেশ পার্বতী, কাশী বিশ্বনাথ, হনুমান, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি বিস্তর বিগ্রহ এই মন্দিরের নানা অংশে স্থাপিত এবং নিত্য পূজিত। ধনুষ্কো[illegible]ত শিবলিঙ্গ গত প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর [illegible]) এই মন্দিরে পুনর্বাসন দেওয়া

হয়েছে। মন্দিরের দেবদেবীগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরপর সাজানো আটটি নারীমূর্তি। এক কথায় এঁদের অষ্টলক্ষ্মী বলা হয়। জনৈক পুরোহিত আটজনের নাম বল্লেন—জয়লক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী ধান্যলক্ষ্মী, বীরলক্ষ্মী, সন্তানলক্ষ্মী, ঐশ্বর্যলক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী ও আদিলক্ষ্মী। আমাদের কোজাগরী লক্ষ্মী নেই কেন জিজ্ঞাসা করলে তিন নিরুত্তর ছিলেন। ত্রিবান্দ্রমে দীপলক্ষ্মীও দেখেছিলাম।

এখানকার এই অষ্টলক্ষ্মীর প্রত্যেকটির চেয়ে আমাদের লক্ষ্মী প্রতিমা অনেক বেশি সুন্দর। আকার আকৃতি ও শিল্পসুষমায় এই মন্দিরের দরদালানের কোন তুলনা নেই। এর মোট দৈর্ঘ্য হল—হাজার ফুট। উত্তর দক্ষিণে ৪৫টি এবং পূর্ব পশ্চিমে ৪০টি কারুকার্য শোভিত স্তম্ভের উপর সমগ্র অলিন্দের ছাদটি রয়েছে। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সংযোজন বলেই মনে হয়। ছাদ অবধি দেয়ালে আবৃত না হলে এর মনোহারিত্ব আরও বেড়ে যেত। মনে হয় পরবর্তীকালে মন্দির সম্প্রসারণের সময় এই কাজ করা হয়েছে।

পূর্ব দিকে মন্দিরের প্রধান প্রবেশপথ। এই পথের দুধারে কতগুলি বেঢপ অসুন্দর নরমূর্তি আছে। এঁরা হলেন মন্দির নির্মাণের অর্থদাতা রাজন্যবৃন্দ। এই অসুন্দর মূর্তিগুলি কারা স্থাপন করেছেন জানতে আগ্রহী হলে—একজন পাণ্ডা বলেছিলেন, বর্তমান মন্দির কমিটি অর্থাৎ দেবস্থানম কমিটির কীর্তি এটি। এদের এই কাজের দ্বারা দুটো উপকার হয়েছে। প্রথম, মন্দিরের নানা মূর্তির সৌন্দর্য দর্শকের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবং দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান সময়ের মানুষের শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যবোধ এবং ভাস্কর্য-দক্ষতা অতীত ভারতের তুলনায় যে একান্তই অকিঞ্চিৎকর তা বুঝতে পুথিঁপত্র পড়বার দরকার হয় না, এই মূর্তির দর্শনই যথেষ্ট।

মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি কুয়ো আছে। এগুলিকেও কুণ্ড বলা হয়। পুণ্যার্থীরা এখানে স্নান করেন বলে শুনেছি। প্রত্যেকটির পৃথক

পৃথক নাম আছে। নামগুলি রামায়ণ আশ্রিত—, নদীর নামাঙ্কিতও দু'একটি আছে। সমুদ্রের কিনারে মিষ্টি জলের এতগুলি উৎস শ্রীরামেরশ্বরের কৃপা ভিন্ন হতে পারে না বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন।

পরের দিন ভোরে সমুদ্র-স্নান করেই আর একবার মন্দিরে গিয়েছিলাম। ভোর থেকে মাইকে মিষ্টি সুরে মধুর মাঙ্গলিক ধ্বনিত হচ্ছিল। মন্দিরে সূর্যালোক প্রবেশ করে না বললেই চলে। সকালে বিজলি বাতি ছিল না। তবুও অন্ধকার নয় কোথায়ও। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোতে অপেক্ষাকৃত জনবিরল মন্দিরে শ্রীরামেশ্বর দর্শন হল। কলা নারকোলের ভোগ কর্পূর দীপ আর চন্দন বাতাসা দিয়ে পুজো দিলাম। মন্দির শান্ত। রামেশ্বরম্ এখন আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিলেন বলেই মনে করলাম। স্বামী বিবেকানন্দ এই রামেশ্বরম্ মন্দিরে বলেছিলেন—'যদি কোন স্থানে শত শত মন্দির থাকে, যদি সেখানে অনেক অসাধু লোক বাস করে তবে সেই স্থানের আর তীর্থত্ব থাকে না।' স্বামীজির এই সতর্কবাণী যাঁরা সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বোধ হয় এখানে বেদবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। শ্রীমা সারদেশ্বরী ১০৮ টি স্বুবর্ণ বিল্বপত্র দিয়ে রামেশ্বরের পূজা করেছিলেন। এখানে পুজায় গঙ্গাজলও ব্যবহার করা হয়।

মন্দিরের পূর্বদিকে সমুদ্র—বঙ্গোপসাগর। মন্দির চত্বরের পর রাজপথ। কয়েকগজ মাত্র গেলেই শান্ত স্বচ্ছ অপরূপদর্শন লবণাম্বু-রাশি। এই হল অগ্নিতীর্থম্। পাশে শঙ্করাচার্যের একটি নবপ্রতিষ্ঠিত দ্বিতল মন্দির। দোতলায় খোলা বারান্দায় শঙ্করাচার্য সহ আরও কয়েকজন ঋষি মহাত্মার মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। দর্শনীয় তেমন কিছু নয়। কি বলতে চাওয়া হচ্ছে এই প্রদর্শনীর দ্বারা তাও আমাদের বোধগম্য হয় নি। এইখান থেকে বাসায় ফিরবার পথে পড়ে চতুর্ধাম বেদবিদ্যালয়। মোহনদা এটি আবিষ্কার করেন। সাধারণ একটি

বাড়িতে মেজেয় বসে তিনটি কিশোর উচ্চকণ্ঠে সামবেদ মুখস্থ করছেন। এদের মস্তক কপালের দিকে অর্ধমুণ্ডিত। অন্যত্রও অর্ধমুণ্ডিত মস্তক অর্থাৎ বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে চুল ছাঁটা ব্রাহ্মণ দেখছি। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণেরা এই রীতিতে চুল ছাঁটেন।

বেদবিদ্যালয়ের মেঝেতে আমরা কিছুক্ষণ নীরবে বসলাম। আমাদের উপস্থিতি ও অবস্থান তাদের অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটাল না। তারা যেমন পড়ছিল তেমনি পড়েই চলল। ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু বইয়ের লিপি তামিল। ছাত্রদের উচ্চারণের ভিন্নতা অথবা আমাদের সংস্কৃত জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য অমরা একবর্ণও বুঝতে পারিনি। তবুও খুব আনন্দ হয়েছিল এই ছাত্রদের নিষ্পাপ মুখগুলি দেখে এবং বেদবিদ্যালয়ের মাটিতে বসতে পেরে।

এর খানিকটা দূরে (রেল স্টেশনের দিকে) জাহাজঘাটা। এগুলিকে গৌরবে জাহাজ বলতে হয়। এমন সব স্টীমার পূর্ববাংলায় অনেক পথে যাত্রী বহন করে থাকে। এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ শ্রীলঙ্কা বা সিংহল। পাসপোর্ট ভিসার ব্যবস্থা করে এলে একবার সিংহল দেখে আসা যেত। যাতায়াত ব্যয় মাত্র ৩০ টাকা। নিজেদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার জন্য দুঃখ হল। স্টীমার অবশ্য সবদিন ছাড়ে না। তবে সপ্তাহে একাধিক দিন যায় আসে। আজ স্টীমার ছাড়বার দিন। যাত্রী অনেক। কে মাদ্রাজী আর কে সিংহলী চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই।

আস্তানায় ফিরতে বেশ বেলা হল। রৌদ্রের তাপ আমাদের নিকট দুঃসহ বোধ হচ্ছিল। অনেক চেষ্টা করেও গলধঃকরণ করা যায় এমন খাদ্য সংগ্রহ করতে পারা গেল না।

অতএব কালবিলম্ব না করে রামেশ্বরের পাট গুটিয়ে মাদুরা যাত্রার ফরমান জারি করলেন সুধীরদা। সঙ্গে সঙ্গে 'প্যাক্ আপ' হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

রামেশ্বরম্ স্টেশনে পা দেবার পর থেকেই গণেশ ভাই সর্বক্ষণ নানা কাজে সাহায্য করছে। কি তাঁর প্রত্যাশা তা কখন মুখ ফুটে বলে নি। খাবার দাবারের দামের পরে বাড়তি কয়েকটি টাকা তার হাতে দিলে সে নম্র চিত্তে তা গ্রহণ করল। আরও বেশি পাবার দাবি তোলে নি। আমাদের সঙ্গে সে স্টেশনে যাবার জন্য যথারীতি ঝট্কায় চেপে বসল। মোহনদা তাকে অনুনয় করে নিরস্ত করলেন। তারও যে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। নেমে গেল সে। যাবার সময় নমস্কার বিনিময় করে নিবেদন করল একবার সে কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে কলকাতা যাবে। কলকাতায় আমাদের সঙ্গে দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিল।

মাতুরা

রামেশ্বর থেকে মাতুরা ১৬৪ কিলোমিটার পথ। মন মাতুরা জংশন থেকে আমাদের ভিন্ন পথ ধরতে হবে। তবে বাঁচোয়া এই যে, তুখানা সরাসরি যাওয়ার বগী আছে এই গাড়িতে। আমাদের ওঠা-নামা করতে হবে না। রেল কোম্পানীই গাড়ি তুটো কেটে নিয়ে ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দেবে।

দিনের বেলায় মাতুরা যাত্রা করায় রামেশ্বর সেতুবন্ধ সমুদ্র আর একবার দেখবার সুযোগ পেলাম। শুনছি ভারত সরকার প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে মোটর যানের জন্য একটী পৃথক সেতু নির্মাণ করবেন। এখন মণ্ডপম পর্যন্ত সর্বঋতুতে মোটর চলাচলের উপযোগী সুন্দর রাস্তা আছে। যেসব পর্যটক মোটরে ভ্রমণ করেন এবং মোটর নিয়েই রামেশ্বর বা সিংহল যেতে চান তাঁদের এখানে রেল কর্তৃপক্ষের শরণ নানিয়ে উপায় নেই। রেলে এ জন্য অর্থাৎ মোটর পারাপারের বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

পথে বিবেকানন্দ-স্মৃতিজড়িত রামনাদ শহর দেখা যায়। এই রামনাদের রাজাই স্বামীজির নিকট প্রথম আমেরিকা ধর্মমহাসভায়

যোগদানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মুখ্যত তাঁরই প্রেরণা ও অর্থানুকূল্যে স্বামীজি ধর্ম-মহাসভায় যোগ দিতে সমর্থ হন। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রামনাদের জনসভায় বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

"তাঁহার (রামনাদের রাজার) পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা, ধর্ম, মান, পদ মর্যাদা সবই ধর্মের অধীন,ধর্মের সহায়ক করিয়াছেন; এই ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা প্রত্যেক হিন্দুর জন্মগত সংস্কার। ......তোমরা ধর্মে বিশ্বাস কর বা না কর, যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও তবে তোমাদের এই ধর্ম রক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে।"

এই যাত্রায় স্বামীজি এতদঞ্চলের বহু জনপদে অভিনন্দিত হন। আমাদের আজকের গন্তব্য স্থল মাত্নরাইতে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—"ভারত সমগ্র পৃথিবীকে ধর্ম ও দর্শন শিখাইয়াছে।" গান্ধী-জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনার সঙ্গেও মাত্নরাই জড়িয়ে আছে। ১৯২১ সনে গান্ধীজি ভারত পরিক্রমায় বেরোন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মাদ্রাজ ভ্রমণ করেন। সেখানকার জনসাধারণের অসীম দারিদ্র্য তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। বহুজনের একখানা পুরো কাপড় কেনার পয়সা নেই। কোমরে একটু ন্যাকড়া জড়িয়ে নেংটি পরে কত মানুষ এসেছে গান্ধী মহারাজকে দেখতে। এদের সঙ্গে সমপ্রমাণ হতে ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি এই মাত্নরা স্টেশনেই নাকি কটিবাস গ্রহণ করেন। জামা টুপি প্যান্ট কোট সবই বাতিল হয়ে গেল। রেল কর্তৃপক্ষ মাত্নরাই জংশন স্টেশনে একটি ফলকে লিখেছেন—"আপ লোগোন দারিদ্র্যতাগ্রস্ত দশা দেখ কর স্বয়ং উনসে সমানতা প্রবর্তনে কে লিয়ে মহাত্মা গান্ধীজি নে সন্ ১৯২১ সেপ্টেম্বর মাহীতে এহি কমরসে কাপড়া পহননা গ্রহণ করা দিয়া।" ফলকের অপরদিকে এই কথাগুলি তামিল ভাষায় লেখা আছে।

মাত্নরাই অতি প্রাচীন শহর। বর্তমানে তামিল নাড়ুর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। "মথুরা" এই কথাটা কি এখন মাত্নরাইতে দাঁড়িয়েছে?

দক্ষিণের ভারতবর্ষে তো 'ম'-এর ছড়াছড়ি। তার মধ্যে হঠাৎ করে 'ই' এসে কেন হাজির হল? বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও নাকি মাদুরা বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে এই নগরী দক্ষিণ মথুরা বলে উল্লিখিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যদেবও এই পুণ্য ভূমিতে পদার্পণ করিছিলেন। প্রাচীন পাণ্ড্য রাজাদের রাজধানী ছিল এই শহর। মুসলমানরা এখানে হামলা করেছে, লুঠপাট চালিয়েছে বিস্তর। মালিক কাফুরের দয়ায় তো একদা এটি নিশ্চিহ্ন কবার উপক্রম হয়েছিল। প্রত্যহ দেশবিদেশের যাত্রী যে মাদুরা আসেন তা ঐ প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাসের টানে নয়, আসেন মীনাক্ষী মন্দিরের অপরূপ রূপের টানে। ভারতবাসীর শিল্প সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে দু চোখ মেলে প্রাণভরে দেখে নেওয়া যায়। ভারতের মানুষ সৌন্দর্যসৃষ্টির সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়েই অনির্বচনীয় অক্ষয় সম্পদ্ সৃষ্টি করে থাকে—এই সত্য মাদুরার মন্দিরে মন্দিরে পাথরের বুকে মুখর হয়ে আছে।

মাদুরা পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাতটায়। এইখানে দক্ষিণ রেলপথের যে-কোন স্টেশন থেকে যাত্রারম্ভের টিকিট কেনা যায়। প্রথমেই আমরা সেই খোঁজে গেলাম। সাতটার পর এই টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়। অতএব কাজ কিছু হল না। কাল সকাল আটটায় আবার দরজা খুলবে, যা কিছু করার তখন করতে হবে। অতএব এখনকার মত আমাদের ছুটি। রেল-কর্মী সজ্জন মানুষ। আমাদের ছুটি দেবার আগে বলে দিলেন—কাছেপিটে কোথায় অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ভদ্রগোছের থাকা খাওয়া মিলতে পারে।

রেল-কর্মী বন্ধুর নির্দেশ মত স্টেশনের নাকের উপর 'কলেজ হাউস' নামক বিশাল যাত্রী নিবাসে অতিথি হলাম। খাট-বিছানা সমন্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘর। থাকবার জন্য জন-প্রতি দৈনিক দক্ষিণা পাঁচ টাকা মাত্র। ঘরের আকৃতি ও আনুষঙ্গিক বিবিধ কারণে ভাড়ার কম-বেশি হয়। দুজনের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে আমরা তিন জনে ছিলাম তাই পনের

টাকার পরিবর্তে বার টাকা ভাড়া নিয়েছিলেন কলেজ হাউস। মোট ৫৮০ খানা ঘর আছে এই বাড়িটিতে। প্রায় হাজার খানেক লোক সেখানে থাকতে পারেন। চত্বরটা একটা বাজার বিশেষ। খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা আছে। সেজন্য যে যেমন খাবেন তাঁকে দাম দিতে হবে। আমিষ ভোজ্য পাওয়া যায় না।

নিরামিষ ভাত ঘি ডাল তরকারি দই এবং পাঁপর পেট-চুক্তি দেড় টাকা মাত্র। টক দইকে সুসহ করতে চিনি দরকার হলে চা চমচের প্রতি চামচের দাম দিতে হবে পাঁচ পয়সা। নানা রকমের বহু দোকান-পাট ও গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা রয়েছে হোটেলের ভেতরেই। বই ও পত্র-পত্রিকার স্টলগুলিতে বেশ মজাদার একটি বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো—Avoid Free Reading—মুফতে পড়া এড়িয়ে চলুন। এখানে বিনা শুল্কের বা সামান্য দক্ষিণায় ভাল ধর্মশালা মেলে।

ঐ শহরের ঘুম নেই। সারা রাত ধরে হোটেল ও স্টেশন এলাকার দোকানগুলি খোলা থাকে। হৈ চৈ কোলাহলও কিছু কম হয় না। হোটেল নিরামিষ হলে কি হবে, যাত্রীগুলি সব তো আর নিরামিষ নন। মধ্যে রাত্রিতে তাঁদের অবকাশ-রঞ্জনের বিবিধ উপচার যোগান দিতে ব্যস্ত মানুষের ত্রস্ত আনাগোনা বেশ বুঝতে পারা যায়। এদের কর্ম-বিরতির মুহূর্ত থেকে হোটেলের খানাপিনা ও প্রাতরাশের আয়োজন হতে থাকে। এত লোকের রাশি রাশি চা জলখাবার তৈরি রাখতে হবে সকাল ৫টার আগে! অতএব হোটেলের চোখে ঘুম নেই।

সকালে স্নানাদি সেরে প্রথম কাজ হল টিকিট কেনা। কয়েকটি নির্বাচিত স্টেশন থেকে টিকিট কিনে দক্ষিণ রেলপথের যে কোন স্টেশন থেকে যাত্রারম্ভ করা যায়। মাদুরায় বসে আমরা মাদ্রাজ থেকে কলকাতা যাবার টিকিট কিনলাম। এঁরা নির্দিষ্ট গাড়িতে আসন সংরক্ষণের জন্য মাদ্রাজে তার করে খবর দিলেন, মাশুলটা অবশ্য আমাদেরই দিতে হল। নির্দিষ্ট সময়ে টিকিট কিনে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু মাদ্রাজ ঐ সব তারের কোন তোয়াক্কা করে

না। তারা আমাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে নি। পরে মাদ্রাজ এসে জলপানি দিয়ে ঐ ব্যবস্থা আমাদের করতে হয়েছিল। কেবল মাদুরা নয়, ম্যাঙ্গালোর, বাঙ্গালোর সিটি, মাদ্রাজ সেন্ট্রাল, মাদ্রাজ এগমোর থেকেও টিকিট কেনার সুবিধা করে রেখেছেন রেল কোম্পানি। কিন্তু সে সুবিধা ক'জন ভাগ্যবানের সত্যকার কাজে লাগে তা ভগবানই জানেন। সুধীরদা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, নামটা বদলে মাদ্রাজী ধরণের নাম লেখালে কিছু সুবিধা হয়ত মিলত।

মাদুরার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, একমাত্র আকর্ষণ বল্লেই চলে—মীনাক্ষী মন্দির। এই একটি মাত্র মন্দিরের জন্য মাদুরাকে বহুজনে এথেন্সের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রেল স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার পথ। আমরা হেঁটেই গেলাম। জনবহুল রাস্তা। দুদিকেই জমজমাট চোখ ধাঁধাঁনো জমকালো সব দোকান। সারা পৃথিবীর সৌন্দর্য-রসিক শিল্প-প্রাণ মানুষের এই পথে নিত্য আনাগোনা চলছে। তাদের মনোরঞ্জনের উপযুক্ত করেই দোকানগুলি সাজান।

জুতো পায়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকা নিষেধ। জুতো রক্ষক দ্বারেই আছেন। তঁ'র মজুরি পাঁচ পয়সা। কিন্তু তাও আপনার লাগবে না যদি আপনি দয়া করে পাশের কাপড়ের দোকানের বেনিয়াকে 'ব্যাওসা'র সঙ্গে যাত্রী সেবার পুণ্য অর্জন করার অবকাশ দেন। অর্থাৎ জুতো জোড়াটি তাঁর দোকানে বিনা মাশুলে রেখে দিয়ে মন্দির দেখুন। সেজন্য কেনাকাটার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একথাটাও আপনাকে দোকানকর্মচারী, একান্ত বিনীত ভঙ্গীতে মনে করিয়ে দেবেন। আমরা এই কাপড়ের দোকানেই জুতো রেখে মন্দিরে ঢুকেছিলাম।

ঐ মন্দিরের নহবৎ অর্থাৎ গোপুরমের ভাস্কর্যের কোন তুলনা নেই। আমার মত শিল্পরসবোধবর্জিত মানুষেরও গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই নহবৎ বা প্রবেশ মন্দির দেখে। এর গঠন-নৈপুণ্য, শিল্প ও বর্ণ সুষমা এবং বিশালতা সব মিলে এক অভূতপূর্ব রসাবেশে মন প্রাণ ভরে তোলে

অতি সহজেই। কিন্তু আপনার মুগ্ধ মনের দুয়ারে অচিরেই আঘাত হানবে মন্দিরের ছবি-বিক্রেতা বালকের দল। দর্শনের আনন্দে বিঘ্ন ঘটায় আপনি বিরক্ত হবেন। তখন কথাকাটাকাটি করার মত মনের অবস্থা নয়, তাই নীরবে ঢুকে পড়লাম মন্দির অভ্যন্তরে।

আগেই শুনেছিলাম পুরুষদের ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত করেই মন্দিরে ঢুকতে হয়। দক্ষিণের অনেক মন্দিরে এই নিয়মের কথা শুনেছি। কিন্তু মাদুরা আসার আগে তার মুখোমুখি হতে হয় নি। পরে অবশ্য কন্যাকুমারী, পদ্মনাভ প্রভৃতি মন্দিরে এই অভিজ্ঞতা দৃঢ় হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ঊর্দ্ধ-দেহ নিরাবরণ করা এবং নিম্নাঙ্গে মুক্ত কচ্ছ বস্ত্র ব্যবহারের মধ্যে প্রাচীন কালের নিরাপত্তার বিধিব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। ঠিক এখন যেমন বিধানসভা ভবন, পাঠাগার প্রভৃতি স্থানে অনেক জিনিস নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। অতীতে মন্দিরে বিগ্রহের সঙ্গে রাজাও থাকতেন। তাই কঠোর নিরাপত্তার জন্য এই সব নিয়ম প্রবর্তিত হয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণেতর মানুষ যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য ঐ ব্যবস্থা হতে পারে না। তা যদি হত তাহলে অব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকদের জন্যও কিছু একটা ব্যবস্থা থাকত। আগে কোন মন্দিরেই অস্পৃশ্যদের ঢুকতে দেওয়া হত না। গান্ধীজি এর বিরুদ্ধে সব-চেয়ে সার্থক আন্দোলন করেছিলেন ১৯২৩ ও ১৯২৪এ ভাইকমে। ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের মহারাজা সত্যাগ্রহীদের নিকট নত হয়ে মন্দির দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত করে দেন। একদা কলকাতায় যেমন ইংরেজ ও ভারত-বাসী একই রাস্তা দিয়ে চলবার অধিকারী ছিল না, তেমনি মাদ্রাজে ত্রিবাঙ্কুরে (বর্তমান কেরল) হরিজন ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চলার জন্য পৃথক পথ ছিল। সাহেবদের হোটেলে যেমন 'ইণ্ডিয়ানস্ এণ্ড ডগস্ নট অ্যালাউড' ছিল, ভারতের অনেক মন্দিরে তেমনি অ-হিন্দু বিধর্মী এবং

হরিজনরা 'নট অ্যালাউড' ছিলেন। এই বৈষম্য দূর করার জন্য গান্ধীজি দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নি।

ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন করা ইত্যাদি বিধিবিধান তুলে দেবার দাবি তামিল নাড়ু সরকার স্বীকার করতে চান না। তাঁরা মনে করেন এর দ্বারা লক্ষ লক্ষ ভক্তপ্রাণে আঘাত দেওয়া হবে। তামিলনাড়ুর আয়ের একটি প্রধান উৎস হল এখানকার মন্দিরগুলি। ভ্রমণকারী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ তো ও-গুলির আকর্ষণেই আসেন। তা ছাড়া ভক্তদের নিকট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে থাকে এক একটি মন্দির। খবরের কাগজের (ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস ১।১১।৭২ সংবাদ থেকে জেনেছি, তামিলনাড়ু বিধানসভার জনৈক্য সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে সরকার জানিয়েছেন, দর্শনী ও পূজার ফি বাবদে পাওয়া অর্থ থেকে পূজা অর্চনার ব্যয় ও মন্দিরাদি সংরক্ষণের কাজ করেও লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। সেই টাকা আজকাল সাধারণ মানুষের হিতসাধানে ব্যয়িত হতে আরম্ভ হয়েছে।

মীনাক্ষী মন্দিরের আয় কত জানতে পারি নি। তবে অন্য দু'একটি মন্দিরের বার্ষিক আয়ের খবর ঐ কাগজেই বেরিয়েছে। পালানী মন্দিরের বার্ষিক আয় ৫২ লক্ষ টাকা। সরকারী দপ্তরে যে টাকা জমা পড়ে এটা সেই হিসাব মাত্র। পুরোহিত পাণ্ডারা যাত্রী দোহন করে যা আদায় করেন তা পৃথক। এই মন্দিরের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে বোবা ও বধিরদের জন্য স্কুল চলছে! হিন্দু মন্দিরের অর্থে এই রকম প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা ইতিপূর্বে শুনি নি।

মাদ্রাজে অর্থাভাবে বহু দরিদ্র মানুষ, অধিকাংশই হরিজন সম্প্রদায়ের, বিয়ে সাদী করতে পারেন না। বর্তমান তামিলনাড়ু সরকার মন্দিরের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে বছরে পাঁচ হাজার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার কথা ভাবছেন। মন্দ কি, পিতামাতার নিকট থেকে যাঁরা যৌতুক পাবার মত ভাগ্য করেন নি, বিধাতা দয়া করলে এবং ভাগ্য প্রসন্ন হলে সরকার তা পুষিয়ে দেবেন। চমৎকার!

প্রবেশ মন্দির ছেড়ে আমরা বেশি দূর এগোতে পারি নি। উচুঁ শীর্ষদেশ থেকে একেবারে একতলার ছাদ পর্যন্ত সমগ্র মন্দিরগাত্রটি অজস্র অসংখ্য ছোট বড় মূর্তি দিয়ে ভরা। এর মধ্যে তিলার্দ্ধ শূন্য স্থান খুঁজে পাওয়া ভার। মূর্তিগুলির সম্বন্ধে পুরানো কথা জানা না থাকলেও শুধু শিল্পসুষমাই মনোযোগ .আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট। সবচেয়ে বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বৃষোপরি হরগৌরীর যুগল মূর্তি। সমুদ্রমন্থনের দৃশ্যটিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। দেবতা ও অসুরের আকার আকৃতিতে শিল্পী কি নিপুণতায় পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। সাধারণ পার্থক্য ছাড়া দেখা গেল অসুর মাত্রেই গুম্ফবান্, দেবতাদের কারোরই গোঁফ নেই। অসুরদের দলে দুটি খর্বাকৃতি গোঁফহীন মূর্তি দেখতে পাবেন। তারা পুরুষ নন, নারী।

নয় মাথা রাবণের একটি বড় মূর্তি দেখলাম। রাবণ দশম মাথাটি কোথায় খোয়াল তা তখন জানবার আগ্রহ হয় নি। কতই তো জানি না। যা দেখছি তার কতটুকুই বা বুঝি কিংবা জানি। নয়ন মনের তৃপ্তিতেই খুশী। বুদ্ধির সঙ্গে কারবার এখন প্রায় বন্ধ। রাবণ ছিলেন শিবের ভক্ত। শিবঠাকুরের দর্শনলাভের জন্য তিনি নিত্য কৈলাস যেতেন। একদিন তাঁর দুর্বুদ্ধি হল, রোজ রোজ যাতায়াতের শ্রম লাঘব হয় যদি শিব সমেত কৈলাস পর্বতটাকেই নিয়ে আসা যায়। রাবণের বুদ্ধি চিরকালই সর্বনাশা। কৈলাস আনতে গিয়ে শিবের খেলায় চাপা পড়লেন কৈলাসেরই তলায়। এই সময় রাবণ নিজের একটি মাথা কেটে তন্ত্রী বানিয়ে বীণা বাজিয়ে সামবেদ গান করে শিবকে তুষ্ট করেন। আর তার জন্যই সে যাত্রা বাকী ন'টা মাথা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

নানা পথ ঘুরতে ঘুরতে কত মন্দির, কত দেব-দেবী, কত শিল্পসমৃদ্ধ অলিন্দ ও স্তম্ভ যে দেখলাম তার হদিস করা সহজ নয়। সভামণ্ডপই বা কত! এখানেও পাথরে গড়া সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ। পাথরের স্তম্ভ থেকে

সুরধ্বনি ওঠে। একটি মণ্ডপে খড়ম পরিহিতা নারী, বিদেশীসাজ-পোষাকের মূর্তি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বারপাল মূর্তির সৌন্দর্য ও বিশালতা যেমন বিস্ময়ের উদ্রেক করে, তেমনি তাদের মুখের দুদিকে বেরিয়ে থাকা দুটো দাঁত আমাদের ভাবিয়ে তোলে। হাতি খুব শক্তিধর। তার দাঁত মুখের বাইরে থাকে। তাই কি মূর্তিটির মুখের বাইরের দাঁত দু'টি বল ও শক্তির প্রতীকরূপে স্থাপিত হয়েছে ?

আর চোখে পড়ে অষ্টশক্তির বিগ্রহ। তলায় ইংরেজিতে নাম লেখা আছে। দুর্গা, মনোজমণি, ভবানী, কৌশিকী, সপ্তমাতা, ইয়েস্থা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কল্যাণী, যোনী, শ্রীদেবী ও ভূমি দেবীর মূর্তি একস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিম দিকের বেলগাছ তলায় একটি সুন্দর হরগৌরী মূর্তি আপনাকে খানিক দাঁড়িয়ে দেখতেই হবে। ইতিহাস ও পৌরাণিক কাহিনী উৎকীর্ণ হয়েছে সমান দক্ষতার সঙ্গে। অভিজ্ঞ জনেরা বলেন ৩৩ লক্ষেরও বেশি ছবি উৎকীর্ণ রয়েছে এখানকার মন্দির গাত্রে।

এইখানেই দেখেছিলাম হাতিকে ভাত খাওয়ানো হচ্ছে। তালের মত গোল করে মাখা ভাতের গোলা একব্যক্তি সরাসরি হাতির মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। হাতটা প্রায় কনুই পর্যন্ত হাতির মুখগহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে।

মন্দির চত্বরের মধ্যেই একটা বড়সড় বাজার পেরিয়ে আমরা মীনাক্ষী মন্দিরে ঢুকেছিলাম। গোলাপের মালা অফুরন্ত। প্রায় সকলেই কিনছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে একটি বেশ বড় মালার দাম মাত্র চার আনা। মীনাক্ষী দেবীকে পরানো হবে এই মালা। পুরোহিত দেবীর গলা থেকে ঐ প্রসাদী মালা খুলে এনে ফিরিয়ে দেন। দেবার রীতিটি বড় মধুর। মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে মালাটি যিনি দিয়েছিলেন তাঁর গলায় পরিয়ে দেন।

মীনাক্ষী দেবীকেও দূর থেকেই দর্শন করতে হয়। ঈষৎ বঙ্কিম ঠাটে

দণ্ডায়মান সালঙ্কারা মূর্তি। পুষ্পস্তবকের উপর বসা, একটি পাখী ধারণ করে আছেন দক্ষিণ হস্তে। বিবাহিতা নারী সমাজ এখানে খুব ভক্তিভরে পূজা দেন। এই মন্দিরে ভস্মের পরিবর্তে কুমকুম দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের দেবদেবী মাত্রই জোড়ায় জোড়ায় চলেন অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি একত্র থাকেন। তাই মীনাক্ষী যখন আছেন তখন শিব ঠাকুরকেও থাকতে হবে, আছেনও।

মীনাক্ষী মন্দিরের শিব হলেন সুন্দরেশ্বর। সত্য সুন্দর শিব। যা সত্য তা সুন্দর, তাই শিব। তবু শিবঠাকুরকে সুন্দর নামে অন্য কোথায়ও দেখনি। শিব এখানে নানা রূপে বিরাজিত। নটরাজের দুটি বিখ্যাত ভঙ্গী, একটি অষ্টভুজ ও দক্ষিণ পদ উত্তোলিত, অন্যটি দ্বিভুজ এবং বামপদ উত্তোলন করা। সুন্দরেশ্বর শিবের মন্দিরটিকে পূর্ণ শিল্পরস সমৃদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। একটা শুকনো কদম গাছের কাণ্ড এখানে সুরক্ষিত। পুরাকালে এটি কদম্ববন-ক্ষেত্র ছিল, তারই স্মারক।

নয়ন ভরে দেখছি, কিন্তু মনে নেই সব। আছে শুধু গভীর তৃপ্তি ও আনন্দের মাধুর্য। ফিরবার পথে তিনটি স্তন সমন্বিত সুন্দর একটি নারী মূর্তি দেখেছিলাম। এরকমটি ইতিপূর্বে কোথায়ও দেখিনি মন্দিরের মধ্যে সরকারী বই ও ছবির দোকানদারকে ব্যাপারটার মর্মকথা জানাতে বললাম। তিনি ভি. মীনা রচিত মাতুরাই নামক ৩০ পৃষ্ঠার একখানা চটি বই আমাদের হাতে দিয়ে বললেন, এতে জানতে পাবেন। পৌনে দুই টাকা দিয়ে ওটি কিনতে হল। সেই বই পড়ে জেনেছি—রাজা মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য ও রাণী কাঞ্চনমালা সন্তানলাভের জন্য যজ্ঞ করেন। যজ্ঞকুণ্ড থেকে তিনটি স্তন সমন্বিতা একটি কন্যা উদ্ভূত হন। রাজা রাণী স্বভাবতই ব্যাকুল হলেন। তখন দৈববাণী হল, এই নারী যখন স্বামীর সাক্ষাৎ পাবেন তখনই তার তৃতীয় স্তন লুপ্ত হয়ে যাবে।

এ সত্ত্বেও পুত্রহীন রাজা কন্যাটিকে পুত্রবৎ মানুষ করেন। রাজা

মলয়ধ্বজের মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যশাসন ক্ষমতা লাভ করে নানা দেশ জয় করতে করতে কৈলাস পর্বতে উপনীত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই তাঁর তৃতীয় স্তন লুপ্ত হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন স্বামীর দেখা পেয়েছেন। শিব ঠাকুর মাদুরা এসে বে থা করে কিছুকাল বসবাস ও রাজ্যশাসন করেছিলেন। উগ্র নামে তাঁর একটি পুত্র উপযুক্ত হলে তাকে রাজ্যভার দিয়ে তাঁরা মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর হয়ে গেলেন।

মন্দিরে সহস্র সহস্র ছোট বড় মূর্তির প্রত্যেকটির পেছনে এইরকম নানা কাহিনী রয়েছে। কারো পক্ষে এক জীবনে তার সব জানা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। এখানে কি আছে আর কি নেই তা খুঁটিয়ে দেখা আমাদের মত দর্শকের পক্ষে অকল্পনীয়। সে চেষ্টাও আমরা করি নি। সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে সর্বদাই কোন না কোন পূজাঅর্চনা আচার অনুষ্ঠান হচ্ছে; ঘড়ির কাটার মত, বিরামহীন। সব কিছু আমাদের বোধগম্য নয়। হর্ষোৎফুল্ল মানুষের চলমান মেলা বসেছে মন্দিরে। আমরা সেই ভিড়ের মধ্যে এক মন্দির থেকে আর এক মন্দির, এক মূর্তি থেকে অন্য মূর্তির সমানে বারেক গিয়ে দাঁড়িয়েছি—আবার চলতে শুরু করেছি। আনন্দিত মন কি গ্রহণ করেছে সে হিসাব তখন করি নি, করার অবকাশ ছিল না। আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে প্রফুল্ল হৃদয়ের আনন্দস্রোতে সব একাকার হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে দু'চারটি বিষয় অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমার এই বর্ণনার দ্বারা মন্দির সম্পর্কে কোন ধারনা না করতেই অনুরোধ করি। কারণ আমার কোন কথার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই। ক্ষণিকের দর্শনে মনের উপর যে ছাপ পড়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু লিখতে চেষ্টা করি নি। এই তো ধরুণ, মীনাক্ষী দেবীর বিয়ের সুখ্যাত মূর্তিটি আমাদের চোখে ধরে নি। অথচ জগৎ জোড়া এর নাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, মনটা তখন বিক্ষিপ্ত ছিল বলেই বোধ করি এমনটি ঘটেছিল।

নৃত্যপর গণেশ ঠাকুর দেখে হাসি পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে হাসতে পারি নি। হাসি পাক আর যাই হোক, এর শিল্পসুষমা অস্বীকার করবার উপায় নেই। পাণ্ড্য রাজাদেরও কয়েকটি সুন্দর মূর্তি আছে এই চত্বরে।

মন্দিরে নিত্য মেলা বসে। মন্দির, বিগ্রহ, দোকান পাট, পুরুত পাণ্ডা, ভক্ত, দর্শনার্থী ও ভ্রমণকারী সব মিলে জমজমাট অবস্থা; কিন্তু কোলাহল বা গোলমাল তেমন আছে বলে মনে হল না। ঘুরতে ঘুরতে আমরা ক্লান্ত দেহে এক সময় বেরিয়ে এসেছিলাম। দিনমণি তখন মধ্য আকাশ অতিক্রম করে গেছেন। মন্দির প্রসঙ্গ শেষ করার আগে এই প্রাঙ্গণে নবপ্রতিষ্ঠিত একটি 'মন্দির'-এর প্রতি পাঠক সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ না করলে অন্যায় হবে।

তামিলনাড়ুর জাতীয় কবি তিরুবল্লুবরের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এই মন্দির প্রাঙ্গণের একটি নবনির্মিত গৃহে। এ মন্দিরে ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজার আয়োজন হয় না। কিন্তু দৈনিক সাহিত্যপাঠের ক্লাস হয়। সাপ্তাহিক সাহিত্য সভা বসে। কবিকে নিয়ে তামিলবাসীর গর্বের শেষ নেই। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে তামিল ভাষায় ইনি বহু কবিতা রচনা করেন। আজও অনেক কবিতা, বিশেষ করে শ্লোকগুলি বহুলোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে থাকেন। শুনা যায় 'কুরল' গ্রন্থের সহস্রাধিক শ্লোক প্রজ্ঞা ও ব্যবহারিক জ্ঞানে এখনো প্রোজ্জ্বল। চাণক্য শ্লোকের কথা প্রসঙ্গত আমাদের মনে আসে। তামিলনাড়ুর প্রত্যেকটি সরকারী বাসে দেখবেন কবির একখানি ছবি ঝোলানো রয়েছে। তামিলবাসীর ভাষা ও সাহিত্যপ্রীতি কত প্রগাঢ় তা এর থেকে সহজেই অনুভব করা যায়। অনেক সময় এই অনুরাগ সংকীর্ণতা ও প্রাদেশিকতার দোষে নিন্দিত হয়। যাঁরা নিন্দা করেন তাঁদের অনৌদার্যই আমার নিকট অধিকতর ক্ষতিকর মনে হয়েছে।

কাপড়ের দোকানে জুতো আনতে গিয়ে সুধীরদা সেজোন্তের খাতিরে কাপড় দেখতে বসলেন। মাদুরার শাড়ীর খ্যাতি আছে। দোকানদার গুণী মানুষ, বিক্রয়ের কলা-কৌশল জানেন। নকল রেশমের সস্তা অথচ চোখ ঝলসানো হরেক রকমের শাড়ী নানা কথার ফুলঝুরি দিয়ে এমন করে তুলে ধরলেন যে কয়েক মিনিটের মধ্যে সুধীরদা মোহনদা সকলেই বেশ কয়েক-খানা করে কাপড় কিনে ফেল্লেন। এখন সামান্য কিছু টাকা দিলে হবে। কাপড় ডাকে যাবে। বেশ ব্যবস্থা। টাকার কথা যেমন তেমন, ভ্রমণকারীর পক্ষে কাপড় সামলে নিয়ে চলার ঝক্কি কম নয়। সামান্য ডাক-ব্যয়ের বিনিময়ে এই সুবিধা সকলেই গ্রহণ করে থাকেন। মোহনদা বললেন কলকাতার বাজার দরের তুলনায় এখানে কাপড়ের দাম পঁচিশ শতাংশ কম। সুধীরদা জানতে চাইলেন কোন্ হিসাবে বলছেন, কোথাকার দর বলছেন? গড়িয়াহাটের, না শ্যামবাজারের?

আমরা ঠেকে শিখেছি। দুপুরে খাবার সময় মাখন ও চিনি নিয়ে গিয়েছিলাম। অসুবিধা সত্ত্বেও পেট ভরে খেতে পারা গেল। ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করেই বেরিয়ে পড়লাম টেপ্পাকুলাম, বসন্ত মণ্ডপ ও নায়েক মহল দেখতে। বাসে গেলাম টেপ্পাকুলাম। বাসের টার্মিনাস এটি। যে বাসে গিয়েছিলাম সে বাসেই ফিরে এসেছিলাম। একটা বড় সড় পুকুরের মধ্যস্থলে মন্দির। মীনাক্ষী মন্দির দেখার পর এ আর চোখে ধরে না। পরিবেশটিও বড় নোংরা মনে হল। উৎসবের জন্যই নামডাক! উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় বলে টেপ্পাকুলাম কে আমরা স্বীকার করতে পারি নি। কিন্তু বিশেষ দিনে টেপ্পাকুলামে এবং মীনাক্ষী মন্দির প্রাঙ্গণের শিবগঙ্গার জলাশয়ে প্রত্যহ স্বনামে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ভাসালে নাকি অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। কাশী হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ভাসান হয় কামনা সিদ্ধির জন্য।

ওখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম নায়েক মহলে। বাসের কনডাকটর

আমাদের ভুল জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিলেন। অনেকটা পথ হেঁটে নানা জনকে জিজ্ঞাসা করে করে নায়েক মহলে আসতে হল। সে কি ফ্যাসাদ। একটি বছর দশকের মেয়ে সুন্দর ইংরেজিতে আমাদের পথ বাৎলে দিল। ইংরেজি ভাষাটা জানা যে কত দরকার তা মর্মে মর্মে বুঝেছি দক্ষিণ দেশে এসে। ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষাকে পুরোপুরি পরিহার করে চলতে চাইলে নিঃসন্দেহে পদে পদে বিঘ্ন উপস্থিত হবে, এমন কি ঐক্যও বিঘ্নিত হওয়া বিচিত্র নয়।

নায়েকেরাই মাদুরার শেষ হিন্দু রাজা। এদের পতনের পর কর্ণাটকের মহম্মদ আলি সামান্য কিছুকাল রাজত্ব করেন। তারপরেই আসে (১৮৪৬ খ্রী) ইংরেজ। নায়েক প্রাসাদটি প্রাচীন। যতটুকু বাড়ি অক্ষত আছে তা দেখলেই এর বিশালত্ব ও অতীত ঐশ্বর্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রাসাদের অভিনয়-মঞ্চটি প্রায় অক্ষত আছে। বিস্ময়কর না হলেও এর বৈশিষ্ট্য বিপুল। নাটমঞ্চ ও দর্শক-আসন বিন্যাসে রীতিমত কুশলতা আছে। ব্যালকনি ছাড়া, নানা শ্রেণীর দর্শকের জন্য পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত ছিল।

প্রাসাদে একটি সুন্দর ফোটো প্রদর্শনী আছে। তামিলনাড়ুর সব মন্দিরের বড় বড় ছবি এখানে দেখানো হয়। আলোর ব্যবস্থা অপ্রতুল। ছবি ও দর্শকের দাঁড়ানোর স্থানের মধ্যে ব্যবধানটাও বেশি। ফলে দেখতে অসুবিধা হয়।

এই প্রাসাদে কিছু নির্মাণ কাজ চলছিল। মজুরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওদের সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু ভাষা জ্ঞানের অভাবে কথাবার্তা বলার অসুবিধা হল। তারপর আজকাল শ্রমজীবীরা একটু বেশি সেন্‌সিটিভ। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নিকট কিছু জানতে চাইলেই তাঁরা অপমান বোধ করেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে এই মজুরদলে একটি শিক্ষিত ছেলে ছিল। সে এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় পাস করেছে।

চাকরি-বাকরি না পেয়ে মজুরের কাজে যোগ দিয়েছে। হাসিমুখেই সে কথা কইছিল পরিষ্কার ইংরেজি ভাষায়। তার বাবাও মজুর। সেই তার পরিবারে প্রথম ইংরেজি লেখাপড়া শিখেছে। তার খুব বিশ্বাস শীঘ্রই সে একটা চাকরি পাবে। কর্মসংস্থান কেন্দ্রে সে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু চাকরি কবে হবে তাই ভেবে তো আজকের দিনটা চলবে না? খেতে তো হবে, অতএব মজুরের কাজ করছে। একা সে নয়, তার মত অনেকেই এমন কাজ করে! আমি এক আধজন তথাকথিত শিক্ষিত যুবকের দেখা ইতিপূর্বেও পেয়েছি। অবস্থার চাপে পড়ে তাঁরাও ঐ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এঁদের সঙ্গে নায়েক প্রাসাদের ছেলেটির আকাশ-পাতাল তফাৎ। ওঁরা বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ। শ্রমজীবী হতে হয়েছে বলে তাঁদের লজ্জার ও দুঃখের শেষ নেই। কাজে যথাসম্ভব ফাঁকি দেন এবং নিজেকে ছাড়া বিশ্বশুদ্ধ সকলকে তাঁদের দুরদৃষ্টের জন্য অভিসম্পাত করেন। আর এই ছেলেটি নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে। নিজের আরও ভাল কাজের জন্য যত্ন নিচ্ছে। কাউকে ঐ অবস্থার জন্য দায়ী ক'রে নিজের শান্তি ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে শেখেনি। দেখে বড় ভাল লাগল। কাজে ফাঁকি দেওয়াটা এখন সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের নানা স্তরে, বিশেষ করে শিক্ষিত মহলে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডুবতে বসেছে, দেশের সর্ববিধ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। এই রকম একটা দারুণ অবস্থার মধ্যে ছেলেটির সাক্ষাৎ পেয়ে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়েছিলাম, ভরসা পেয়েছিলাম।

নায়েক প্রাসাদ থেকে বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। অতএব বসন্ত মণ্ডপ যাত্রা বাতিল করে আস্তানায় ফিরে এলাম। রাত তখন আটটা হবে। মধ্য রাত্রের গাড়ি ধরে আমরা কন্যাকুমারীর দিকে যাত্রা করব। গাড়ি যাবে তিরুনেলভেলি পর্যন্ত। রেলপথের শেষ সেখানে। তারপর বাসে যেতে হবে। মাতুরা থেকেও সোজা

বাস যায় কন্যাকুমারিকা। ভাড়া লাগে বেশি। রাত্রে ঘুমোবারও অসুবিধা। তাই বাস আমাদের পছন্দ হয় নি। রেলে শোবার জায়গা পাওয়া যায় নি। রেল মজুরের সাহায্যে বাঙ্কে শোবার ব্যবস্থা করার কৌশল জানা ছিল। অতএব এক রাত্রির যাত্রায় আমরা অকুতোভয়। তবু ভয় কি একেবারে কাটে! গাড়ি ছাড়বার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে আমরা স্টেশনে এসে উপস্থিত হলাম। মজুরের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল। এদিক-ওদিক করে সে একখানা একেবারে খালি গাড়িতে তুলে দিয়ে চুক্তি মত অর্থ নিয়ে চলে গেল। গাড়িতে দ্বিতীয় লোক ছিলেন না, অতএব বাড়তি পয়সাটা সে একেবারে ফাঁকি দিয়েই নিল। আপশোষ যে একটু হল না, তা নয়। শোবার জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় ক্ষোভটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

কন্যাকুমারী

রাত এগারটায় ট্রেন ছাড়ল। তখন বেশ ভিড় হয়েছে গাড়িতে। তিরুনেলভেলি মাদুরাই থেকে মাত্র শয়েক কিলোমিটার। এই সামান্য পথ আসতেই গাড়ি প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব করেছে। কয়েক দিন ধরে খুব বর্ষা হচ্ছে। সে জন্য রেলপথের নাকি ক্ষতি হয়েছে, তাই এই দেরি। তিরুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারিকার বাস ছাড়ে। গাড়িতে বারাকপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণাগারের জনৈক কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর বাড়ি এখানে। অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁর কাছ থেকে আমরা জেনে নিয়েছিলাম। খুব সজ্জন ও বিদগ্ধ মানুষ তিনি। আমাদের সঙ্গে করে বাসে তুলে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছিলেন হাসিমুখে, এবং আমাদের নিষেধ উপেক্ষা করেই।

ছাড়বার মুখে এসে আমরা বাসে উঠলাম। উঠতে না উঠতেই বাস চলতে শুরু করল। ভদ্রলোককে ভাল করে একটু কৃতজ্ঞতা জানাবারও

সময় পাওয়া গেল না। এখান থেকে সারাদিনে দু'খানা মাত্র বাস কন্যাকুমারিকা যায়। ভাগ্যক্রমে সকালের বাসখানা আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম। না পেলেও ক্ষতি ছিল না। নাগেরকয়েল পর্যন্ত ঘন ঘন বাস যায়। সেখান থেকেও কন্যাকুমারিকার দূরত্ব মাত্র কুড়ি কিলো-মিটার। বাসও চলে ঘন ঘন।

খানিকটা চলার পর আমাদের বাসখানার কি একটা যান্ত্রিক গোল-যোগ দেখা দিল। পথের পাশের একটি বাস-ডিপোতে নিয়ে ভিড়িয়ে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে মেকানিক এলেন। তিনিও মিনিট পনের ধরে নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে ঠোকাঠুকি করে রায় দিলেন, এ বাস চলবে না। আরও পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আমরা তো প্রমাদ গুণছি। ইতিমধ্যে একখানা খালি বাস পাশে এসে দাঁড়াল। কে কি নির্দেশ দিলেন জানি না। যাত্রীরা সেই বাসে গিয়ে উঠে বসলেন। আমরাও মালপত্র টানাটানি করে তাঁদের অনুসরণ করলাম। মনে হল এই জন্যই মাদ্রাজের বাসের এত সুখ্যাতি।

ফেরার পথে আমরা নাগেরকয়েল দেখেছিলাম। কন্যাকুমারী জেলার সদর দপ্তর এই শহরে। এখন সোজা কন্যাকুমারী চলে গেলাম। বাসটি অবশ্য এখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েছিল। দীর্ঘদিনের সযত্ন-লালিত বাসনা দিয়ে রচিত ত্রি-সমুদ্রসেবিত ভারতবর্ষের শেষ স্থলবিন্দু কন্যাকুমারীতে সকাল ৯টা নাগাদ আমরা সবাই পৌঁছে গেলাম। উঠব কোথায় ঠিক করতে পারি নি। বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল কমিটির নবনির্মিত বাসভবন খাস কন্যাকুমারী থেকে বেশ খানিকটা দূরে। অতএব আমাদের অপছন্দ। সমুদ্র-উপকূলে কয়েকটি ভাল হোটেল ও লজ আছে। লজ অর্থাৎ কেবল থাকবার ব্যবস্থা। কেবল ভাল দেখলে আমাদের চলে না, দক্ষিণার কথাও ভাবতে হয়। এক মজুর বালক বলল, চলুন আপনাদের বাঙালীর লজে নিয়ে যাই। বাঙালীর লজ কথাটায় কাজ হল। ছেলেটির বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তার

সঙ্গে গিয়ে অদূরের গোপী নিবাস লজে উঠলাম। নামটাতে অবশ্য বাঙালী গন্ধ আছে, যাত্রীরাও অনেকে বাঙালী। মালিকের দেখা পাই নি তখন। আবাসটি এমনিতে খারাপ নয়। ভাড়াও সাধ্যের মধ্যে। ছাদ থেকে সমুদ্র দর্শন হয়। বিবেকানন্দ শিলা স্মৃতিমন্দির ঘর থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। কন্যাকুমারীর মন্দিরও কাছে। তবে পল্লীটা অপরিচ্ছন্ন। লোকজন সেখা-কার একটিও পছন্দ হয় না। তাই মনটা আমাদের প্রসন্ন হয়নি এই গোপী নিবাসে উঠে।

তিরুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত পথটির কথা একটু উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। পাহাড়ের বুক চিরে সবুজ ধানের ক্ষেত ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে মসৃণ রাজপথ। কাছে ও দূরে আন্দোলিত তাল-নারকেল কুঞ্জ, আর তার পেছনে ধূমল পাহাড়। মনে হয় মেঘ এসে পাহাড়ের মাথাটা ঢেকে দিয়েছে। বঙ্গের সমতলবাসীর কাছে এ দৃশ্য অভিনব। মধ্যে মধ্যে খালও আছে। আর আছে খালের তীরে তীরে টকটকে লালরঙের টালি ছাওয়া ছোট বড় নানা ধরণের কুটীর। খালের ঘাটে স্নানরতা স্ত্রীপুরুষও দেখতে পাবেন। বাড়িগুলি সবই বাগান ঘেরা—নারকেল ও কলাগাছের প্রাচুর্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার ফাঁকে ফাঁকে ত্রস্তপদে চলে যাওয়া তামিল গৃহিণী বা গৃহকর্মে রতা জনপদবধূ চকিতে নয়ন গোচর হবে এবং মিলিয়ে যাবে। মিলিয়ে গেলে কি হবে —মনের ফ্রেমে ছবিটা চিরকালের জন্য বাঁধা হয়ে গেল। আপশোষ রয়ে গেল, এমন দেশে দ্রুতগামী যানে ভ্রমণ করছি। সাধ্যে কুলালে একবার তিরুনেলভেলি থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যাব। পুরাকালে পায়ে হেঁটে তীর্থে যাওয়ার বিধানের মর্ম, মনে হয়, এমনি করেই বুঝেছি।

কন্যাকুমারীতে পা দিয়েই আমরা গেলাম বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির দেখতে। এক মুহূর্তও দেরি করি নি। কেননা আকাশ মেঘলা ছিল। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ঝড়ো হাওয়ার দাপটে প্রায়ই মন্দিরে যাওয়া

বন্ধ থাকে। বর্ষা নামলে অক্টোবরেও ভাল করে মন্দির দেখা যায় না। তাই আমরা কোন ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। বিকেলের আবহাওয়াটা আরও খারাপ হবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

মূল ভূভাগ থেকে বিবেকানন্দ শিলা মাত্র পাঁচ শ' ফুট হবে। অথচ সমুদ্র উত্তাল হলে এইটুকু পথও অতিক্রম করা যায় না। যন্ত্র-চালিত ফেরিতে পারাপারের ব্যবস্থা। বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল কমিটি এর বন্দোবস্ত করেছেন। পারাপারের জন্য কোন ভাড়া ধার্য নেই। তবে কমিটির দপ্তর থেকে এজন্য একটি পাস সংগ্রহ করতে হয়।

আর সেই সময় কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিকট সাধ্যমত দানের জন্য আবেদন জানান। এতে পারানির কড়ির চেয়ে অনেক বেশি অর্থ আমদানি হয়। প্রবেশ পথটি অপরিচ্ছন্ন। এটাকে একটু সুন্দর করা উচিত।

কয়েক মিনিট আমাদের সমুদ্রযাত্রা হল। সুরক্ষিত, সজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন বিবেকানন্দ শিলায় পা রাখার আনন্দে দেহমন আমার রোমাঞ্চিত হয়েছিল। আজ থেকে ৮১ বছর আগে (১৮৯২ সনের ডিসেম্বর মাসে) স্বামী বিবেকানন্দ সাঁতার কেটে এসে উঠেছিলেন এই শিলাখণ্ডের উপর। এইখানে বসে ধ্যানস্থ হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই ধ্যানদৃষ্টিতে সেদিন কেবল ঈশ্বরই নন, বহু শতাব্দী ব্যাপী জড়তায় পঙ্গু ভারতের প্রকৃত রূপটি তার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি এবং গৌরব ও গর্ব নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর এই ভারত দর্শনের ফলে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে এক নবজাগৃতি দেখা দিয়েছিল। স্থান কাল পাত্র ভেদে তা নানা কার্যে ও নানা রূপে প্রকটিত হয়েছে। এ নিয়ে অনেকে তর্ক তুলতে চাইবেন। বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। শুধু সবিনয়ে প্রার্থনা করব, বিবেকানন্দ-পূর্ব ভারতবর্ষের সত্য ইতিহাসের সঙ্গে বিবেকানন্দ পরবর্তী ভারতবর্ষের সত্যরূপটি একবার সযত্নে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে মিলিয়ে দেখুন।

এই শিলাখণ্ডের আর-এক প্রান্তে বিস্মৃত ইতিহাসের কোন একটি অধ্যায়ে মাতা কন্যাকুমারীও তপস্যা করেছিলেন। কুমারী কন্যার পদচিহ্ন এখনও এই শিলাখণ্ড বুকে ধারণ করে আছে। সেই চিহ্নকে কেন্দ্র করে এখন শ্রীপদ মন্দির নির্মিত হয়েছে। পাথরের উপর নারী পদচিহ্নটি স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হয়। পাথরে পায়ের চিহ্ন পড়তে পারে তা আমরা বিশ্বাস করি না। বহুজন ওখানেই উচ্চকণ্ঠে এর অবাস্তবতা ঘোষণা করতে দ্বিধা করলেন না। জনৈক বাঙ্গালী যুবক বললেন 'বুজরুকি'। প্রতিবাদ করা নিরর্থক। আমরা কেউই আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে কিছু বুঝি না। বুঝতে পারি না। মন্দিরের দিকে পা বাড়ালাম।

সুদৃশ্য স্তম্ভ শোভিত প্রবেশপথ। বেলুড়ের মন্দিরের আভাস পাওয়া যায় এই মন্দিরে। চার ফুট বেদীর উপর পরিব্রাজক বেশে যেন জীবন্ত বিবেকান্দ দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্তিটিই আট ফুট উঁচু। ঘরটি বেশ বড়-সড়। এটিকে বলা হয় সভামণ্ডপ। উজ্জ্বল কালো রঙের স্তম্ভগুলির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। বিপরীত দিকে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব এবং শ্রীমার দুখানা চমৎকার তেল রঙের ছবি দুপাশে দেওয়ালের মধ্যে বসানো রয়েছে। পেছনের দিকেই বোধহয়, ধ্যান মণ্ডপ। ঘরটিতে জানালা নেই। একদিকে দেবনাগরী অক্ষরে'ওঁ' শব্দটি এমন করে স্থাপন করা হয়েছে যে দর্শক সহজেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। শ্রী এস. কে আচারি নামক জনৈক স্থপতি এর নক্শা করেছেন। ধ্যান মণ্ডপে আমরা কিছু সময় নীরবে বসেছিলাম।

মন্দিরের পরিকল্পনাটিও চমৎকার। এক কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়েছে। নির্মাণ কাজ তখনও শেষ হয় নি। ভারত-সরকার এবং রাজ্য-সরকার-গুলি অর্থ সাহায্য করেছেন, কিন্তু ব্যয়ের অধিকাংশ পাওয়া গেছে ভারতের জনসাধারণের কাছ থেকে দান হিসেবে। আয়-ব্যয়ের একটা মোটামুটি হিসাব মন্দির প্রাঙ্গণে লিখে রাখা

হয়েছে। মূল মন্দির, শ্রীপদ মন্দির ও ধ্যান মণ্ডপ ছাড়া দোকান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, শৌচাগার ইত্যাদি। রক্ষণাবেক্ষণও চমৎকার। দৈনিক কয়েক সহস্র যাত্রী আসেন, তথাপি কোথায়ও এক বিন্দু আবর্জনা নেই, ধুলো বালি নেই। এখানে ছবি তোলা, পিকনিক ইত্যাদি হুল্লোড় নিষিদ্ধ। ছবি তোলার নিষেধটা অনেকেই মানছেন না। নিষেধের সত্যিকার যুক্তিটি কি তাও অবশ্য বোধগম্য হয়নি।

প্রাঙ্গণে একটি উচ্চ দণ্ডে গেরুয়া রঙের ত্রিকোণাকৃতি পাতাকা উড়ছে। মধ্যস্থলে 'ওঁ' অক্ষরটি সহজেই চোখে পড়ে। পাতাকাটি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোলা হয় এবং কাঁটায় কাঁটায় সূর্যাস্তের সময়ে নামানো হয়। মূল ভূখণ্ডে গান্ধী মণ্ডপের পথে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল কমিটির আপিস আছে। সেখানে একটি বোর্ডে প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় লিখে দেওয়া হয়।

সেপ্টেম্বর মন্দিরটির উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। নটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। সাতাত্তর বছর আগে এই তারিখে চিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামীজি হিন্দুধর্মের বিশ্বজনীন সত্যকে বিশ্ববাসীর নিকট প্রকটিত করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন (খবরের কাগজে দেখেছি) বিবেকানন্দ শিলাটি যেমন ছিল তেমনি রাখলেই ভাল হত। মানুষের নখরাঘাতে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য ক্ষুন্ন হোক এটা তাঁর কাম্য নয়। কিন্তু ভারতবর্ষের শেষ বিন্দুতে স্বামী বিবেকানন্দের এই আসনটির প্রতি নবজাগ্রত ভারত কোনক্রমেই উদাসীন থাকতে পারে না। আমার তো মনে হলো লাল ও ধূসর বালি পাথরের মন্দিরটি শিলাখণ্ডের স্বাভাবিক রূপকে উজ্জ্বলতর করেছে।

মোট ঘণ্টা খানেক এখানে ছিলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু দুপুরে কিছুক্ষণ ফেরি বন্ধ থাকে। এ বেলার শেষ ফেরিখানা ছাড়লে দুপুরের স্নানাহার বরবাদ হয়ে যাবে।

অতএব 'ফিরে চল মাটির টানে'। উজ্জ্বল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম জেটিতে। সিঁড়িগুলিই বা কি চমৎকার!

দুপুরের স্নান ও আহার দুটো নিয়েই বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। স্নান করতে গিয়েছিলাম সমুদ্রে। স্নানের জন্য একটি বাঁধানো ঘাট আছে কুমারী মন্দিরের কাছে। প্রায়-ঝড়ো হাওয়ায় সমুদ্র সেখানে অশান্ত। আমাদের সাহস হয় না জলে নামতে। তবু ভয়ে ভয়ে এখানে সমুদ্রেই স্নান করেছিলাম। জলে দাঁড়িয়ে তর্পণ মন্ত্র পড়া অসুবিধাজনক বলে বাঁধানো মেজেতে বসে জলে পা রেখে উচ্চারণ করেছিলাম—

নমঃ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহোদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥
যে অবান্ধবা বান্ধবা বা যে অন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলং যান্তু যে চ অস্মৎ তোয়কাঙ্খিণঃ॥

এই দক্ষিণেব গোদাবরী-তীরে শ্রীরামচন্দ্র একদা পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রেই তর্পণ করেছিলেন। তার আগেও ভারতবর্ষের মানুষ এটা করতেন নিশ্চয়ই। পরেও হাজার হাজার বছর ধরে একই মন্ত্রে আম। পিতৃপুরুষের তর্পণ করে আসছি। বাড়ি থেকে আসবার সময় চৌদ্দপুরুষের নাম লিখে নিয়ে এসেছিলাম রামেশ্বরম্ বা কন্যা-কুমারীতে তর্পণ করার জন্য। রামেশ্বরের বিধি ব্যবস্থা দেখে প্রবৃত্তি হয় নি। এখানেও কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি। তাই মন্ত্র পড়েই শান্ত থাকতে হল।

স্নানের ঘাটে আসবার পথে টাটার ইঞ্জিনীয়ার অসীম চাটার্জি সাহেবের সঙ্গে পুনরায় দেখা হল। তিনি তাঞ্জোর থেকে আমাদের সঙ্গে রামেশ্বরম্ অবধি ছিলেন। রামেশ্বরম্ থেকে আগে বেরিয়ে যান। এখানে দেখা হতেই উভয় পক্ষের প্রাণখোলা কুশল-বিনিময়—

যেন হারানো মাণিক ফিরে পাওয়া গোছের অবস্থা। অথচ এক সপ্তাহ আগে কেউ কাউকে চিনতাম না। তিনি আমাদের ছবি নিলেন। আর আমাদের স্নান করতে দেখে নিজেও স্নান না করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে জলে নামলেন।

স্নানের ভিজে জামা-কাপড় বগলে করে আমরা তিনটি প্রাণী গলাধঃকরণ করা যায় এমন খাদ্যের খোঁজ করতে চললাম। বহুজনের বিচিত্র কথার মর্ম ভেদ করতে করতে একটি হোটেলে উঠলাম। এখানে একগাদা বাঙ্গালী কিশোরীর কাকলী শুনে আশ্বস্ত হলাম। না, ঐ পর্যন্তই। আমরা তাঁদের কাকলীই শুনেছি, নাকের জলে চোখের জলে একাকার হওয়াটা দেখি নি। তাঁরা কলকাতার উপকণ্ঠের একটি স্কুলের ছাত্রী। শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে এসেছেন। জনৈক শিক্ষিকা তো হোটেল-ওয়ালাকে রান্না শেখাতেই শুরু করলেন। এইসা করেগো, ঐসা করেগো। হোটেলের কর্তা সব কথাতেই হ্যাঁ বলছেন। এদের স্বভাবই এই রকম। আপনার কথার কোন প্রতিবাদ করবে না, অথচ নিজেরা যা করার তার ইতরবিশেষ ঘটাবে না। দিদিমণিকে আমার এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিবেশন করে বললাম—আমি একটা উপায় বাৎলে দিতে পারি। দিদিমণির চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারলাম না তিনি বিরক্ত হয়েছেন, না বিস্মিত হয়েছেন। কথা বলায় আমাকে তখন পেয়ে বসেছে। তাই কপাল ঠুকে বলেই দিলাম—আপনি যদি রান্নাঘরে ঢুকতে পারেন তবেই একটা কিনারা হতে পারে। নান্য পন্থা। দিদিমণি রাগ করার আগে ছাত্রীরা অনেকে আমার দলে ভিড়ে গেল, তারা সমস্বরে আমাকে সমর্থন করল। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি রাতে আপনাদের গেস্ট। এবার সাড়া দেবার জন্য কেউ মুখ খুলল না। তাদের সে অধিকার নেই। আর আমাদের দেশের ছাত্রীদের দিদিমণিদের সামনে হাসতে মানা। রাজ্য সরকারের হাউসে তাঁরা উঠেছেন। আমাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

দুপরে সামান্য বিশ্রামের পর আমি সমুদ্রতীরে ধরে উল্টো দিকে খানিকটা গেলাম। সঙ্গী জুটে গেলেন জনৈক উড়িষ্যবাসী অধ্যাপক। তিনি চলেছেন জেলে পল্লীতে। শত শত তিন-কোণা পাল-তোলা মাছধরার নৌকো আমরা দেখছি। এখনও দেখছি। দূর সমুদ্রে কোনটিকে পাখী, কোনটিকে বা একটি বিন্দুর মতো মনে হচ্ছে। এর উপরে বসা মানুষগুলো নিত্য জীবনমৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার দুঃসাধ্য তপস্যায় রত। আমাদের আবাস থেকে অল্প দূরেই একটি গ্রাম রয়েছে। মূর্তিমান দারিদ্র্য এর চতুর্দিকে নখদন্ত বিস্তার করে রয়েছে। সমুদ্রবুকের মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষগুলোর ঘরবাড়ি ছেলেমেয়ে পরিবারপরিজন একেবারেই বেমানান।

এই অঞ্চলটি ত্রিবাঙ্কুর কোচিন করদ রাজ্যের অধীন ছিল। দেশ স্বাধীন হলে প্রথমে যুক্ত হয়েছিল কেরলের সঙ্গে। পরে ভাষার দাবিতে তামিলনাড়ুর ভাগে পড়েছে। বাইরের এত উত্থান-পতন অদল বদলের পালা সত্ত্বেও এদের জীবনে কোন পরিবর্তন ঘটে নি। শহরের কাছাকাছি অধিকাংশ মানুষ খ্রীস্টান। কাছে পিঠে নাকি একটি অতি প্রাচীন গীর্জা আছে। গ্রামে এত বড় গীর্জা আর কোথায়ও নেই। খ্রীষ্টান হলে কি হবে, ভারতীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার ('কু' 'সু' উভয়ই) থেকে এঁরা মুক্ত নন বলে জানালেন অধ্যাপক মহান্তি। তিনি গঞ্জাম জেলার লোক। সেখানেও অনেক খ্রীষ্টান আছে। মুসলমানরা নিজেদের ভারতীয় বলে মেনে নিতে একদিন অস্বীকার করেছিল। সেটা যে মিথ্যা তা তো আজ প্রমাণিত সত্য। তবে এ কিসের গবেষণা। বুঝিনি তার কথা। যেটুকু বুঝেছি তা হল ভারতের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান শিখ জৈন এবং হিমালয়ের বা আসামের পাহাড়ী মানুষ, দক্ষিণ সমুদ্র তটের অধিবাসী এবং বাঙলা বিহার ওড়িশার সমতলের নরনারীর মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেটা কি—কোন্ আচার-আচরণের মধ্যে তা হিমালয় থেকে

কন্যাকুমারী এবং আরব সাগর থেকে অরুণাচল পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাভারতের ঐক্য বিধান করেছে—তাই তিনি খুঁজে দেখতে বেরিয়েছেন।

অপরাহ্ণ বেলায় বেরোলাম গান্ধীমণ্ডপের দিকে। সমুদ্র এ বেলায় আরও একটু বেশী বিক্ষুব্ধ হয়েছে। আকাশে মেঘ জমাট বেঁধেছে। সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখা কপালে নেই। গান্ধী স্মৃতিসৌধের ছাদে চড়লে সূর্যাস্ত দেখার ভারি সুবিধা হয়। সূর্যাস্ত দেখা যাবে না জেনেও সকলে উপরে চড়ছেন। গান্ধীমণ্ডপ তো দেখা হবে এই ভেবে আমরাও এগোলাম। এই মন্দিরটি ভারতবর্ষের স্থলভাগের শেষ বিন্দুতে নির্মিত হয়েছে। তাই তিন তলায় উঠে একবার ভাল করে স্থলভাগের দিকে চেয়ে দেখলে সহজেই বুঝা যায়; শেষ বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছি। মহাত্মা গান্ধীর অনেকগুলি স্মৃতিসৌধ সারা ভারতে নির্মিত হয়েছে। সেগুলির আকার আকৃতি প্রায় এক রকম। কিন্তু মাতৃতীর্থের এই নবীন তীর্থ গান্ধীমণ্ডপের কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে।

গান্ধীজির চিতাভস্ম এখানে তিন সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় ১৯৪৮ সনে ১২ই ফেব্রুয়ারি। যেখানে দঁড়িয়ে চিতাভস্ম বিসর্জিত হয়েছিল সেখানেই গড়ে উঠেছে গান্ধী স্মৃতিসৌধ। এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। নীচের তলায় যে বেদীটি আছে সেখানে বছরে একটি দিন (গান্ধীজির জন্মদিন) দুপুর বারোটার সময় উপরের গবাক্ষ পথ দিয়ে সূর্যকিরণ এসে পড়ে।

ভারতবর্ষ এই বিন্দুতে শেষ নয়, এখান থেকে শুরু। আর আগামী দিনের বিশ্ব হবে গান্ধীজির পৃথিবী। ভারতবর্ষ থেকে হবে সেই পৃথিবীর শুরু। গান্ধীজির গ্রাম-স্বরাজ ছাড়া সুখে ও স্বস্তিতে মানুষের বেঁচে থাকার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। এ সত্য আমরা সহজে হয়তো বুঝব না, ঠেকে শিখব। আজ সারা বিশ্বে যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতির

ফলে দুর্বিবহ বেকারী দেখা দিয়েছে, মানব চরিত্র অবনত হয়েছে। এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বকার্যে যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। মানুষের হাত যা করতে সমর্থ সেখানে যন্ত্রকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তবেই সব হাত কাজ করবার সুযোগ পাবে। নইলে যন্ত্রদানব মানুষ দেবতাকে পরাজিত করে পৃথিবীতে দৈত্যের রাজত্ব শুরু করবে। তারই লক্ষণ ইতিমধ্যে দেখা যায় নি কি? ঈশ্বরের, সত্যের, সাম্যের, অনুসন্ধান যিনি করেন, সুস্থ মানবতার পথিক যে জন, গান্ধীপথ তাঁরই পথ।

যন্ত্রের যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতেই সারা পৃথিবীর আবহাওয়া বিষাক্ত হবার উপক্রম হয়েছে। এই হারে চলতে থাকলে পঁচিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে বলে বিশ্ববিজ্ঞানীরা সাবধান করে দিয়েছেন। আবহাওয়া বিষাক্ত হলে অকালে মরতে হবে বহু মানুষকে।

গান্ধীজি বলেছেন—প্রয়োজন বাড়ানোকে সভ্যতা বলে না, সভ্যতা হল স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনকে হ্রাস করা। এটা প্রাচীন ভারতবর্ষের বৈদিক আদর্শ। মানুষের বাঁচতে হলে এ পথে আসতেই হবে।

গান্ধীজি কন্যাকুমারী এসেছিলেন ১৯৩৭ সনে। তিনি তখন এই স্থানটি সম্পর্কে লেখেন—I am writing this at the cape, in front of the sea where three waters meet, and furnish sight unequalled in the world. For this is no port of call for the vessels, like the goddess the waters around are virgin. কথা ক'টি গান্ধী সৌধে ক্ষোদিত আছে।

কুমারী সমুদ্রের কুমারীত্ব হয়ত সেই দিন ঘুচবে যে দিন মানুষ আবার সমস্বরে বলতে শুরু করবে:

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

নেমে আসতেই দেখা পেলাম আরও কয়েকটি পুরানো পরিচিত মুখের। প্রজ্ঞা আর তার মা বাবা। প্রজ্ঞার বয়স বছর পাঁচেক, তার বাবা এবং মা উভয়েই আত্রার রেল স্কুলের শিক্ষক। আমাদের পরিচয়ের মাধ্যম ছিল প্রজ্ঞা—পণ্ডিচেরির নিউ সুইট হোমে। মোহনদার সঙ্গে তার ভাবটা জমেছিল বেশি। কত যে নিভৃত আলাপ হত তাদের! এখানে দেখলাম সকলের প্রতিই সে সমান মনোযোগী। ফেরার দিন মাদ্রাজ স্টেশনে আমরা আবার মিলিত হয়েছিলাম। প্রজ্ঞার বাবা ঠিকানা লিখে দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন সুবিধা মত তাঁদের বাড়ি যাবার জন্য।

কুমারিকা অন্তরীপের ইংরেজি নাম কেপ কমোরিণ। কুমারী থেকে কি কমোরিণ হয়েছে? তিন সমুদ্রের জল এক, কিন্তু তিন এলাকায় তিন রঙের বালুকার দর্শন মেলে। সাদা, লাল আর হলুদ। তার আকার গোল নয়। চালের মত দেখতে। কলকাতার রেশনের চালে যেমন কাঁকর মেশানো থাকে এর অনেকগুলির আকার আকৃতি ঠিক তেমনি। ঐ কাঁকরগুলি এখান থেকে চালান যায় কি না কে জানে!

রং বেরঙের বালির একটা মজাদার গল্প আছে। শিবঠাকুর কন্যাকুমারীর প্রেমে পড়ে তাঁকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করেন। শিবের ইচ্ছায় বাদ সাধবে কে? সব ঠিকঠাক হল। একেবারে রাজকীয় স্কেলেই সব হয়েছিল। এদিকে দেবতারা প্রমাদ গণলেন। কুমারী কন্যার হাতে বাণাসুর বধ হবার কথা। সেই জন্য কন্যাকুমারীর সৃষ্টি। শিবঠাকুর বিয়ে করে বসলে এত দিনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বাণাসুরের দাপটে টেঁকা যাবে না। নারদের উপর ভার পড়ল একটা বিহিত করার জন্য। কৈলাস থেকে শিব আসছেন। পথ তো কম নয়।

আসতে একটু রাত হয়ে গেল। কিন্তু রাত্রের মধ্যে পৌঁছতে হবে নইলে বিয়ে ভেস্তে যাবে। তিনি একটু পা চালিয়ে দিলেন। তাতে কি হবে, বাহন তো ষাঁড়। সে আর কত জোরে চলবে। তবু আসতে পারতেন রাত্রের মধ্যে। নারদ করলেন কি, কুমারিকা থেকে মাইল তিনেক দূরে যখন শিবঠাকুর এসে গেছেন, তখন মোরগ ডেকে উঠলেন। ব্যাস, তাতেই কাজ হল। বিদ্যাবুদ্ধি বেশি হলে অনেক সময় সাধারণ জ্ঞানে টান পড়ে বলে প্রবাদ আছে। শিব ঠাকুরের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

ভোলা মহেশ্বর মনে করলেন ভোর হয়েছে বলেই মোরগ ডেকেছে। রাত যখন কাবার তখন আর গিয়ে কি হবে, সেইখানেই বসে পড়লেন। জায়গাটির বর্তমান নাম শুচিন্দ্রম। এখানে শিবের একটি সুন্দর মন্দির আছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের বালমূর্তি। এই মন্দিরের বিশেষত্বের কথা শুচিন্দ্রম প্রসঙ্গে বলা যাবে।

এই অঘটনের কথা তো আর কন্যা জানেন না, তিনি সুসজ্জিতা হয়ে অপেক্ষাই করতে থাকেন। অপেক্ষা করতে করতে রাত এক সময় সত্য সত্য প্রভাত হল—শিবের দেখা মিলল না। প্রতীক্ষারতা কন্যা ভগবতী তখন ঠিক করলেন বিয়ে আর কখনই করবেন না। তাই আজও তিনি কুমারী। এর মধ্যে যতটা দেবত্ব আছে, মানবিকতা তার চেয়ে কম নেই। এই ঘটনার মধ্যে কুমারী কন্যার আত্মমর্যদাবোধ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তা না হলে হয়ত আর কোনদিন আবার এই বিয়ে হতে পারত। তেমনটি যে ঘটে নি তার জন্য ভারতের নারী সমাজ গর্ববোধ করতে পারেন।

আজও বিয়ের উৎসবের সঙ্গে বিপুল ভোজের আয়োজন ঘটে। কন্যা ভগবতীর বিয়ে উপলক্ষে তার ব্যতিক্রম হয়নি। শিবঠাকুর আর ভগবতীর বিয়ে। ত্রিলোকের মিলন ঘটার কথা বিবাহ-বাসরে। তাই

সেদিনকার সুখাদ্যের আয়োজনের বহরটা সহজেই অনুমেয়। সেই খাদ্যবস্তুই নাকি নানা রঙের বালুকা আর পাথরের নুড়ি হয়ে ছড়িয়ে আছে কুমারিকা অন্তরীপ জুড়ে। বালির দানাগুলি যে চালের আকৃতি তা তো সাদা চোখেই দেখলাম। এ কাহিনীর মূলে কোন সত্য আছে কি না তা জানতে আমার আগ্রহ নেই। স্মরণাতীত কাল পূর্বে এমন অনবদ্য মধুর কথা যিনি রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও দূরদৃষ্টিকে অস্বীকার করবে কে? দেবী কুমারীর সঙ্গে তাঁকেও প্রণাম করে আমরা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে এগোলাম।

আসতে আসতে সুধীরদা স্মরণ করলেন কন্যাকুমারীর জন্মবৃত্তান্ত। স্কন্দ পুরাণে আছে দৈত্যরাজ বাণাসুর দেবতাদের পরাজিত করে স্বর্গের অধিকার লাভ করেন। দেবতারা যখন অসুরের পদানত হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করছেন তখন ভগবতী শক্তি এলেন তাঁদের উদ্ধার করতে। কুমারী কন্যারূপে তিনি এখানে এসে অসুর বধের শক্তি অর্জনের সাধনা করতে থাকেন। বিয়ে করে ঘরসংসারে মন দিলে আসল কাজ অর্থাৎ অসুর নিধন হবে না, তাই দেবতারা চক্রান্ত করে ভণ্ডুল করে দিলেন বিয়ে। পরে বাণাসুর দেবী কর্তৃক নিহত হন। যে অস্ত্রে (চক্র) তিনি অসুরকে হত্যা করেছিলেন সেটা নাকি মাইল খানেক দূরে গিয়ে ভূমি বিদ্ধ করে একটি কূয়া সৃষ্টি করেছিল। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের পাশে স্বাদু জলের উৎস রূপে এই কূয়োটি আজও দেখা যায়। জায়গাটি এখন শ্মশান রূপে ব্যবহৃত হয়। কালক্রমে বিশ্বনাথ শিবের একটি মন্দিরও নির্মিত হয়েছে এখানে। কন্যাকুমারী নামের অন্য একটি ইতিহাসও শ্রুত হয়।

ভরত রাজা পরিণত বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তার পূর্বে তিনি সাম্রাজ্যটিকে নয় ভাগে ভাগ করে পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিলি করে দেন। তাঁর একমাত্র কন্যা পান দক্ষিণতম প্রান্তের খণ্ডটি। তিনি

কুমারী ছিলেন, তাই নাম হয়েছে কুমারিকা। যে কারণেই নাম হয়ে থাক, স্থানটীর প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। দাক্ষিণাত্যের প্রবল প্রতাপশালী এবং সুখ্যাত পাণ্ড্যরাজাদের সময়েও কুমারিকার খ্যাতি ছিল। কেউ কেউ বলেন কন্যাকুমারী এই রাজাদের গৃহদেবী ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক পোলেমির লেখায়ও কন্যাকুমারীর উল্লেখ আছে।

ঘটনাচক্রে সান্ধ্য আরতির মুহূর্তে আমরা কুমারী কন্যা মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলাম। এখানেও পুরুষদের ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত করে মন্দিরে ঢুকতে হয়। তবে চাদর বা তোয়ালেতে আপত্তি নেই। নানা ধরণের আলোর আরতি। দর্শকদের দাঁড়াবার স্থান থেকে দেবীর সিংহাসন বেশ দূরে এবং ভাল করে দেখা যায় না। আসনটি বহু প্রদীপের আলোয় সুন্দর করে সাজান। আরতির বাজনা সেই ঢোল ও লম্বা সানাই। লম্বা সানাইয়ের স্থানীয় নাম নাদেশ্বরম। ভিড় মোটামুটি মন্দ ছিল না। কেরলের একটি খ্রীষ্টান মিশনারী কলেজের বহু ছাত্রী ছিলেন। তাঁদের আগ্রহ ও ভক্তি কারও চেয়ে কম দেখলাম না। এদের সঙ্গে পুরোহিতের কোন বন্দোবস্ত হয়ে থাকবে। সকলেই দেবীকক্ষে প্রবেশ করে নিকট থেকে প্রতিমা দর্শন করার সুযোগ পেলেন। আমিও কারও অনুমতির অপেক্ষা না করে তাদের অনুসরণ করেছিলাম। প্রবেশ পথের দরজাটি নীচু। বেরোবার দুয়ার ভিন্ন এবং আরও ছোট। একটু বেখেয়াল হলে পাথরের চৌকাঠে মাথা ঠুকে যাবেই।

ঋজুভঙ্গীতে দাঁড়ান দেবী মূর্তি। মুখখানি অপূর্ব সুন্দর। নানা রঙের ও আকৃতির প্রচুর ফুলমালা সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে বলে মনে হল। ধূপ দীপ চন্দনের সমারোহও খুব। দেবী সালঙ্কারা। বড় বড় হীরকখণ্ডের দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়। আর তার ফলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়।

এ মন্দিরেরও পুরোহিতের চেহারা ভক্তির উদ্রেক করে না।

একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছি মীনাক্ষী মন্দিরে। সেখানে অধিকাংশ পুরোহিত সুদর্শন এবং কয়েকজনের সঙ্গে সামান্য সামান্য আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁরা সংস্কৃতজ্ঞ তো বটেই, ইংরেজীও জানেন। কন্যা-কুমারীতেও হিন্দী, এমন কি বাংলা জানা দু-চার জনের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

দেবী মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশ পথ উত্তর দিকে। পুব দিকে একটা দরজা আছে সেটা আজকাল খোলা হয় না। মন্দিরে কিছু শিল্প কীর্তি আছে, কিন্তু তা অসাধারণ কিছু নয়। মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার পথে আমার মনে হতে লাগল ভারতবর্ষে দেবতার চেয়ে দেবীর সংখ্যাই বোধ করি বেশি। দেবতারা যেখানে ব্যর্থ দেবীরা সেখানে সার্থক বলে কীর্তিত হয়েছেন। কুমারী দেবী তো দেবতাদের পরাধীনতার গ্লানিমুক্ত করেছেন। এই দেবী-প্রাধান্য থেকে অনুমিত হয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারী-প্রাধান্য ছিল। সমাজে নারীর সংখ্যা কম বলেই কি তাঁরা বন্দিত হয়েছেন? দুর্লভ জিনিসের কদর ও মূল্য উভয়ই বেশি হয়।

সব মন্দির-প্রাঙ্গণের মত এখানেও সৌখীন ও প্রয়োজনীয় নানা দোকানপাট রয়েছে। সৌখীন জিনিসগুলি কোন্‌টি আসল কোন্‌টা নকল চিনে ওঠা দুষ্কর। ভাজ করা মাদুরগুলি বেশ। একটি পুরো মাদুরকে খণ্ডবিখণ্ড করে কাপড় দিয়ে জুড়ে ভাঁজ করার ব্যবস্থা হয়েছে। ভাঁজ করার পর একটি প্রমাণ সাইজের মাদুর একখানা বাহাদুর খাতার চেয়েও ছোট হয়। দেড় দুটাকা থেকে বিশ ত্রিশ টাকা দামেরও মাদুর আছে।

সন্ধ্যার পরও রাস্তাঘাটে মানুষ ছড়িয়ে আছে। খুব অল্প পরিসর জায়গা। অনেকের সঙ্গে একাধিক বার দেখা হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে এক-আধবার কেউ কোন কথাবার্তা বলেন না, কিন্তু দ্বিতীয় তৃতীয়বার দেখা-সাক্ষাৎ হলে প্রায়ই আলাপ জমে ওঠে। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে সব বয়সের নরনারী এসেছেন। বাংলার লোকজনও অনেক।

কিসের টানে এঁরা এত দূরে পাড়ি জমিয়েছেন? নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—আমি কেন এসেছি। পুণ্যলাভের জন্য? অথবা সুন্দরকে দু'নয়ন ভরে দেখব বলে এসেছি? এর কোন নিশ্চিত উত্তর আমার মন জানে না। আমার বিশ্বাস অধিকাংশ হিন্দু যাত্রীর মনে সুনির্দিষ্ট কোন উত্তর নেই।

যত চেষ্টাই করি না কেন, পুরুষ পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া কি সহজ কথা! বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালেই মনটা আপনা থেকেই নম্র নত হয়ে ওঠে। কেউ আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, কেউ কেউ বা শুধুই মনে মনে, বাইরে তার কোন প্রকাশ ঘটে না। দক্ষিণ ভারতীয়েরা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে কেউ প্রণাম করেন না দণ্ডায়মান অবস্থায় যুক্ত করে প্রণাম করাই এখানে বিধেয়।

তিন সমুদ্র, ভারত মহাসাগরকে মধ্যে নিয়ে আরব সাগর আর বঙ্গোপসাগর—কোথায় কার শুরু বা শেষ—কে তা নির্ণয় করবে! কন্যাকুমারীর কর্তৃত্ব বদল হয়েছে, মাদ্রাজের নাম বদল হয়েছে কিন্তু মহাম্বুরাশির কোন পরিবর্তন নেই। বঙ্গোপসাগর নামের 'বঙ্গ'টুকুর জন্য এত কথা মনে পড়ল, পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায় হোটেলের ছাদে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। না, এখানে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত কোনটা দেখা এবার আমাদের ভাগ্যে নেই। সামান্য একটু রক্তিম আভা মাত্র দেখেছি। মেঘের দাপটে আর কিছুই দেখা গেল না। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় এখানে বঙ্গোপসাগরে যখন পূর্ণ চন্দ্রোদয় হয় ঠিক তখনই আরব সাগরে দিনমণি ডুবতে থাকেন। সে নাকি এক অপূর্ব দৃশ্য। গান্ধী স্মারকের উপর দাঁড়িয়ে দুটো দৃশ্যই এক সঙ্গে দেখা যায়। আমাদের হাতে আর সময় নেই, তাই কন্যাকুমারীতে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিয়ে তখনই যাত্রা করলাম ত্রিবান্দ্রমের পথে।

বাস বা ট্যাক্সী এক মাত্র যান। শেয়ারের ট্যাক্সীও পাওয়া যায়। জনপ্রতি টাকা-দশেকের মধ্যে হয়। পথে তাঁরা শুচিন্দ্রম মন্দির দেখিয়ে নিয়ে যান। শুচিন্দ্রম মন্দিরের খ্যাতি দু'টি কারণে। কন্যাকুমারীর ভগবতী দর্শনের ফল পেতে হলে শুচিন্দ্রমের শিব দর্শন করতেই হবে। এখানে মহর্ষি অত্রির বিদুষী সহধর্মিণী শ্রীমতী অনুসূয়ার সঙ্গে ছলনা করতে এসে স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দিকপাল দেবতাকে নাকানি চোবানি খেতে হয়েছিল এই মানবীর হাতে। দেবতা তিনজন অতিথির বেশে আশ্রমে আসেন। ভারতবর্ষে অতিথি দেবতারূপে সংকৃত হবার অধিকারী। অতিথিরূপী দেবতাত্রয়ের দাবি ছিল অনসূয়াকে নগ্ন দেহে খাদ্য পরিবেশন করতে হবে। এই নারী অতিথিদের দাবি পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগে তাঁদের বালকে রূপান্তরিত করে নেন। তারপর নানা কাহিনী। অনেক নাকানি-চোবানির পর দেবতারা উদ্ধার লাভ করেছিলেন। সেই স্মৃতি বহন করে তিন বালদেবতা এখানকার মন্দিরে বিরাজ করছেন।

শুচিন্দ্রমেও উর্ধ্ব-দেহ অনাবৃত করে মন্দিরে প্রবেশ করার বিধি। শিবের একটি সুন্দর মানুষ মূর্তি আছে এখানে। শিবের এই রকম বিগ্রহ আর কোথায়ও দেখিনি, আছে বলেও শুনি নি। মন্দির, বিগ্রহ ও জনপদের নামকে কেন্দ্র করে নানা পৌরাণিক কাহিনী আছে। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু স্থানাভাব। ইন্দ্রের লুব্ধদৃষ্টির শিকার হয়ে অহল্যা পাষাণ হয়েছিলেন গৌতমের শাপে। আর ইন্দ্রের দেহে ফুটে উঠেছিল সহস্র যোনি চিহ্ন। এইখানে তপস্যা করে, চিকিৎসিত হয়ে, ইন্দ্র নিরাময় বা শুচি হন। তাই জায়গাটির নাম হয়েছে নাকি শুচিন্দ্রম। কাছেই কিন্তু ঔষধি বনের জঙ্গল আছে। নাম ভানলাই পাহাড়। গন্ধমাদন নিয়ে যাবার সময় এক টুকরো পাহাড় হনুমানের মাথা থেকে এখানে ভেঙ্গে পড়েছিল বলে কিংবদন্তি। এই গল্প নানা স্থানে ভিন্ন পরিবেশে

পরিবেশন করা হয়েছে। স্থান কাল পাত্র নিয়ে তাই মাথা ঘামান নিরর্থক। মূল মর্ম কথাটি সেই হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত বোধ করি এক।

নাগেরকয়েল পর্যন্ত তো পুরানো রাস্তা, যে রাস্তায় তিরুনেলভেলি আমরা এসেছিলাম। এখানে পঞ্চ মুণ্ডি সর্পমন্দির আছে বলে শুনেছি। কয়েল মানে মন্দির। নাগ যে সাপ তা আমরা সকলেই জানি। সমুদ্র উপকূলবর্তী বঙ্গ দেশে সাপের খুব উৎপাৎ। সেখানে সাপ তাই পুজো পায় একটু বেশি করে। বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে সাড়ম্বরে মনসা পূজা হয়। মনসা গ্রামের নামও আছে সে দেশে। এখানে আমরা যান বদল করে ত্রিবাস্ত্রমের বাস ধরলাম। কেরল ও মাদ্রাজ দুই রাজ্য সরকারেরই পরিবহন সংস্থার বাস আছে। আমরা হাতের কাছে মাদ্রাজ সরকারের একটা বাস পেয়ে তাতেই উঠে বসলাম। মজুরের জুলুম এখানে সীমাহীন। বাস কনডাকটর এবং সাধারণ ভাবে অন্য যাত্রীরা মজুরদের এই জুলুমবাজির অপ্রত্যক্ষ সমর্থক। এক টাকা মজুরিও যার হতে পারে না, তার জন্য চার টাকা দাবি শুনে তো আমরা আকাশ থেকে পড়লাম। জেদ চেপে গেল। যা থাকে ভাগ্যে জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করব না। সে দুর্বোধ্য ভাষায় যত চিৎকার চেঁচামেচি করে তত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা আমাদের বক্তব্যে অটল রইলাম। এই দৃঢ়তায় ফল হয়েছিল। জনৈক স্থানীয় যাত্রী একটা রফা করে দিয়েছিলেন। কনডাকটরাও ওদের ভয় পায়। ওরা নাকি হিংস্র প্রকৃতির!

কন্যাকুমারী জেলাকে স্থানীয় লোকেরা সংক্ষেপে কে-কে জেলা বলে। নাগেরকয়েল জেলা শহর। এর দক্ষিণে যতটা উত্তরে তার চারগুণের বেশি। কোভালম্ বীচের সামান্য দক্ষিণ থেকে কেরল রাজ্যের শুরু হয়েছে। কোভালম বীচ বাস থেকে আমরা দেখতে পাই নি। তার সৌন্দর্য অতুলনীয়। এই বেলাভূমি এখন নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছে।

ভারত সরকার আরব সাগরের তীরে বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য কুঞ্জবন গড়ে তুলেছেন। কথাকলি নাচ, আয়ুর্বেদিক মতে অঙ্গ সংবাহন, তৈল স্নান, যোগ-ব্যায়াম ইত্যাদির সঙ্গে ধ্যান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে।

ত্রিবান্দ্রম্

কিন্তু নাগেরকয়েল থেকে ত্রিবান্দ্রম সমগ্র পথটির প্রাকৃতিক শোভারও বুঝি কোন তুলনা নেই। এ রাস্তাও সেই পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার সানুদেশ দিয়ে চলেছে সোজা উত্তরে। পথের দু পাশই প্রকৃতি তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে অপরূপ করে সাজিয়ে দিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না সহজে। বড় দুঃখ এগুলি পলকে পার হয়ে যাচ্ছি। সেই পরিচিত ধান ক্ষেত, কাঁঠাল, তেঁতুল, নারকেলের বনের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে কফি ক্ষেত। দু-চারটি আম সুপারীর গাছও চোখে পড়ছে। যতই ত্রিবান্দ্রমের দিকে এগেচ্ছি ততই নরনারীর চেহারার রুক্ষতা কমছে, বেশবাসে সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হচ্ছে।

ডকটর নীহার রায় বলেছেন বাঙ্গালীর সঙ্গে দক্ষিণীদের মিল বেশ। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক্ থেকে কথাটার মধ্যে কতটা সত্য আছে জানি না। তবে কেরলের মানুষ দেখে ডকটর রায়ের কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে। বাংলার মত এখানে একটা বলিষ্ঠ মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে। মধ্যবিত্ত মানুষই সমাজের সর্ববিধ উন্নতির অগ্রদূত। আজকাল গৌরব করে শ্রমিক কৃষক বলা হয়। নেতারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ।

কলকাতা শহর দেখতে অভ্যস্ত চোখ ত্রিবান্দ্রম শহরের ক্ষুদ্র দুই-একটি এলাকা ছাড়া অন্য অংশকে শহর বলতে দ্বিধা করবে। পরিচ্ছন্ন রাজপথের পর তরুবীথিকায় ছাওয়া অনুচ্চ সপ্রাঙ্গণ বাড়ি যে শহরের সীমানার মধ্যে থাকতে পারে, দু-চারটি নয়—শত শত, তা এই কেরলে এসে জানতে হয়।

ত্রিবান্দ্রম কেরল রাজ্যের রাজধানী। এটি যখন করদ মিত্র রাজ্য

তখনও রাজধানী ছিল এখানে। পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরকে কেন্দ্র করেই আরব সাগর তীরে গড়ে উঠেছে এই শহর। স্বাধীন ভারতবর্ষে কেরলই প্রথম রাজ্য যেখানে বিরোধী দল একটি অকংগ্রেসী সরকার স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মলায়লম ভাষাভাষীদের কেরল রাজ্য গঠিত হয়েছিল ১৯৫৬ সনের কে এম পানিক্কর কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে। প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই রাজ্যটি সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এর শক্তিশালী বিরোধী রাজনৈতিক দল, প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত সমাজকে এড়িয়ে চলবার সাধ্য নেই। শিক্ষিতের হার এখানে সর্বোচ্চ। গোলমরিচ রবার ও কফির প্রায় একচেটিয়া উৎপাদকও এই দেশটি। খ্রীষ্টান মিশনারি কাজকর্মের ক্ষেত্রেও এই রাজ্যের প্রসিদ্ধি সর্বাধিক। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে সুন্দর করে রাজ্যটিকে সাজিছেন। গুণকীর্তন বোধ হয় একটু বেশি হয়ে গেল। কিন্তু এর কোনটাই তো মিথ্যা নয়।

ঘটনাচক্রে অনেকদিন আগে একবার বামপন্থী কম্যুনিষ্টদলের সর্বভারতীয় নেতা ও কেরলের তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রি-পাদের সঙ্গে মিনিট পনের নিভৃতে আলাপের সুযোগ ঘটেছিল। তখন বনগাঁ কৃষক সম্মেলন হচ্ছে। সেই সম্মেলন থেকে ফেরার পথে মধ্যমগ্রামে একটা প্রোগ্রাম ছিল। মধ্যমগ্রাম স্টেশনের মাঠে আমি ভোরে বেড়াতে গিয়েছি। একখানী গাড়ি এসে সেই মাঠে দাঁড়াল। ফাঁকা মাঠে ভবানী সেন মশায়কে নামতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। ঐ গাড়িতে ছিলেন নাম্বুদ্রিপাদ। এখানে মীটিং হবার কথা। অত সকালে যে ওঁরা আসবেন উদ্যোক্তারা তা আশা করতে পারেন নি। তাই তাঁরা তখনো হাজির হন নি। ভবানীবাবু বিব্রত বোধ করছিলেন। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে ই এম এসকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে তিনি দলের লোকজনের খোঁজে গেলেন। একজন সর্ব-ভারতীয় নেতা আরও মুখ্যমন্ত্রী, আমি আর কি আলাপ করব?

গাড়ির দরজাটা খোলাই ছিল। দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুই-একটা কথা কইছিলাম। তিনি হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। চারি পাশের নারকেল গাছ ও কলা ঝোপের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কেরলের সঙ্গে এর বস্তুত কোন তফাৎ নেই। মুগ্ধ মনে স্বগতোক্তির মত বললেন—আসুন, আমার কেরলে দেখবেন আপনাদের দেশের সঙ্গে তার সাদৃশ্য কি গভীর। এ কথা পূর্বেও শুনেছি। লোকে বলে পূর্ব বাংলার সঙ্গে মিলটা আরো বেশি, তাও জানালাম। তিনি নিম্নবঙ্গ দেখেন নি। উদ্বাস্তুদের খোঁজ খবর নিলেন কিছু। ইতিমধ্যে ভবানী সেন মশায় দলীয় লোকজন নিয়ে হাজির হয়েছেন। আমি সরে এলাম। নাম্বুদ্রিপাদের কয়েক মিনিটের আলাপে মুগ্ধ হয়েছি—এবং মনে বাসনা জেগেছে সুযোগ হলেই কেরল যেতে হবে। কত বছর পরে সেই সুযোগ আজ হয়েছে! দেরি হোক তবু হয়েছে, সেজন্য ভাগ্যবিধাতাকে প্রণাম করি। কেরলে এসে বুঝেছি নাম্বুদ্রিপাদ সতই বলেছিলেন বাংলার প্রকৃতি আর কেরলের প্রকৃতির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষগুলোকেও একটু বেশি আপনার মনে হয়। ভাল-বাসতে ইচ্ছে করে।

ত্রিবান্দ্রমে আমরা রেল স্টেশনের নিকট কর্পোরেশনের লজ-এ উঠেছিলাম। কর্পোরেশন আধাসরকারী ব্যাপার, তাই বোধ হয় কর্মচারীরা এখানে অমোনযোগী। বেলা দশটার মধ্যেই আমরা এখানে পৌঁছেছিলাম। শান্ত শহর, জীবন চলে অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে। দ্রুত স্নানাহার সেরে বেরিয়ে পড়েছিলাম নগর পরিক্রমায়। আমাদের তালিকায় ত্রিবান্দ্রমের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে পদ্মনাভ স্বামী মন্দিরটিই ছিল প্রধান। তাই হাঁটিতে হাঁটিতে সেখানেই গেলাম সর্বাগ্রে। আদালত পাড়ার মধ্য দিয়েই পথ। তবু পথে তেমন ভিড় নেই। মানুষের চেয়ে যান বাহন এখানে কিঞ্চিৎ বেশি মনে হল। রাস্তা সামান্য অসমতল। হাঁটবার সময় চড়াই-

উৎরাই, তা যত সামান্য হোক, বেশ অনুভব করা যায়। চড়াইয়ে ক্লান্তি আসে, গতি মন্থর হয়।

পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির-প্রাঙ্গণ বড় রাস্তা থেকেই শুরু। আসল মন্দিরটা ভেতরে। কিছু দোকান, বাড়িঘরও, একটা বড় পুকুর পেরিয়ে এই মন্দির। দুপুরে বন্ধ থাকে। খুলবে সেই বিকেল ৫।টার সময়। আমরা কালক্ষেপ না করে ফিরে এলাম বাস স্ট্যাণ্ডে। কোভালম সৈকত, মৎস্য সংগ্রহশালা, যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারি ছিল আমাদের গন্তব্য স্থল। বাস স্ট্যাণ্ডে বিজয়ন নামে একটি যুবক যেচে আলাপ করল। কোথায় যাবেন? বাংলা থেকে আসছেন বুঝি? যুবকটির বয়স কম। তথাকথিত সৌজন্যের ধার ধারে না। সোজাসুজি কাজের কথা বলে। এতে প্রথমে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেও, পরে ভাল লাগে। বাসে করে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দেবার প্রস্তাব করল সে। বাস ভাড়া ও দুটো টাকা মাত্র তার দাবি।

প্রথমে সামান্য সংশয় যে না ছিল তা নয়। কিন্তু একটা পরিচিত লোক থাকলে যে অনেক সুবিধা তা আমরা ঠেকে শিখেছি। তাই ছেলেটির হাতে নিজেদের সঁপে দিলাম। যেখানে যাই ৫॥টার মধ্যে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে ফিরে আসবার প্রয়োজনের কথা তাকে বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলে সে আমাদের আশ্বস্ত করে বলল—সেজন্য কোন ভাবনা নেই। আমার আশঙ্কার কথা অবশ্য গোপন করলাম না। কোভালম বীচ ১৮ কিলোমিটার—বাসে যাওয়া-আসা, অন্যান্য স্থানে ঘোরা-ফেরার জন্য ঘণ্টা চারেক সময় কি যথেষ্ট? সে আমার কথার উত্তর দেবার আগে একটা বাস এসে দাঁড়াল। তার নির্দেশে দ্বিতল সেই বাসখানার উপরের তলায় বসলাম। কোথায় চলেছি আমরা? সে জানাল মৎস্য সংগ্রহশালায়।

শহরের ছোট-বড় নানা পথ ঘুরে এঁকে বেঁকে বাস চলেছে। কেরলের সেই বিখ্যাত নারকেল তরুবীথি ঘেরা ছোট ছোট সরল রেখার

মত খালে ছবির মত নৌকোগুলো, দাঁড়িয়ে আছে। নারকেল ছোবড়া বোঝাই করা এই সব নৌকোর ছবি দেখেছি বিস্তর। এবার তা নিজের চোখে দেখে ধন্য হলাম।

আমরা ভিন্ন পথে ফিরেছিলাম। বাসে যাওয়ার এই সুবিধা। রুট বদল করলে নতুন পথে ঘোরা যায়। বিজয়ন ভাই যাওয়া-আসার পথে এক-একটা বাড়ি দেখিয়ে বল্লে চলেছেন—এটি বিশ্ববিদ্যালয়, বিধান সভা, অমুক কলেজ ইত্যাদি। বিধানসভা বা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সেক্রেটারিয়েট এ সব কিছুই দেখা হয়নি, দেখেছি কতকগুলি পাকা বাড়ি।

বাসটা এক সময় হুঁস করে জঙ্গল ঘরবাড়ির থেকে বেরিয়ে যেন হঠাৎ দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। একদিকে তার শান্ত সুনীল সমুদ্র, অন্যদিকে বহু দূর প্রসারিত বেলাভূমি। সমুদ্রতীর ধরে আমরা চলেছি। রাস্তাটি চমৎকার। তার দুপাশে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। ত্রিবান্দ্রম্ বিমান বন্দর ডাইনে রেখে আমরা রাজ্য সরকারী মৎস্য সংগ্রহশালায় উপস্থিত হলাম। বালুময় প্রান্তরে একটি বাড়িতে এই সংগ্রহশালা। একেবারে হাল আমলে তৈরি। বাগানটি সুদৃশ্য, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

দেওয়ালে সারি সারি কাঁচের চৌবাচ্চা বসিয়ে বহু রকম মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি সামুদ্রিক প্রাণী রাখা আছে। সোমবার দিন বন্ধ থাকে। আমরা যখন দেখতে গিয়েছিলাম তখন জনা দশেক বাঙ্গালী ছাড়া আর কোন দর্শক ছিলেন না। রং-বেরঙের মাছের চেয়ে রঙ্গীন কচ্ছপগুলি বিশেষ আকর্ষক মনে হয়েছিল। এগুলির কোনটির মুখ প্রায় পাখীর ঠোঁটের আকার নিয়েছে, কোন কোনটির সামনের দু'টি হাতা অচিরেই ডানায় রূপান্তরিত হবে বলে সহজেই মনে হবে; কোন কোনটার গাত্রবর্ণ রামধনুকেও হার মানায়। কুমীরও আছে। সমুদ্রের তলায় বিচিত্র সব জীব বাস করে। তার বিশেষ কোন খবর

আমরা রাখি না। সেখানকার বিস্ময়কর রাজ্যের অভাবিত ও অকল্পনীয় বৈচিত্র্যের প্রতি এই প্রদর্শনী আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। একটি কুমীরও ছিল এখানে। অনেক অচেনা সামুদ্রিক মাছের সঙ্গে মিষ্টি জলের অনেক চেনা মাছ আছে।

মাথার উপর তখন উত্তপ্ত সূর্য। তবু হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র বেলার দিকে গেলাম। দিগন্ত-প্রসারিত নিস্তরঙ্গ জলরাশি। এ দৃশ্য মনকে পুলকিত করে, দেহে শিহরণ জাগায় ঠিকই, কিন্তু সমুদ্র দেখার সাধ মেটায় না। সফেন ও উত্তাল না হলে সমুদ্র তার স্বমহিমা-ভ্রষ্ট হয়। এখানেই ঠিক করে ফেললাম কোভালম আর যাব না। সময়ও যথেষ্ট ছিল না। বিজয়ন প্রস্তাব করলে—তবে চলুন এরোড্রোম দেখে আসি। বিজয়ন দমদম বিমান বন্দর দেখে নি, সে জানেও না এই বিমান বন্দরের সীমানায় আমরা বাস করি। তবু বাসে উঠবার সময় দেখতে পেলাম ত্রিবান্দ্রম বিমান বন্দর। মৎস্য সংগ্রহশালার বিপরীত দিক্ পর্যন্ত বিস্তৃত বিমান ক্ষেত্রটি এদিক্ থেকে ছন্নছাড়া শ্রীহীন বলেই মনে হয়েছিল।

অন্য একটি রুটের বাস ধরে শহরের মধ্যস্থলে পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরের নিকট ফিরে এলাম। মন্দির খুলতে তখনও ঘণ্টা খানেকেরও বেশি বাকি আছে। আমরা শহরটা ঘুরে ঘুরে দেখে সময় কাটিয়ে দিলাম। একটি খ্রীষ্টান স্কুলের খ্রীষ্টান শিক্ষিকাগণ ছাত্রীদের নিয়ে এসেছেন মন্দির দেখতে। শাদা শাড়ীর উপর এক ধরণের মস্তকাবরণ শিক্ষিকাদের বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। পোশাক দেখে সহজেই চেনা যায় তাদের মিশন ও বৃত্তি। ছাত্রীদের ইউনিফর্ম—সাদা স্কার্ট ও জামা। স্কুলের বাইরে কেরল ও মাদ্রাজের কুমারীরা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা স্কার্ট ও জামা পরেন। একখানা পৃথক বস্ত্রখণ্ড ঊর্ধ্বদেহে শাড়ীর আঁচলের মত করে জড়িয়ে দেন। কিছু কলেজের মেয়েদেরও এই পোশাক দেখেছি। খ্রীষ্টান মিশনারী কলেজ থেকে

হিন্দু মন্দির দেখতে আসাটাই আমার নিকট বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত মনে হয়েছে। খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও ভারতের অতীত শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি এঁরা শ্রদ্ধা হারান নি দেখে আনন্দ হল। এঁরা সেই ইংরেজি প্রবচনটির মর্মার্থ অনুধাবন করেছেন—**A nation which forgets its past has no future.**

এ মন্দিরেও উর্ধ্বদেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত করেই ঢুকতে হয়। যে ভদ্রলোক নগদ দক্ষিণার বিনিময়ে জামা জমা রাখেন তিনি বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন, টাকা পয়সা সঙ্গে রাখবেন। অন্যান্য মন্দিরে জামা খুলে হাতে নিয়ে ঢুকেছি। এখানে সে পদ্ধতি অচল। মন্দিরে নানা প্রণামী দেবার জন্য টাকা পয়সার দরকার হয়। আর টাকা পয়সা জামা কাপড়ের সঙ্গে রেখে যাওয়া নিরাপদও নয়।

মূল মন্দির ঘিরে গণেশ, শ্রীকৃষ্ণ, রামলক্ষ্মণ সীতা ইত্যাদি দেবদেবীর বহু ছোট বড় মাঝারি ধরণের মন্দির উঠেছে। নাটমণ্ডপ ইত্যাদিও যথারীতি আছে। এ মন্দিরে সর্বাধিক দৃষ্ট হয় দীপলক্ষ্মী ও প্রদীপের বাহুল্য! নারকেলের তেল দিয়ে প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়। প্রত্যহই জ্বলে, তবে উৎসবের দিনে নাকি লক্ষাধিক দীপ জ্বলে। ছোট ছোট বিজলি আলোর বাল্‌ব্‌ এখন অধিকাংশ প্রদীপের স্থান নিয়েছে। একটি মন্দিরের সমগ্র দেওয়ালটিতে ছোট ছোট অসংখ্য প্রদীপ বসানো। পশ্চিম দরজায় রয়েছে দু'টি সুদৃশ্য দীপস্তম্ভ।

মূল মন্দিরে অনন্ত শয়নে শ্রীবিষ্ণু। মহাপ্রলয়ের পর বিশ্বসংসার প্রলয় সাগরে ডুবে গেলে শ্রীবিষ্ণু সেই সাগর জলে অনন্তনাগ শয্যা গ্রহণ করেন। বিশাল মূর্তি। দক্ষিণে ঈষৎ কাত হয়ে পদযুগল ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সর্পাসনে যোগনিদ্রা মগ্ন হয়ে আছেন ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। মূর্তি এতই বড় যে একটি দরজা দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ দর্শন পাওয়া যায় না। ডান দিক্‌কার দরজা দিয়ে শ্রীপদ, মধ্য দরজায় নাভিমণ্ডল এবং বাম দরজার মস্তক ও মুখমণ্ডল দর্শন করতে হয়। নাভি

ভেদ করে উঠেছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। তার উপরে বসে আছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাণ্ডপুরানোক্ত বহু দেবদেবী ঘিরে আছেন এই শ্রীমূর্তি। বাহির-দেওয়ালেও এইসব চিত্র।

বিষ্ণু প্রণাম মন্ত্রের মতই এখানে বিগ্রহ—

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্।।

শুধু দেবতা নন, সামনের দিকে দুই প্রান্তে দু'জন মুনিও রয়েছেন। এর তাৎপর্য আমাদের জানা নেই। তবে শ্রীশ্রীচণ্ডী থেকে জানা যায় এই সময় শ্রীবিষ্ণুর কানের মল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই অসুর জন্মগ্রহণ করে। তারা সামনে পদ্মাসনে ব্রহ্মাকে দেখেই তাঁকে মারতে উদ্যত হয়। বিষ্ণু থেকে যারা জন্মলাভ করেছে বিষ্ণু ছাড়া আর তো কেউ তাদের মারতে সমর্থ নয়। ব্রহ্মা তখন স্তব-স্তুতি করে যোগমায়াকে সন্তুষ্ট করলে নিদ্রারূপিণী ভগবতী দেবী শ্রীবিষ্ণুর নাক মুখ চোখ বুক থেকে বেরিয়ে এলেন। বিষ্ণু জেগে উঠেই অসুরদ্বয়ের সঙ্গে শুধু হাতে সংগ্রাম শুরু করলেন। সে যুদ্ধ চলেছিল পাঁচ হাজার বছর ধরে।

পাঁচ হাজার বছর পরে অসুররা শ্রীবিষ্ণুর যুদ্ধের প্রশংসা করে বলল—তুমি চমৎকার যুদ্ধ করেছ, এবার আমাদের কাছে বর চাও। বিষ্ণু বললেন—আমার হাতে তোমরা মর—এই বর দাও। অসুররা প্রমাদ গুণল। পালাবার পথ নেই। চারদিকে জল আর জল ছাড়া কিছু নেই। তারা আত্মরক্ষার শেষ পথ হিসাবে খুব বুদ্ধি করে বলল—আমরা তোমার হাতে মরতে পারি কিন্তু জল ছাড়া অন্য কোন জায়গায় মারতে হবে।

বিষ্ণু অসুরদের ধরে নিজের উরুর পর রেখে হত্যা করেছিলেন।

এই ভাবে অসুরদ্বয় তাদের হঠকারিতার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। এ যুদ্ধে কে জিতেছিলেন তাতে আমার সংশয় আছে। বিষ্ণু বা ভগবতী উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর আরাধ্য তাও বিতর্কিত হয়ে উঠেছে। এই সব অর্ধজানা কথা ভাবতে ভাবতে মন্দির ছেড়ে এলাম। সামনে পড়ল সারা দেহে মাখনলিপ্ত একটি বিরাট হনুমান। মাখন এখানে সুলভ বলেই বোধ হয় বেশ পুরু করেই লাগানো—আর গন্ধটা মাখনেরই, চর্বির নয়, পদ্মনাভ স্বামীর প্রভাব এ দেশে খুব। এই রাজ্যের রাজা নিজেকে 'পদ্মনাভদাস' অর্থাৎ পদ্মনাভের চাকর বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন।

পদ্মনাভ মন্দির থেকে স্টেশনে যাবার পথে একটি নতুন গণেশ মন্দির পড়ে। দেওয়ালীর ঠিক পূর্বেই আমরা গিয়েছিলাম। এখানে তখন উৎসব শুরু হয়েছে। গণপতি মন্দিরে নারকেল উৎসর্গ করা এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ।—মন্দিরের সামনে পাথরের একটা চৌবাচ্চা এমন করে তৈরি করা হয়েছে যে, একটি ঝুনো নারকেল একটু জোরে তার গায়ে ছুঁড়ে মারলেই ফেটে দু-তিন খণ্ড হয়ে যায়। লোক আসছে আর দু', চার, পাঁচ, দশটা নারকেল দমাদম ফাটাচ্ছে। একজন মজুর শ্রেণীর লোক পূজার্থীকে এক আধফালি নারকেল প্রসাদ হিসেবে দিচ্ছেন। অবশিষ্টাংশ বস্তাবন্দী করছেন। চার-পাঁচ বস্তা ভাঙ্গা নারকেল তার ভাণ্ডারে জমা দেখলাম।

আমরা যেমন পাঁঠাবলি মানত করি, এদেরও তেমনি নারকেল মানত। উপচারের ভিন্নতা ঘটেছে নানা কারণে—কিন্তু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম গোটা ভারতবর্ষের মানসিকতা যে এক তাতে আর সন্দেহ কি!

আমরা আসার পথে একটি সুদৃশ্য মসজিদ দেখেছি। এই রাজ্যে মুসলীম লীগের খুব বাড়-বাড়ন্ত ; কেরলের শিক্ষা মন্ত্রীই ঐ দলের। আমরা ওখানে থাকতে থাকতে এই ভদ্রলোক বিধান সভায় একটি

ভাল কথা বলেছিলেন। 'কথাকলি' নাচের স্কুল খোলা নিয়ে আলোচনা হতে হতে ছাত্র অশান্তির কথা ওঠে। জনৈক সদস্য অভিযোগ করেন, ছাত্ররা আজকাল প্ররোচনা-মূলক ধ্বনি তুলছে। এর প্রতিবাদ করে মন্ত্রী মশায় বলেছিলেন, ছাত্রদের ধ্বনি শিক্ষকদের ধ্বনি থেকে অধিকতর প্ররোচনা-মূলক নয়। এতবড় সত্য কথা আজকাল কেউ বলতে সাহস করেন না।

শিক্ষা নিয়ে কেরলে বড় একটা তোলপাড় হয়ে গেল। মিশনারী কলেজগুলির সঙ্গে সরকারের নীতির বিরোধ ঘটেছিল। তার ফলে কলেজগুলি অনেকদিন বন্ধ থাকে। এখন একটা মিটমাট হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যের শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন নানান গোলমাল। নানা রকম শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য যেমন এই গোলমাল, তেমনি বিশৃঙ্খলা ঘটে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনবার অপপ্রায়াসে। বিনোবাজি বলেছেন—বিচার বিভাগের মত শিক্ষাকেও সরকারী অর্থপুষ্ট করতে হবে কিন্তু সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, এই রকম ব্যবস্থায় শরীরশ্রমভিত্তিক শিক্ষাই একমাত্র সার্থক শিক্ষা। কেরল শিক্ষায় অগ্রগণ্য রাজ্য বলে এর শুভারম্ভ এখান থেকে হতে পারে।

আসবার পথে আমরা দূর থেকে আর একটি উৎসব দেখেছিলাম। সেখানে সুসজ্জিত একাধিক হাতিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে অভ্যর্থনার জন্য। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, সব গণ্যমান্য অতিথিরা আসবেন। মহারাজার জন্মদিন উপলক্ষে রাজবাড়ি থেকে জনগণকে প্রদত্ত উপহার চিত্তিরা তিরুনাল মেডিকেল সেণ্টারের উদ্বোধন হচ্ছে বলে শুনলাম। এপ্রিল মে মাসে পুরম উৎসবে সুসজ্জিত হাতির মাথায় ঝলমলে ছাতা চড়ান হয়। লক্ষ লক্ষ লোক এই উৎসবে যোগদান করে। তারই একটু আঁচ্ পাওয়া গেল এই হাতিগুলি দেখে। আরও একটি জিনিস আমাদের চোখে অদ্ভুত ঠেকেছিল। পুকুরে মত স্টেডিয়াম। শহরটি অনুচ্চ পাহাড়ের উপর। তাই জল জমে না

কোথায়ও। পুকুরের মত করে কেটে নিয়ে তলাটা খেলার মাঠ আর পাড়গুলিতে আসন বসিয়ে গ্যালারি করা।

কেরলে এসে সকলেই একবার থুম্বার রকেট কেন্দ্র দেখতে যান। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ওর কিছুই বুঝি না আমরা। কয়েকটি বাড়িঘর ও যন্ত্রপাতি দেখতে যাবার কোন প্রেরণা পাই নি। এখানেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী বিক্রম সরাভাই পেস্ সেণ্টারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এর্ণাকুলাম কোচিন

ত্রিবান্দ্রম থেকে রাত ন'টার এর্ণাকুলাম প্যাসেঞ্জার ধরে কোচিন যাত্রা করলাম। এর্ণাকুলাম এ গাড়ি বদল করতে হয়। ভোরে আমরা এর্ণাকুলাম পৌছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে মালাবার এক্সপ্রেস পাওয়া গেল। দু'টার মধ্যে আমরা স্বপ্নরাজ্য কোচিন-এ পৌছে গেলাম। কেরল রাজ্যটাই শুধু স্বপ্নমোহাচ্ছন্ন করে না, এর জায়গার নামগুলিই আমার বেশ রোমান্টিক মনে হয়।

কোচিন স্টেশনের পাশেই মারুতি হোটেল। পশ্চিমী কায়দায় সাজানো। কার্পেট বিছানো লাউঞ্জ। ঘরে ঘরে ফোন। এলাহি কাণ্ড। দক্ষিণা যে বেশি হবে তা ধরেই নিয়েছিল। দশ পনের টাকা যাই হোক্ একটা ঘর নিয়ে একটু চান করে নেব আর মালপত্র রেখে ঘুরে বেড়াব। রাত্রিবাসের ঝামেলা নেই। কিন্তু হোটেলওয়ালা এক ঘরে তিন জনকে থাকাতে দিতে নারাজ। সেজন্য জনপ্রতি আরও চারটাকা দাবি করল। আমরা একেবারে বিনা বাক্যব্যয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে স্টেশনে ফিরে এসে মাল জমা দিলাম রেল কোম্পানির লেফট লগেজে। তারপর একটু বে-আইনী করে বিশ্রামগারে স্নান ও শৌচ-

ক্রিয়া সেরে নিলাম। অতঃপর যথারীতি কফি ও বড়া খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম—কোচিনকে আবিষ্কার করতে।

রেলগাড়ি শেষ হয়েছে কোচিন বন্দরে। এটা একটি দ্বীপ। কোচিন বন্দর তৈরি করার সময় সমুদ্রগর্ভ থেকে যে মাটি খুঁড়ে তোলা হয়েছিল সেটা জমিয়ে এই সুন্দর দ্বীপটি তৈরি করা হয়েছে। নাম উইলিংডন আইল্যাণ্ড। এক পারে কোচিন শহর, অপর পারে এর্ণা-কুলাম। সব মিলিয়ে আরব সাগরের রাণী নামে খ্যাত এই কোচিন।

আমরা প্রথমে বন্দরের দপ্তরে খোঁজখবর নিলাম। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট দপ্তরে। এরা উভয়েই খুব সৌজন্য সহকারে আমাদের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন। ঘণ্টায় পঁচিশ টাকা করে দিলে ব্যাকওয়াটারে মোটর বোট করে ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। দিশি নৌকা আমাদের পছন্দ নয়। তাই ঠিক করলাম কোচিন শহরে তো যাই—তারপর একটা কিছু করা যাবে।

ছায়াঘন ট্যুরিস্ট আপিস প্রাঙ্গণ থেকে ঘাট দেখা যায়। মাঝিরা যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে শুনতে পাচ্ছি। আমরাও সেদিকে পা বাড়ালাম। হঠাৎ একটি মোটাসোটা গোবেচারি গোছের লোক আড়াল থেকে কোঁচার কাপড়টা ঈষৎ সরিয়ে একটা মদের বোতল এক ঝলক আমাদের দেখিয়ে আবার ঢেকে ফেলল। এ টেকনিক আমাদের অজানা নয়। চৌরঙ্গী পাড়ায়, গড়ের মাঠে এ ত নিত্যকারের ব্যাপার। বন্দর শহরে বিদেশী দ্রব্যাদির ফলাও কারবার চলে। আমরা উপেক্ষা করেই এগিয়ে গেলাম। দশ পয়সা মাত্র দিয়ে বেশ বড়সড় খাঁড়ি পার হয়ে কোচিন শহরে যাই। একখানা ছোট বোট, একটি মাত্র মাঝি, দাঁড় কিন্তু দুখানা। সে একাই দুহাতে দুখানা দাঁড় চালায়। জল শান্ত। নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়।

কোচিন শহরের সমুদ্রের এই দিকটা জনবিরল বলে মনে হল। অথচ স্থানটি ব্যবসায় বাণিজ্য কেন্দ্র, পাইকারী ও চালানী কারবারের প্রধান

বেশি। কোচিন ভারতের অন্যতম বৃহৎ বন্দর। খানিকটা এলোমেলো ঘোরাফেরা করলাম পায়ে হেঁটেই। কোথায় সিনাগগ, কোথায় বা ডাচ প্রাসাদ কে জানে, দেখিয়ে দেবার লোক হল না। জলবিহার আমাদের আকুল করে রেখেছে। অন্য কিছুতে মন টানছে না। যেতে যেতে একটা বড় গোছের হোটেল পেলাম—শ্রীকৃষ্ণ হোটেল। এখানেই কিছু খেয়ে নেওয়া গেল। বাইরে যতটা চমক খাবার ততটাই জঘন্য। মিষ্টি চাইতে এনে দিল পাকা কলা সেদ্ধ! ভূ-ভারতে আর কোথায়ও এই বিচিত্র খাদ্যের নাম শুনি নি। মুখে তোলা গেল না। সব জিনিসের দামও আকাশ ছোঁয়া। একটা কে কাকোলার দাম নিল পঁচাত্তর পয়সা। বিদেশী পেয়ে ঠকিয়ে নিল বলেই ধারণা হল।

এখানকার যাত্রীবাহী মোটর লঞ্চ চালান রাজ্য নদী পরিবহন কর্পোরেশন। তুলনামূলক ভাবে ভাড়া খুবই সস্তা, পনের পয়সা ভাড়ায় কোচিন থেকে এর্ণাকুলাম যাওয়া যায়। রেলের ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা। দুই চার মিনিট অন্তর অন্তর মোটর লঞ্চ যাত্রী নিয়ে নানা দিকে যাচ্ছে। মহিলা যাত্রীর সংখ্যা পুরুষের সমান না হলেও বেশ চোখে পড়ার মতই বেশি। বাংলার পুরুষেরা যেমন জাতীয় পোশাক ধুতি অথবা বিদেশী পোশাক প্যান্ট পরেন এখানেও তেমনি পুরুষের পোশাক প্যান্ট বুশ সার্ট অথবা লুঙ্গি-জামা কিন্তু আধুনিকারা আঞ্চলিক পোশাক বর্জন করে শাড়ী ধরেছেন প্রায় সবাই। কথা না বলা পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোঝাই যায় না কে কেরলী আর কে বাঙালী। গ্রামের নারীদের পোশাক অবশ্য ভিন্নতর। সেই লুঙ্গির উপর ব্লাউজের মত একটি জামা মাত্র। দেখতে যে খারাপ তা নয়।

ত্রিবান্দ্রমের চেয়েও এখানকার মানুষদের আরো ভাল লেগেছিল। সে হয়ত পরিবেশিক প্রভাবে। তবে একথা ঠিক যে এরা অনেক বেশি ধীর এবং নম্র, কিন্তু তার মধ্যে দুর্বলতা বা দ্বিধার অবকাশ নেই। দক্ষিণের বহু মানুষকে খুবই স্পর্শকাতর মনে হয়েছে। সচেতন

ভাবে নিজেদের অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে একটা অমার্জিত স্থূল আ রণ প্রকট হয়ে পড়ে। এ দেশে সেটা অনুভবগ্রাহ্য-রূপেই অনুপস্থিত।

কোন উপায় না পেয়ে আমরা সরকারী পরিবহনের লঞ্চে একাধিক-বার এর্ণাকুলাম' কোচিন, কোচিন বন্দর ঘোরাঘুরি করলাম। শান্ত জল। এই হল কেরলের বহুখ্যাত অপূর্ব সুন্দর ব্যাকওয়াটার। লঞ্চগুলি ঘাটে ঘাটে থামছে। যাত্রীদের ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি চিৎকার যেমন নেই, তেমনি নেই লঞ্চ-ওয়ালাদের লগী ঠেলাঠেলি হাঁক ডাক। লোকাল ট্রেনের মত মিনিট খানেকের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে। জাহাজ চলছে, বড় বড় জাহাজ। নোঙর করা জাহাজের বিদেশী নাবিকেরা যেন স্বর্গে দাঁড়িয়ে নিচের নৌকার বিক্রেতা রমণীর সঙ্গে দরদস্তুর করছেন, দামে পটলে মাল পছন্দ হলে পয়সাসহ দড়ির ঝাঁপি নামিয়ে দিচ্ছেন—দোকানী পয়সা রেখে জিনিস তুলে দিচ্ছে তার ঝাঁপিতে।

একটা মোটর লঞ্চ চার পাঁচটা বোঝাই নৌকা টানতে টানতে নিয়ে গেল। এমন কত সাধারণ দৃশ্য এই প্রকৃতির পটভূমিকায় আনন্দময় মনে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে আমরা নতুন যে দ্বীপ গড়ে তোলা হচ্ছে তার কাছে এসে পড়েছি। জল সেখানে একান্তই অগভীর। হাঁটাচলা করছে সবাই জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে। চাটাইয়ের বিধিনিষেধ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ভুল করে যানবাহন চড়ায় গিয়ে না ঠেকে। রাত্রে আলোর ব্যবস্থা আছে, তা ঐ লাল মুখো খুঁটিগুলো থেকেই বুঝা গেল। পোলোর মত এক রকম গোল জাল দিয়ে মাছ ধরছে অনেকে। এগুলিকে বলে চীনা জাল। এক ফালি গুঁড়ির মধ্যখানটা খুঁড়ে ফেলে দিলে যা দাঁড়ায় তেমনি সব ডিঙ্গি নৌকো অনেক। গাছপালা প্রকৃতির কথা বলবার নয়, দেখবার। সুন্দর।

খুব একটা গাঁয়ে গঞ্জের মধ্যে যেতে পারি নি। কেরলী গ্রামের

মোহমায়াজালের কথা শুনেছি অনেক। যতটুকু দেখেছি তাতে শোনা কথায় বিশ্বাস হয়েছে।

দক্ষিণীরা গয়না পরেন কম বলে শুনতাম। কিন্তু মাদ্রাজে মাদুরায় কম কিছু চোখে পড়ে নি। রামেশ্বরে গয়নার ভারে কান ছিড়ে পড়ছে, খাস ত্রিবান্দ্রমেও নিরাভরণা নারী দেখিনি। এখানে একাধিক জনকে দেখলাম কোন রকম গয়নার বালাই নেই। তাঁরা সধবাই হোন আর বিধবাই হোন, এ বয়সে খ্রীষ্টান হলেও কিছু গয়না থাকা বেমানান হত না। গয়না এ দেশে মর্যাদার মানদণ্ড হয়ে ওঠেনি বলেই মনে হল।

সব দেশের মত এখানে নিত্য নানা উৎসব লেগে আছে বলা চলে। জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন সামাজিক উৎসবে ধর্মের ভিন্নতা যোগদানের বাধা বলে বিবেচিত হয় না। অন্যতম প্রধান সর্বজনীন উৎসব নাকি নৌকা বাইচ, ছিপ নৌকার বাইচ—। ষাট বৈঠা, শত বৈঠার নৌকাকে এরা কি বলে তা আমাদের মাঝি বলতে পারেন নি—অর্থাৎ আমরা তাকে আমাদের প্রশ্নটা বোঝাতে পারি নি। জনৈক ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ স্থানীয় ব্যক্তিকেও বোঝাতে সমর্থ হইনি। বাচের নৌকা আর রেসিং বোট তাদের কাছে এক। বৈঠা আর দাঁড় দুটোকেই তরজমা করি 'ওর' বলে। যত বিশেষণই লাগাই 'ষাট বৈঠা ছিপের' ইংরেজি হয় না, কথা দিয়ে ওর ধারণা দেওয়া যায় না। এসে দেখতে হয় তবে বোঝা যায়। কেরলে এই ব্যাকওয়াটার আর আমাদের দেশে বর্ষায় প্লাবিত বিলগুলির সঙ্গে গভীর সাদৃশ্য আছে।

প্রমত্তা পদ্মা দেখেছি, দেখেছি মেঘনার ভয়ঙ্কর রূপ, শান্ত শীতলক্ষা বা পুণ্য সলিলা গঙ্গারও নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। ওদের কারও সঙ্গেই এখানকার জল পথের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। মানুষকে ঐ নদীগুলির মর্জিমাফিক চলতে হয়। যেমন খুশি যখন খুশি ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু কেরলের এই ব্যাকওয়াটার নিয়ে তেমন কোন সমস্যা নেই। যখন

ইচ্ছে খুশি মত সকলেই সব কাজে লাগাতে পারেন। একেবারে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও ডিঙ্গি চালিয়ে চলছে নির্ভয়ে।

এক সময় আমাদের যাত্রা শেষ হল। আমরা স্টেশনে ফিরে এলাম। আজই কোচিন ছেড়ে যাব। কিন্তু হায় আমাদের গাড়ি বাতিল। কয়লার অভাবে গাড়ি হ্রাস করেছেন কর্তৃপক্ষ। ভ্রমণ সূচীতে গোল মাল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিকার যার হাতে নেই তা হাসিমুখে সহ্য করতে না পারলে যন্ত্রণা বাড়ে। এখান থেকে আমরা ট্রেনে কোয়েম্বাটুর যাব। সেখান থেকে বাসে করে মহীশূর। পুরানো এই ভ্রমণ-সূচীই আঁকড়ে রইলাম আমরা।

কোচিন বন্দর থেকে কোয়াম্বাটুর শ দেড়েক কিলোমিটার পথ। পথের দুধারে সেই ঘন সবুজ নারকেল সুপারীর কুঞ্জ, আর কফি ও ধান ক্ষেত। তার মধ্যে ছোট ছোট বাড়িগুলি পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পটভূমিকায় আঁকাশ ও পৃথিবীর ফ্রেমে আঁটা একখানা নিটোল সুন্দর ছবি। গোলমরিচ লতা এর আগে দেখি নি। কফি গাছ আমাদের দেশের ভেরেণ্ডা ঝোপের মত কতকটা। স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে দিলে আট-দশ ফুট বড় হয়। কিন্তু বাণিজ্যিক চাষের জন্য গাছগুলিকে ফুট চারেকের বেশী বাড়তে দেওয়া হয় না। কথিত আছে জনৈক মুসলমান ফকির মক্কা থেকে কফি বীজ এনে ম্যাঙ্গালোরে পশ্চিম ঘাট পর্বতের সানুদেশে প্রথম চাষ করান। সেখান থেকে মাদ্রাজ ও কেরলে এই চাষ ব্যাপ্ত হয়েছে। এর বাণিজ্যিক সাফল্য যেমন একে জনপ্রিয় করেছে তেমনি আদর বাড়িয়েছে সর্বজনীন ব্যবহারে। কফি দক্ষিণ ভারতের অপরিহার্য পানীয়। চা এখানে অচল। ঘরে ঘরে কফির চাষ হয়। নিজেরাই ফলটা গুঁড়িয়ে ঘরেই কফি করে নেন। বাজারে কেনা নামী দামী কফির চেয়ে এগুলির স্বাদ ভাল, তাই কদরও বেশি।

গোলমরিচ তো সোনার দামে বিকোয়। পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট পাট স্বর্ণতন্তু নামে যে কারণে খ্যাত হয়েছে, ঠিক সেই একই কারণে

কেরলে গোলমরিচ কালো সোনা বলে অখ্যাত হয়। বনজ সম্পদ অর্থাৎ কাঠও কেরলে কম নেই। চেঙ্গা স্টেশনে গাড়িতে বসেই একটি কাঠের বড় কারখানা দেখা যায়। একাধিক হাতি সেখানে শুঁড়ে করে বড় বড় গুঁড়িগুলি সরিয়ে নিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। কারখানাটি সরকার পরিচালিত।

কেরল এত সুন্দর বলেই বোধ করি ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ভাইকমে ঐতিহাসিক সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলেন। যেখানেই যাই সে দেশ ছেড়ে আসতে দুঃখ হয়। কিন্তু কেরল ছাড়তে মনটা যেন একটু বেশি বিষণ্ণ হল। কতটুকুই বা দেখলাম। অবশ্য-দর্শনীয় অনেক জায়গা আমরা সময় ও অর্থাভাবে ছেড়ে দিয়েছি। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশে বন্য প্রাণীর মেলা থেকাডির পেরিয়ারে যেমন, এমনটি নাকি আর কোথাও নেই। ত্রিবান্দ্রাম থেকে ২৫৮ কিলোমিটার—যাওয়াই প্রশস্ত। শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কাল্‌াডি যেতে না পারার দুঃখ ভুলব না কোনদিন। এর্ণাকুলাম থেকে বাসে মাত্র ৫২ কিলোমিটার পথ তবুও ব্যবস্থা করতে পারি নি। নৈসর্গিক সৌন্দর্য দর্শনের জন্য সৌন্দর্য পিপাসুগণ কুইলনকে কখন বাদ দেন না। এর্ণাকুলাম থেকে নৌকা করে যাওয়া যায়। কিন্তু অনেকটা দূর—১৪৮ কিলোমিটার। ত্রিবান্দ্রম থেকে বাসে যাওয়াই প্রশস্ত—মাত্র ৭০ কিলোমিটার।

কোচিন থেকে অশোক সোজা বাঙ্গলোর চলে গেলেন। আমরা নেমে পড়লাম কোয়েম্বাটুরে। উটি যাত্রীদের এখানে নামতে হয়। আমরা উটির যাব না। মহীশূর যাব বলে এইখানে নামলাম। যাঁরা সরাসরি বাঙ্গোলোর চলে গেলেন তাঁরা বাঙ্গোলোর থেকে মহীশূর আসবেন। আবার ফিরতে হবে সেই বাঙ্গালোর হয়েই। আমাদের এক পথ দু'বার মাড়াতে হবে না।

রেলস্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

ভোর ছ'টায় বাস ছাড়বে। বাস স্টেশনটি বেশ খানিকটা দূরে। মোট ছ'ঘণ্টা লাগবে পৌঁছাতে। ভাড়া ৭ টাকা ৩০ পয়সা। আমরা পাঁচটার মধ্যে স্নানাদি সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

বাস স্টেশনটিতে এলাহি ব্যাপার। এদেশে বাস যেন রেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে। বাসের রুট চার্ট বিক্রী হয়। যাত্রীদের রিটায়ারিং রুম আছে। আগাম টিকিট বিক্রী ও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। হাজার মাইলের পাল্লায়ও বাস যাত্রী বহন করে—বাঙ্গালোর থেকে বোম্বাই। ভোর পাঁচটা। তখনও দিনের আলো ফোটেনি। এরই মধ্যে যাত্রীর ভিড়ে বাস স্টেশন ভর্তি। বাঙ্গালোরের দুখানা মাত্র বাস। সকাল ৬টা ও বিকেল তিনটে। যাত্রীর ভিড় দেখে স্থান সংকুলান হবে কি না—এই ভাবনায় ব্যাস্ত হয়ে পড়লাম। মালপত্র নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে বাসে ওঠা কষ্ট। তাই প্লান ঠিক করে নিলাম। বাস এলে দুজনে গিয়ে তিনটে সিট দখল করে বসব, আর একজন মালের ব্যবস্থা করব। মাত্র মিনিট দশেক আগে বাসটি এসে দাঁড়ল। প্ল্যান মাফিক কাজ করে কোন রকমে বসবার জায়গা পেয়েছিলাম।

মহীশূর

কোয়েম্বাটুর থেকে মহীশূর আসবার রাজপথের সর্বত্র রাজকীয় ব্যাপার। সে পথ জীবনে ভুলবার নয়। যাত্রারম্ভের পর প্রথম বাস থামল ভানারিতে। ছোটখাটো গঞ্জ মত জায়গা। একটি সাধারণ গ্রাম্য মন্দিরের নিকট বাস ঘুমটি। কনডাকটর আমাদের ভ্রমণ পরিচালকের কাজ করলেন। বাস থামতেই তিনি জানিয়ে দিলেন এই মন্দিরে দক্ষিণা কালিকা বিগ্রহ নিত্য পূজিতা হন। দিনটা ছিল কালীপূজার। স্বভাবতই আমরা আগ্রহী হলাম। কিন্তু যে মাতৃ মূর্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত এখানে তার দর্শন পাওয়া গেল না। শান্ত-

উপবিষ্ট মূর্তি। যাই হোক, কালীপূজার দিন মা'কে প্রণাম করার এই অভাবিত সুযোগে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলাম! থিনেগোর-ঘাট নামক একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মাথা টপকে মহীশূরে যেতে হয়। পাহাড় ছোট বলে উপেক্ষার কোন ব্যাপার নয়। পায়ে হেঁটে ও পাহাড় ডিঙানো আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। পাকদণ্ডীর মতো ঘুরে ঘুরে পথটি ২৭ টি পাক খেয়ে চূড়ায় উঠেছে। এই রকম পথে নিরাপদ যন্ত্রযানে বসে পাক খেতে খেতে ক্রমাগত ওপরে ওঠার অভিজ্ঞতা যে ইতিপূর্বে অল্পবিস্তর না হয়েছে তা নয়। তবু এ পথ অনন্য। কেননা বান্দীপুরের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ভেদ করে চলেছে পথ। বুনো হাতি, সজারু, কৃষ্ণসার মৃগ, সম্বর, বাসে বসেই দেখা যায়। বনের অভ্যন্তরে দূরে যাবারও পথ আছে। বন বিভাগ থেকে নামমাত্র খরচায় জীপ গাড়ি ভাড়া মেলে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার জন্য। হাতি চড়ে জঙ্গল দেখবেন তো চলে যান নীলগিরির মাতুমালাই-এ।

পাহাড় আর বনভূমির পথে পথে ছড়ানো চন্দন গাছ। মহীশূরের চন্দনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ভূগোলে পড়া বিদ্যাটা আমরা মধ্যে মধ্যে ঝালাই কার নিতাম মাইসোর সোপ ফ্যাকটরির গোল্ডেন স্যাণ্ডাল সোপ দিয়ে স্নান করে। এখানে বাসে বসেই আমরা চন্দন গন্ধমাখা বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিলাম। চেনা-অচেনা গাছ গাছালি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পথ। প্রায় গোটা পথটার দুপাশে অজস্র বনফুলের বর্ণাঢ্য সমারোহ। মাইলের পর মাইল বিচিত্র বর্ণের পুষ্পিত ঝোপ।

এত দীর্ঘ পথ একটানা বাসে ইতিপূর্বে কখনো চড়তে হয়নি। রেলের তুলনায় বাসে ভ্রমণ অবশ্যই একটু ক্লেশকর হয়। কিন্তু এতটা পথ এসেও আমরা কোন ক্লান্তি বোধ করি নি। রাজ্যসীমান্তে একদল শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারী তদন্ত করলেন। রুট পারমিট সংক্রান্ত গোলমালের জন্য আমাদের বাস বদল করতে হল। বাস কর্তৃপক্ষ

নিজেদের মজুর দিয়েই মালপত্র ওঠানো-নামানো করিয়ে দিলেন। যাত্রীদের কোন ঝামেলাই পোহাতে হল না।

মহীশূর পৌঁছোবার খানিকটা আগে বাস থেমেছিল নাঞ্জনগুড-এ। এখানে একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। দর্শনার্থী সাধারণত মহীশূর থেকেই আসেন। যে দিন আসেন সেই দিনই ফিরে যান। আমরা এখানে সুন্দর ডাব পেয়েছিলাম।

নির্দিষ্ট সময়েই আমরা মহীশূরে পৌঁছেছিলাম। শহরের কেন্দ্রস্থলেই বাস স্টেশন। দেওয়ালীর দিন দুপুরে আমরা পৌঁছাই। শহরে পা দিয়েই অনুভব করা গেল উৎসব আর ছুটির আমেজ। দশেরা উৎসবের রেশ থাকতে থাকতেই আসে দেওয়ালী। এবার দেওয়ালীর পরেই পড়েছে ঈদ। ফলে উৎসবের বহরটা একটু যে বেশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত না থাকলে কোন উৎসবই মনোরম হয়ে ওঠে না। আমাদের সাধ্যের মধ্যে যে-সব হোটেল পাওয়া গেল সবই নিরামিষ। তারই একটিতে আশ্রয় নিলাম। এখানেও সেই থাকা-খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা। কিন্তু সবই কাছাকাছি মেলে বলে বিশেষ অসুবিধা হয় না। দক্ষিণী খাবার, তবে স্বাদ পৃথক। এগুলি অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য ও স্বাদু। সুধীরদার মত অবশ্য ভিন্ন। তিনি বলেন—আসলে ঠিক আছে। সপ্তাহ তিনেক ধরে এই সব খেতে খেতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি বলেই গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে।

দুপুরে আর কোথায়ও বেরোনো হল না। কাছে পিঠে একটু ঘোরাঘুরি করে খোঁজ-খবর নিয়েই কাটিয়ে দিলাম বিকালটা। মহীশূর শহর ও আশপাশের দর্শনীয় জায়গাগুলি, যেমন চামুণ্ডি পাহাড় ও মন্দির, শ্রীরঙ্গ পাটনা, কাবেরী সঙ্গম, কৃষ্ণরাজ সাগর, বৃন্দাবন গার্ডেন ইত্যাদি দেখানোর জন্ম যাত্রীবাহী ডি-ল্যুকস বাস পাওয়া গেল। দুই ক্ষেপে দেখানোর ব্যবস্থা। শহরের মধ্যে ও আশেপাশে সকাল ৮টা থেকে ১২টা,

শহরগুলিতে বেলা দুটো থেকে রাত আটটা। ভাড়া জনপ্রতি ১২ টাকা। আমাদের হোটেল কর্তৃপক্ষেরও একটা বাস রোজ বেরোয়। সেই বাসের টিকিট কিনে ফিরে এলাম সন্ধ্যার আগেই। আজ রাতে কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচী নেই। পায়ে হেঁটে শহর দেখাই ঠিক হল। দশেরা উৎসবের মুখ্য অংশ শেষ হলেও তার রেশ রয়েছে। আলোর রোশনাই, প্রদর্শনী, গান-বাজনা, অভিনয়ের আসর তখনও জমজমাট। তার উপর আজ জুটেছে দেওয়ালীর বাজি। সে কি গগনভেদী শব্দ। এরই মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে একটা আলোঝলমল প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে এসে গেলাম।

দশেরা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এখানে প্রদর্শনীর আয়োজন হয় বলে জায়গাটির নাম হয়েছে একজিবিশন গ্রাউণ্ড। প্রবেশমূল্য পঞ্চাশ পয়সা। আজকাল পাঁচটা প্রদর্শনী যেমন হয়, এটিও তেমনি, কোন বিশেষত্ব নেই। প্রদর্শনীর দুটো মণ্ডপ আমার বেশ ভাল লেগেছিল। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী মণ্ডপটির পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা করেছেন ভারত সরকারের প্রচার দপ্তর। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশ গঠনের মহাযজ্ঞের কথা ফটো ছবি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরিকল্পনা যিনি করেছেন তাঁর পক্ষে কাজটা স্বভাবতই কঠিন ছিল। পর্বত প্রমাণ ঘটনাস্তূপ থেকে কয়েকটি মাত্র বেছে নিতে হবে, আবার তারই মধ্যে সংগ্রাম ও সংগঠনের একটা সামগ্রিক ধারণা তুলে ধরতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, সিপাহী যুদ্ধেরসামরিক অভ্যুত্থান থেকে শুরু করে বিয়াল্লিশের গণসংগ্রাম পর্যন্ত প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত। এর মধ্যে একদিকে রয়েছে অহিংস সত্যাগ্রহের উজ্জ্বল ও আনন্দময় বিকাশ, অন্যদিকে ভাস্বর হয়ে আছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী-গত সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রচলিত ভাষায় সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত। তার সমান্ত-রালে চলেছে গান্ধীজির আঠার দফা কর্মসূচী, ও স্বদেশী আন্দোলন। কয়েকখানা ছবি দিয়ে এই বিরাট আন্দোলন তুলে ধরা

সহজ কথা নয়। তবু বলতে হবে দারুণ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রদর্শনীটি সার্থক হয়েছে। স্বাধীন ভারতে দেশ গড়ার ক্ষেত্রটিও বিশাল। শিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তি কেবল বড় বড় কলকারখানায় মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। শ্রমিক পিতা ও আই. এ. এস পুত্রের যুগল ছবি বা হাঁটু অবধি বস্ত্রাবৃত আদিবাসী ঠাকুরমা এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা তাঁর সুবেশা নাতনীর যুগ্ম চিত্র দর্শক-মনে সরাসরি গভীর আবেদন সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক নির্মাণ যন্ত্রের মতই আরতি সাহার ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার যে নবীন ও উন্নত ভারতের প্রতীক—একথা স্বীকার করতেই হবে। প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এর উজ্জ্বল স্বীকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সকলেই।

অন্য প্রদর্শনী ছিল আঞ্চলিক শিল্পজাত দ্রব্যের। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদিসহ নানারকম শিল্পে এই অঞ্চলে অগ্রগতির সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব এই প্রদর্শনী থেকে। কুটীরশিল্প মণ্ডপটিও অনবদ্য। চন্দন কাঠ ও শিল্পের জন্য মহীশূরের জগৎজোড়া খ্যাতি। চন্দন কাঠ দিয়ে এরা বহু বিচিত্র জিনিস যেমন তৈরী করেন, তেমনি এর তেল দিয়ে সুবাসিত হয় সাবান ও আরও বহুতর বস্তু। প্রসাধন রূপে চন্দন পাউডারের বহুল ব্যবহারের কথাও শুনেছি। সারা ভারতে তো বটেই, বিদেশেও এর বাজার বেশ বড়। বিত্তবান সৌখীন ও রুচিশীল মানুষের ঘরে চন্দন কাঠের আসবাব তো থাকেই, বহুক্ষেত্রে দরজা জানালাও হয় ঐ কাঠ দিয়ে। শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের সমাধিসৌধে চন্দন কাঠের উপর হাতির দাঁতের কাজ করা দরজা দেখেছি। হাতির দাঁতের কাজ মহীশূরের আর এক প্রসিদ্ধ শিল্প। মহীশূরের জঙ্গলেও প্রচুর হাতি। সেগুলি ধরে এরা ফলাও কারবার করেন। এখানকার জীবনও জীবিকার ক্ষেত্রে হাতির প্রাধান্য স্বীকৃত, উৎসবে অপরিহার্য।

প্রদর্শনী প্রাঙ্গণের একটা বিরাট চত্বর জুড়ে গড়ে উঠেছে আনন্দমেলা- নানারকমের নাগরদোলা, কোন কোনটি তার বিদ্যুৎচালিত, দশ পয়সার

ম্যাজিক, চার আনার সার্কাসের সঙ্গে জুয়া খেলার বা ভাগ্য পরীক্ষার নানা চাতুর্যপূর্ণ আয়োজন রয়েছে। একটা টেবিলে কতকগুলি সাবান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে কাঠের একটি রিং ছুঁড়ে একখানা সাবান ঘিরে ফেলতে পারলে সাবানটি আপনার হয়ে যাবে! এই ছোঁড়বার অধিকার অর্জনের জন্য মূল্য ধার্য হয়েছে দশ পয়সা। ব্যর্থ হলে দশ পয়সা গচ্চা গেল। না-পানেওয়ালার দল দারুণ ভারি, তবু খদ্দেরের অভাব নেই।

আর এক পাশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ। বেশ খোলামেলা বিরাট জায়গা। মঞ্চ থেকে জনৈক গায়ক সুললিত কণ্ঠে সুন্দর গান করছিলেন কিন্তু শ্রোতা জন-কুড়ি মাত্র। তবে মাইক মারফত গানটিকে সারা প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। এতে গায়কের প্রতি অসম্মান দেখানই হয়। এমনটি হলে বাংলাদেশে কোন গায়ক গান করতে স্বীকৃত হতেন বলে আমার মনে হয় না। শ্রোতাহীন মঞ্চ দূরের কথা অমনোযোগী বা বেরসিক শ্রোতাদের গান পরিবেশন করতে অস্বীকার করার ঘটনা আমার জানা আছে। মহীশূরের মানুষের নাচ-গান অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে। তার প্রমাণও পেলাম চন্দ্রগুপ্ত রোডের সিনেমা-থিয়েটারে। এটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত। দিনে চারবার করে প্রদর্শনী হয়। প্রথমটির শুরু সকাল সাড়ে দশটায়। দিনভোর আয়োজন অন্য কোথায়ও দেখিনি।

বাজির শব্দে মধ্যে মধ্যে শহর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। রাস্তা চলাই বিপজ্জনক। কখন যে ধাবমান বাজির শিকার হতে হবে তার ঠিক নেই। অতএব বেশি ঘোরাঘুরি করা সমীচীন মনে হয় নি। প্রদর্শনী থেকে সরাসরি আমরা লজে ফিরে এলাম। হোটেলে এসে দেখি এলাহি ব্যাপার। নিচের তলার হল ঘরটি লোকে লোকারণ্য। এরা সব দূর দূরান্তের যাত্রী। বাসে করে এসেছেন। রাতটা এখানে ঘুমোবেন।

সকালেই বেরিয়ে পড়বেন নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থলে। প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের সুযোগ সহ এক রাত ঘুমোবার জন্য জনপ্রতি মাশুল এক টাকা। অর্থাৎ হলটির থেকে দৈনিক আয় হয় প্রায় একশত টাকা। আমরা তিন দিন ছিলাম; প্রতিদিনই রাত্রে এটি ভর্তি দেখেছি। দিনের বেলায় একদম ফাঁকা থাকে।

শহরাঞ্চল দেখানোর বাস ছাড়বে সকাল আটটায়। আমাদের হোটেলের সামনে মহারাজার পুরাতন প্রাসাদ—এখন আর্ট গ্যালারি নামে পরিচিত, তারই প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা শুরু হবে। দর্শনীয় স্থানের তালিকায় প্রথম নাম হল এই আর্ট গ্যালারিটি। সঙ্গে একটি ছোট যাদুঘর আছে। আমি দেখতে উৎসাহ বোধ করি নি। তালিকাভুক্ত আরও কয়েকটি স্থানের উপর বাসে বসেই চোখ বুলাতে হয়। আর্ট গ্যালারি প্রাঙ্গণ ছেড়ে বাসটি চিড়িয়াখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। দেড় ঘণ্টা এখানে থাকবে। ততক্ষণ আমাদের চিড়িয়াখানা দেখতে হবে। সময় নষ্ট করে এবং পয়সা ব্যয় করে মফস্বলের একটা চিড়িয়াখানা দেখতে বাধ্য হওয়ার জন্য মনটা অপ্রসন্ন হল। তবু পঞ্চাশ পয়সা সেলামী দিয়ে ঢুকে পড়লাম পশুশালার প্রাঙ্গণে। সব চিড়িয়াখানার মত এখানেও বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পশু পাখি বানর সাপ প্রভৃতি বহু বিচিত্র জীব জন্তু বন্দী করে রাখা হয়েছে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে একেবারে মন্দ লাগে না। গণ্ডারের সংখ্যাধিক্যই এ চিড়িয়াখানার বিশেষত্ব। এত অধিক সংখ্যক ও নানা আকৃতির গণ্ডার অন্যত্র দেখা যায় না। বানর ও হনুমান বহু। একটি শাদা হনুমান আছে। বেশ বড় বড় জিরাফ আছে অনেকগুলি। জিরাফগুলির কোন কোনটিকে একতলা বাড়ির ছাদ পর্যন্ত মুখটা বাড়িয়ে দিতে দেখা গেল। গলাটা অত লম্বা হলে কি হবে, ওরা মুখটা মাটি পর্যন্ত নামাতে পারে না।

চিড়িয়াখানার সামনেই কয়েকটি দোকানপাট আছে। নানাবিধ

সৌখীন স্মারক-দ্রব্য। কয়েকজন কিছু কেনাকাটা করলেন। চন্দন কাঠের গুঁড়োটুকু পর্যন্ত বেশ দামে বিক্রী হয়। সুধীরদা কয়েক প্যাকেট কিনলেন। সুদৃশ্য পলিথিনের প্যাকেটে ভরা কাঠের গুঁড়ো। দাম একটু চড়াই মনে হল। বাইরের লোকের কাছ থেকে বেশি দাম নিতে এদের কোন কুণ্ঠা নেই।

চিড়িয়াখানা ছেড়ে বাস গিয়ে থামল একেবারে চামুণ্ডি পাহাড়ের মাথায়। বাসে করে পাহাড়ের মাথায় চড়বার স্ফূর্তি আলাদা। কোয়াম্বাটুর থেকে মহীশূর আসবার সময় পাহাড় ডিঙিয়েছিলাম। এ পথ ততটা পেঁচালো বা রোমান্টিক নয় বটে, কিন্তু অনুভূতি প্রায় একই রকম। উঠবার পথে কোন এক বাঁক থেকে কনডাকৃটর অদূরে তিন হাজার সাড়ে-তিন হাজার ফুট নিচের মহীশূর শহরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ওখান থেকে পুরো শহরটি দৃষ্টি গোচর হয়।

পাহাড়ের শীর্ষদেশটি সমতল এবং বেশ বিস্তৃত। খেয়ালই হয় না আমরা এতটা উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় চড়েছি। চারিদিকে গাছপালাও আছে বেশ। বাস থেকে নামতেই প্রথম দর্শন মহিষাসুরের। গোঁফ ওয়ালা খর্বাকৃতি মানুষ মূর্তি। ডান হাতে তার উত্তোলিত খড়্গ বাম হাতে একটি সাপ। মূর্তিটি অসুরের বলেই বোধ হয় অসুন্দর ও ভয়ঙ্কর। সামান্য দূরে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির

বইপত্রে পড়েছিলাম এটা মা দুর্গার মন্দির। দেবী সিংহবাহিনী অষ্টভূজা। অনেকগুলি বাস একসঙ্গে এসে পড়ায় যথেষ্ট ভিড় হয়েছে মন্দিরে। ভাল করে দেখবার অবকাশ হল না। দুবার ঢুকেও ঠিক মত দেখতে পারি নি। সংগ্রামরতা দেবী ও অসুর মাত্র দেখে বাঙালী মন তৃপ্ত হয় না, তার চোখ আরও কিছু খোঁজে।—নানা অলংকার, বেশ বাস ও মালা চন্দনে আবৃত দেবীকে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখেই ফিরে আসতে হল। জানি এই মূর্তির মধ্যে বাঙালীর মা দুর্গা খোঁজা অর্থ-

হীন। তবু দ্বিতীয়বার ঢুকেছিলাম এই ভেবে যে, নাই বা রইলো পুরো প্রতিমা, এই দূর দেশে যেটুকু আছে তারই বা তুলনা কোথায়!

সারা ভারতবর্ষেই যে মা দুর্গা নানা ভাবে ও নামে অর্চিতা হন সে কথা আমরা ভুলে যাই। বাংলার শারোদৎসবের সঙ্গে মহীশূরের দশেরার প্রকার ও প্রকরণগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন তফাৎ নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।

অসুর নিধনের জন্য দুর্গার আবির্ভাব। এক এক দেবতার তেজ থেকে দেবীর এক একটি অঙ্গ হয়েছে। দেবতারা সকলেই একটি করে, অস্ত্র তুলে দিলেন দেবীর হাতে। সমুদ্র দিলেন বস্ত্র ও অলঙ্কার, হিমালয়ের কাছ থেকে পেলেন বাহন—সিংহ। দেবীর তেজ সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হল। তাঁর হুঙ্কারে ও গর্জনে বিশ্ব কেঁপে উঠল! দেবীর নিঃশ্বাস থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য জন্মায়।

দুর্গোৎসবের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাঙালীর নিবিড় পরিচয় রয়েছে। মহীশূরের দশেরা উৎসব একটু আলোচনা করলেই উভয়ের মধ্যেকার যোগসূত্রটি সহজে উপলব্ধি করা যায়।

মহীশূরে নবরাত্রির নবম দিবসে সরস্বতী পূজা হয়। আমাদের মত বই দোয়াত কলমের পুজোর সঙ্গে শিল্পীর বাদ্যযন্ত্র, মিস্ত্রির যন্ত্রপাতি, কৃষকের হলও পূজিত হয়। আমাদের মা-বোনদের সিঁদুর উৎসবটি এদেশে বোধ হয় মহিলাদের আমন্ত্রণ করে পান ও কুমকুম উপহার দেওয়ার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের দেশে বিজয়া সম্মেলনে গান-বাজনা হয়। ওখানকার এই উৎসবেও গান একটা প্রধান অঙ্গ। কিছু কিছু লৌকিক আচারে অবশ্য ভিন্নতা দেখা যায়।

দশম দিনে সমারোহের সঙ্গে বিগ্রহটিকে এনে গ্রামের বারোয়ারি তলায় সুসজ্জিত কলাগাছের গোড়ায় রাখা হয়। কলাগাছটি হল অসুর শক্তির প্রতীক। পুরোহিত গাছটিকে তীরবিদ্ধ করেন। অতঃপর গ্রাম প্রধান এসে তরবারির আঘাতে গাছটি দ্বিখণ্ডিত করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে

সমবেত জনতা সমস্বরে ধ্বনি দেন—পাপের বিনাশে পুণ্যের জয় হল। আমাদের পূজার বলিদানের মধ্যেও তো একই বিষয় লক্ষ করি। পাঁঠা বা মোষ বলি ছাড়াও, কুমড়া বলি আখ ও অন্যবিধ ফল বলিদানের প্রথা বাংলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দশেরার অর্থই হল অশুভ ও অপরাধের বিনাশ এবং শুভের জয়। আমাদের দেশে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ জন্মদিনে কিশোরকিশোরীরা পুতুল সাজিয়ে যেমন জন্মাষ্টমী করে, এদেশে দশেরার দিনে প্রায় সেই রকম কাণ্ড-কারখানা করে ছেলে-মেয়েরা। দশেরা মহীশূরের জাতীয় উৎসব। জীবনের প্রায় সব উৎসব প্যাক করে এই দশদিনের মধ্যে তারা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

চামুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে উঠবার একাধিক পথ আছে। মন্দিরের দোর গোড়া থেকেই মনে হল হাঁটা পথ দু'দিকে গেছে। পথের উপর অনেক দোকানপাট। অনেক যাত্রী এসেছেন, বেশ জমজমাট। এখানে আবার টেলকোর চাটার্জী সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। প্রচুর ছবি তুলছেন তিনি। বহুজনেই নানা দিকে ক্যামেরা ঘোরাচ্ছেন। আজকের এই মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে চান সকলেই। কিন্তু তা কি সম্ভব? মনের ক্যামেরায় যা রইল তার চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন আমরা বোধ করি নি। তবু ছবি দেখতে ভাল লাগে। তিনি আমাদেরও একখানা ছবি তুললেন।

আমরা ভিন্ন পথে নেমেছি। এই পথের প্রান্তে বৃহত্তম নন্দী অর্থাৎ শিবঠাকুরের ষাঁড় রয়েছে। একখানা পাথর কেটে কুটে উপবিষ্ট একটি বিশাল বৃষ রচনা করা হয়েছে। এর বিশালত্বই শুধু নয়, শিল্পকার্য এবং পরিবেশও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। খোলা আকাশের তলায় রয়েছে মূর্তিটি। পূজা হয়ত হয়, কিন্তু অযত্নরক্ষিত। আমাদের সহযাত্রীদের অনেকে পূজা দিলেন, প্রদক্ষিণও করলেন। একটি জীবন্ত ষাঁড় সামনে এনে দাঁড় করিয়ে পয়সা আদায়ের ফন্দি এঁটেছেন পূজারীরা। ষাঁড়টি নিরীহ, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহুজনে ভক্তি সহকারে তার

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করে দু-চারটি পয়সা দিয়ে দিচ্ছেন। উৎসাহী কেউ কেউ ষাঁড়টিকেও কিছু খেতে দিলেন। খাবার আনতে ভুলে গেছেন এমন একজন জঙ্গল থেকে কিছু লতাপাতা এনে ষাঁড়টির মুখে ধরলেন।

ভাস্কর্যের দিক থেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মূর্তিটির প্রশংসা করেছেন। এদিকে প্রায় সব শিবমন্দিরেই বৃষমূর্তি দৃষ্ট হয়। এর চেয়ে শোভনতর একটি বৃষ দেখেছিলাম তাঞ্জোরে সেটা শ্বেত পাথরে তৈরি, কমনীয় রচনা। আকারে ছোট হলেও মনে হয় সেটিই সুন্দরতর।

পাহাড়ের পরে একটি রাজপ্রাসাদ আছে। দূর থেকে এক ঝলক দেখিয়ে দিলেন কনডাকটর। শহরের নানা পথ ঘুরে যাত্রাস্থল আর্ট-গ্যালারির সামনে এসে আমাদের এ বেলার মত যাত্রা-বিরতি ঘটল। যেখান থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল ঠিক সেখানেই আমাদের নামিয়ে দেওয়া হল। আবার বিকেল দুটোয় আমরা বেরোব। ঘণ্টা দু'য়েকর কিছু কম সময় হাতে ছিল। তার মধ্যে খেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া গেল। বিকেলের ভ্রমণসূচীতে ছিল টিপু সুলতানের প্রাসাদ, দুর্গ, সমাধি, কাবেরী সঙ্গম, শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির, কৃষ্ণরাজসাগর এবং বৃন্দাবন গার্ডেন।

মহীশূরকে বলা হয় উদ্যান নগরী। সার্থক এ নাম। পথে পথে সবুজ গাছ আর বহুবর্ণ ফুলের প্রাচুর্য একান্ত অমনোযোগী লোকেরও চোখে পড়ে। তাই বলে ঘিঞ্জি বস্তি অঞ্চলেরও অভাব নেই। সেখানে খোলার ঘর, রাস্তায় গরু ছাগল, জঞ্জালের বিশেষ কমতি আছে বলে মনে হয় নি। তবে কলকাতার মত জঞ্জালের পাহাড় জমে নেই কোথায়ও।

বিকেলের যাত্রায় প্রথমে এলাম শ্রীরঙ্গপত্তনে। মহীশূর থেকে দূরত্ব দশ কিলোমিটারের মত হবে। পত্তন শব্দের অর্থ রাজধানী। প্রাচীন কথা কেউ বিশেষ মনে রাখে নি। টিপু সুলতানের জন্য বর্তমান

কালে স্থানটির গৌরব বেড়েছে। টিপুকে মহীশূরের মানুষ জাতীয় বীরের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। গোড়ায় তিনি ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলালেও শেষে ইংরেজের সঙ্গে লড়ে শহিদ হয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুর গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদটি প্রায় অক্ষতই রয়েছে। বাড়িটির নাম "দরিয়া দৌলত।" এর শুরু থেকে শেষ অবধি নানা চিত্রে শোভিত। ইতিহাসের বিষয় বস্তু নিয়ে ছবিগুলি আঁকা। অতএব সমসময়ের ইতিহাস জানা না থাকলে এগুলির মর্ম ঠিক অনুভব করা যায় না। আমাদের সঙ্গে জনৈক স্বয়ংনিযুক্ত ভঙ্গিসর্বস্ব গাইড এসেছিলেন। তবু তার কথায় স্থূল ঘটনাগুলির সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ঘটেছিল।

একখানা ছবিতে সমকালীন প্রধান রাজন্যবর্গকে চিত্রিত করা হয়েছে। তার মধ্যে চিতোরের মহারাণার ছবিটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রয়োজনের মুহূর্তে ভারতীয় অন্তঃপুরচারিণী ব্রীড়াবনতা রমণী-গণের অনেকেই সব যুগেই রাজ্যশাসনেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন—ছবিখানির মধ্যে সে কথাটাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এই যুগের আর এক অধিনায়িকা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথা। কংগ্রেসের ভাঙা-গড়ার পর্ব নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দিত ও গর্বিত। *

শ্রীরঙ্গপত্তন কাবেরী নদীর দ্বারা সুরক্ষিত। দরিয়া দৌলত দ্বিতল বাড়ি। প্রাঙ্গণটিও বিস্তৃত। রক্ষণাবেক্ষণ করেন এখন ভারত সরকার। Monuments and Archeological Sites and Remains Act অনুসারে এগুলি সরকারী সংরক্ষিত সম্পত্তি। তাই কিছু কিছু ঝাড়-পোচ্ ও সাজানো গোছানোর চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

দরিয়া দৌলতের দোতালায় টিপু ও তাঁর পুত্রদের ছবি আছে। টিপুর দুটি কচি ছেলেকে ইংরেজ জামিন স্বরূপ ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই

*এ লেখার সময় পর্যন্ত জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়নি।

ঐতিহাসিক ছবিখানি দেখে চোখ আর্দ্র হয় না এমন লোকের সংখ্যা বেশি হতেই পারে না। নানা সময়ের অনেকগুলি মুদ্রারও একটি সংগ্রহ এখানে রয়েছে। নানা আকারের স্বর্ণ মুদ্রাও আছে। তাতে আরবী অক্ষর ও বিবিধ প্রতীক চিহ্ন। ব্রোঞ্জ ও রুপার মুদ্রাও আছে অনেকগুলি।

দুর্গটি ভাঙাচোরা। একটি অর্ধভগ্ন তোরণ দিয়েই বোধ করি আমরা দুর্গপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিলাম। তার বর্তমান আকার প্রকার থেকেই অতীতে এ যে কি বিরাট ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই দুর্গপ্রাকারের মধ্যেই মাতা-পিতার কবরের পাশে টিপুর কবরটি রয়েছে। মাতা-পিতার জন্য টিপু নিজে এই সমাধি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। এর স্থাপত্য রীতিটি চমৎকার। বারান্দার কালো উজ্জ্বল পাথরের স্তম্ভগুলি নাকি পারস্য থেকে আনা হয়েছিল। দরজাগুলি সব চন্দন কাঠের। হাতির দাঁতের সূক্ষ্ম নক্‌শা বসানো রয়েছে, এখনও সেগুলি উজ্জ্বল এবং অক্ষত। ইংরেজরা চূড়ান্ত শয়তানি করলেও মানুষের মত একটি মাত্র কাজ করেছিল যে, যুদ্ধে নিহত টিপুর মৃতদেহটি তার মা ও বাবার কবরের পাশে কবর দিতে দিয়েছিল। সমাধি-সৌধের দক্ষিণে রয়েছে একটি বড় মসজিদ। সেটিও দেখবার মত।

এখানে আমার স্থাপত্য সম্পর্কে রাসেলের একটি অপ্রচলিত কথা মনে পড়েছিল। তাঁর ধারণা প্রাচীন কাল থেকেই স্থাপত্য শিল্পের দু'টি মুল উদ্দেশ্য রয়েছে। এক—আশ্রয় দান, এবং দুই—রাজনৈতিক। দ্বিতীয় কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—জাঁকজমক পূর্ণ বাড়িঘর জনচিত্তে প্রভাব বিস্তারের উপায় হিসাবে রচনা করা হয়েছে। ভগবান্ এবং তাঁর পৃথিবীর প্রতিনিধির (রাজা) প্রতি বিস্ময় জাগাবার জন্য রাজার প্রাসাদ বা দেবতার মন্দির পরিকল্পিত। সহযাত্রীদের কারো কারো মুখে এমন কথা শুনেছিলাম। শ্রদ্ধাহীনতার ফল এটা। রাসেল সাহেব পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর কথার প্রতিবাদ করি না। কিন্তু

মন্দির দেখে তো বটেই, এই প্রাসাদ ও সমাধি দেখেও রাসেল সাহে'বর কথা যে শেষ কথা নয় তা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারলেও মনে মনে বুঝেছি।

অদূরে বিখ্যাত শ্রীরঙ্গনাথস্বামী মন্দির। ত্রিচিনাপল্লীর বিষ্ণু মন্দিরের নামও রঙ্গনাথস্বামী মন্দির। একই নামের দু'টো মন্দির আরও আমরা দেখেছি। এত মন্দির দেখলাম, সর্বত্র পূজাঅর্চনার বেশ সুচারু ব্যবস্থা আছে। এখানে কয়েকজন স্থানীয় পুরোহিত নিজেরাই 'উপার্জনের' উপায় হিসাবে পূজার আয়োজন করে থাকেন। এটি ভারত সরকারের তত্ত্বাবধনে রয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে কোন পূজার ব্যবস্থা নেই। শুনলাম সরকার নেবার আগে এখানে দীর্ঘকাল পূজাপাঠের ব্যবস্থা ছিল না, লোকও তেমন আসতেন না। এটিও বিষ্ণুমন্দির। বাইরে থেকে মন্দিরের শিল্পকর্ম তেমন নয়নতৃপ্তিকর মনে হয়নি।

এই মন্দিরের পথে একটি অদ্ভুত কয়েদখানা আছে। লোকে বলে 'ডান্‌জন'। মাটির তলায় অন্ধকার কারাগৃহকে ডান্‌জন বলে। আমরা তার ভেতরে নেমেছিলাম। কতকটা অবরুদ্ধ গুহার মত, সামনে এক ফালি উন্মুক্ত স্থান। তার পরেই উঁচু পাঁচিল। ঐ এক ফালি আকাশ ছাড়া আলো বাতাস প্রবেশের দ্বিতীয় কোন সুবন্দোবস্ত দেখা গেল না। বাইরের দিকে একখানি তাম্রফলক স্থাপিত হয়েছে। এর থেকে জানা যায়, টিপু এখানে ইংরেজ বন্দীদের দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিলেন।

বাস এবার আমাদের নিয়ে চলল কাবেরী-সঙ্গমে। কাবেরী নদীর দুটি শাখা এইখানে পুনর্মিলিত হয়ে পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হয়েছে। অপ্রশস্ত দু'টি জলধারা। তার মধ্যে বিস্তর ঊর্ধ্ব-শীর্ষ শিলাখণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পদ্মা-মেঘনা-যমুনার দেশের মানুষ একে নদী বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন। এ নদীতে নৌকা চলে না, চলবার উপায় নেই। স্রোত যেমন তীব্র তেমন পাথরেও ভর্তি। সঙ্গম যাই হোক,

জায়গাটি মনোরম। একেবারে শান্ত শ্যামশ্রীমণ্ডিত গ্রামীণ পরিবেশ।

আমাদের এ বেলার স্বয়ংনিযুক্ত গাইড এখানে তাঁর আসল বক্তব্যটি উপস্থিত করলেন। তাঁর কথাবার্তা বলার ধরণ-ধারণ কৃত্রিমতা-দোষে দুষ্ট, তদুপরি ব্যবহারও অনেক ক্ষেত্রে সুরুচির সীমা রক্ষা করে নি। ফলে ভদ্রলোকের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন ছিলেন না। বিদ্যাবুদ্ধিতে খাটো মানুষও তার স্বাভাবিক সীমার মধ্যে থাকলে, প্রিয় ও গ্রহণীয় হয়ে থাকেন। চালবাজ মানুষ অচল। এঁরা জানেন না ভঙ্গিসর্বস্ব কৃত্রিমতা ষ্টাইল হতে পারে না। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যখন সর্বজনগ্রাহ্য ও গ্রহণীয় হয় তখনই মাত্র তা ষ্টাইলের মর্যাদা পায়। এ মর্যাদালাভ নকলনবিশী করে হয় না। প্রগল্‌ভতা কুরুচির নামান্তর। যাই হোক এ লোকটি যখন চলে যাবার সময় তার শ্রমের মূল্য চাইলেন তখন যাত্রীরা প্রায় সকলেই কিছু কিছু দিলেন। ভদ্রলোকের ছেলেকে তো আর দু-চার আনা ভিক্ষা দেওয়া যায় না! কম করে তাই একটা টাকা দিতে হল। মোট জনা-পঞ্চাশেক যাত্রীর কাছ থেকে অন্যূন চল্লিশটা টাকা নিশ্চয়ই উঠেছিল। ঘন্টা আড়াইয়ের পরিশ্রমে চল্লিশ টাকা আয়! মহীশূরের মানুষ, কেবল মহীশূর কেন, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি জনপদ ভ্রমণকারীদের নিকট থেকে কতভাবে যে পয়সা উপার্জন করেন তার কোন ইয়ত্তা নেই।

মহীশূর থেকে এ বেলার ভ্রমণে আমরা মন্দির, মসজিদ গীর্জার সঙ্গে প্রাচীন কীর্তি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সবই দেখেছি। গীর্জার কথাটা বলা হয়নি। সেন্ট জোসেফ চার্চ। এটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে নির্মিত। গীর্জার বাইরে মা মেরী ও যীশুর পৃথক পৃথক মন্দির আছে। কেরলের পথে যীশুর মন্দির দেখেছি। মন্দিরময় দক্ষিণে যীশুকেও গ্রহণীয় করে তুলবার জন্য মন্দির স্থাপন করতে হয়েছে বলে মনে হয়। গীর্জাটি প্রাচীন না

হলেও দর্শনীয়। গীর্জার অভ্যন্তরে আমরা ঢুকেছিলাম। সেখানকার পরিচ্ছন্ন শান্ত নীরবতা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে। গীর্জাটির ভিত্তি-শীলা ন্যাস করেছেন মহীশূরের মহারাজা কৃষ্ণ রাজেন্দ্র। ভারতীয় হিন্দুর পক্ষেই এই ঔদার্য সম্ভব। পৃথিবীতে এক ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের উপাসনা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করছেন এমন নজীর বড় বেশি নেই। অনেকে বলতে পারেন, তখন ইংরেজ রাজত্ব ছিল। চাপে পড়ে অথবা তাদের খুশী করার জন্য সেদিনকার করদমিত্র রাজ্যের এই মহারাজা গীর্জার জমি ও অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ পর্যন্ত মেনে নিতে তর্ক নাই করলাম। কিন্তু এই রকম একজন রাজাকে দিয়ে ভিত্তিশিলা স্থাপন করানোর পেছনে ত কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ভারত সংস্কৃতির সার সত্যটি এই ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে। অতএব গীর্জাটির ভ্রমণসূচিতে স্থান দেবার মধ্যে বাণিজ্যিক বুদ্ধি যদি থেকেও থাকে, আমি খুশী হয়েছিলাম।

আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে মহীশূরের ইঞ্জিনিয়ার রাজপুরুষ বিশ্বেশ্বরাইয়াজি সারা ভারতের প্রথম জলাধার তৈরী করেন। মহারাজার নামে এটির নাম হয়েছে কৃষ্ণরাজ সাগর। ভারতে এখন এমন অনেক সাগর হয়েছে। তাই এটাকে আর অনেকে আজকাল দর্শনীয় বলে মেনে নেবেন না। তবু এই জলাধার দেখতে গিয়েছিলাম। ড্যামের কফির দোকানে বৈকালিক জলযোগ সেরে নিলাম। দুই-এক-মিনিট ঘুরে দেখলেই আমাদের দেখা শেষ হয়ে যায়। অতঃপর আমরা যাব আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থল বৃন্দাবন গার্ডেন বা কুঞ্জে। সরোবর, ফোয়ারা ও ফুল পাতায় সাজান বাগান। সন্ধ্যার পর ঘন্টা-খানেক প্রচুর বিজলি আলো জেলে সার্চ লাইট দিয়ে রঙীন আলো ফেলে ফোয়ারাগুলিকে মোহিনী করে তোলার ব্যবস্থা আছে। সরোবরে জলবিহারের আয়োজনও রয়েছে। পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে দু চক্র স্পীড বোটে ঘুরে আসতে পারেন। এরও খদ্দের আছে বেশ।

এসব দেখে ভাল লাগার বয়স পেরিয়ে এসেছি বলেই বোধ হয় তেমন আস্বাদ পাইনি।

যানবাহনের অসুবিধার জন্ম মহীশূর থেকে শ্রাবণ বেলগোলা, হাসান হালেবিদ ও বেলুর যাওয়া সম্ভব হল না। রেলে হাসান গিয়ে বেলুর যাওয়া যায়, তাতে একদিন সময় বেশি লাগে। একমাত্র সিজন টাইম অর্থাৎ মার্চ মাস ভিন্ন অন্য কোন সময়ে দৈনিক যাত্রীবাস ওদিকে যায় না। কিন্তু খবর পেলাম বাঙ্গালোর থেকে যাওয়া এখন অনেক সুবিধা। তাই তৃতীয় দিনেই মহীশূরের বাস তুলে বাঙ্গালোর যাওয়া ঠিক হল। তাড়াতাড়ি পুরানো ব্যবস্থা বদলে ফেলার ফলে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। পরিচিত দু-একজন লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা বাতিল করে দিতে বাধ্য হলাম।

এই রকম ভ্রমণে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কোন জায়গায় এক-দুই দিনের বেশি থাকছি না। আবার কবে কোথায় পৌঁছাব তারও ঠিক নেই। তাই সাধারণত পরিচিত বন্ধুদের ঠিকানায় বাড়ি থেকে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। মহীশূরের গান্ধী শান্তি কেন্দ্রে চিঠি আসার কথা। সকাল দশটার আগে তাদের দেখা মিলবে না। আবার চিঠি না নিয়ে যেতেও মন চাইছে না। তাই সকালটা বসে বসে কাটিয়ে বারোটার বাস ধরে আমরা বাঙ্গালোর রওনা হলাম।

আমরা এক্সপ্রেস বাসের সওয়ারি। মহীশূর থেকে ছাড়বে আর বাঙ্গালোর গিয়ে থামবে। মাঝখানে কোথায়ও দাঁড়াবে না। ভাড়া মাত্র পাঁচ টাকা। আসন সংরক্ষণ টিকিট চার আনা। কোয়েম্বাটুর থেকে মহীশূর আসবার আনন্দ-স্মৃতি তখনও অম্লান। তাই বাসের ছোট আসন, মালপত্রের চাপ ইত্যাদি অসুবিধা আমাদের গায়ে লাগেনি। পরে বুঝেছিলাম দীর্ঘপথে এগুলি শেষ পর্যন্ত খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

এ রাস্তাও সুন্দর। তবে কোয়াম্বাটুর-মহীশূর পথের মত সৌন্দর্য এর নেই। সেই পরিচিত দৃশ্য। আকাশের পটভূমিকায় পাহাড়, ধানক্ষেত, কৃষকের কুটীর। ঘণ্টা তিনেক সময় লাগে বাঙ্গালোর আসতে। পথে একটি জনবিরল প্রান্তরে এক আমগাছ তলায় মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়েছিল বাসটি। জনৈক ডাব বিক্রেতা সেখানে ডাব নিয়ে হাজির ছিলেন। বাঁধা দর পঞ্চাশ পয়সা। বাসের যাত্রীরা সব একসঙ্গে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা আছে। তাই বোধহয় খদ্দের সামলাবার জন্য তিনি স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে করেই এসেছেন। তারা খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইছেন আর তিনি ঝুপঝাপ ডাব কেটেই চলেছেন। কথাবার্তা দুই-তিনটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেউ কারও ভাষা জানি না। মধ্যে মধ্যে কন্‌ডাক্‌টর কাছে পিঠে থাকলে কিছু বুঝিয়ে দেন।

পূর্বেই হয়ত বলেছি, বাঙালী যেরকম ডাব খেতে ভালবাসে এ দেশে তা মেলে না। ঝুমড়ো নারকেল। জলের চেয়ে শাঁসের পরিমাণ বেশি। নরম শাঁস এখানে মালাই নামে পরিচিত। এক রামেশ্বরম্ ও বাঙ্গালোর ছাড়া আমাদের রুচিকর ডাব আর কোথায়ও দেখিনি।

বাঙ্গালোরের বাস ঘাঁটি একটা পুকুরের মত জায়গায়। চারিদিকে উঁচু উঁচু রাস্তার মধ্যবর্তী ভূভাগ পুকুরের আকার ধারণ করেছে। রেল স্টেশন নিকটে, আধুনিক শহরের কেন্দ্র স্থলে এই বাসঘাঁটি থেকে দূরপাল্লার সব বাস ছাড়ে। সর্বত্রই বাসে যাওয়া যায়। এমনকি সুদূর বোম্বাই পর্যন্ত নিয়মিত বাস চলাচল করে।

বাঙ্গালোর মহীশূরের রাজধানী, আধুনিক শহর, কিন্তু প্রাচীনতার স্পর্শ বর্জিত নয়। রামায়ণ মহাভারতের মতো অতি প্রাচীনকাল বা মধ্যযুগের ইতিহাসে কিংবা মুসলমান রাজত্বের নানা অধ্যায়ে বাঙ্গা-

লোরের উল্লেখ আছে। মহীশূর রাজ্যের নাম বদলে *কর্ণাটক করা হয়েছে সেই পুরাতন স্মৃতির সূত্র ধরেই। হাল আমলের একটা দিক বাঙ্গালোরের বিখ্যাত উদ্যান লালবাগের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তা নিয়ে নিরস বা সরস যে আলোচনাই করা হোক না কেন সে হবে মনোজগতের ব্যাপার। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে বসলে ঠকতে হবে। অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে হয়। কিন্তু হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের হাতে গড়া বিশাল বাগান—লালবাগ, বোটানিকাল বাগান খোলা-চোখে দেখা যায়,—এখনও শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় অশীতিপর বৃদ্ধ হায়দার যুবক টিপুর সঙ্গে মিলিত হয়ে শঠ ও প্রবঞ্চক ইংরেজের শয়তানি চিরতরে শেষ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইংরেজের শৌর্যের কাছে তাঁরা পরাজিত হন নি। হেরেছিলেন নিমকহারামির কাছে; স্বদেশবাসীর ষড়যন্ত্রের কাছে। তাই ত এ পরাজয় গ্লানির হয়নি, শতাব্দীকাল পরেও গৌরবের জয়টিকা হয়ে রয়েছে।

আধুনিক ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালোর একটি বহুশ্রুত নাম। সাহিত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ রাজ্য সর্বভারতীয় খ্যাতির অধিকারী। আর শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান বিমান নির্মাণ কারখানা, টেলিফোন ফ্যাক্টরি, সরকারী মেশিনটুল্স্ ফ্যাক্টরি, ইণ্ডিয়ান ইন-স্টিটিউট অব সায়ান্স ইত্যাকার নামগুলি স্বাধীন ভারতবাসীর গৌরব ও গর্বের হয়ে উঠেছে। কাছেপিঠে অফুরন্ত দেখবার জায়গা। তার সঙ্গে ইদানীং যুক্ত হয়েছে—হোয়াইট ফিল্ডে সাঁই বাবার আশ্রম। বাঙালীর নিকট বিশেষ আকর্ষণের আর একটি স্থান আছে রবীন্দ্র কলা ক্ষেত্র।

বাঙ্গালোরে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রীনিবাসে উঠেছিলাম। নাম শুনেই এটি পছন্দ করি। বেশ বড়সড় আধুনিক আবাস। বিদ্যিপেঠের ছাত্র মোহন গিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের

সেবা করতে। বারাসতের নিকট আমডাঙ্গায় সে এই কাজে আমার সহকর্মী ছিল প্রায় ছ'মাস। এখানে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ হল। খাওয়া-থাকা ও অন্য সব কিছুর দারুণ অসুবিধার মধ্যেও যারা হাজার হাজার মাইলের দূরের দুর্গত মানুষের সেবা করতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন তারা কেউ সাধারণ মানুষ নন। মোহন ভাই তেমনি একজন অসাধারণ মানুষ। সে আমার অনুজপ্রতিম হয়ে উঠেছিল। খবর পেয়ে হোটেলে এসে দেখা করেছিল। দুঃখ রয়ে গেল তার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। মোহনদা ও সুধীরদা গিয়েছিলেন এবং তাঁদের সৌজন্যে ও আন্তরিকতায় তাঁরা মুগ্ধ।

মোহন নববারাকপুর সমবায় পল্লীতে আমার বাসভবনে গিয়েছিল। নববারাকপুর সমবায় প্রথায় গড়ে-ওঠা উদ্বাস্তুদের বাসভূমি। সমবায়ের প্রতি আমার স্বাভাবিক অনুরাগ তাই তার জানা ছিল। সুতরাং সে বাঙ্গালোরের ওমেনস্ ইনডাস্ট্রিয়াল কো- অপারেটিভ সোসাইটি দেখার জন্য আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছিল।

সমিতিটি সোমেশ্বরপুরে। বারো বছর মাত্র হল এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে শহরের নিম্নআয়ী পরিবারের মেয়েদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে এটি সফল হয়েছে বলা চলে। বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা এবং অনগ্রসর সমাজের নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সমিতি টেলিফোনের যন্ত্রাংশ উৎপাদন করেন। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইনডাস্ট্রিজের সঙ্গে চুক্তি বলে এঁরা টেলিফোন কোম্পানির নিকট থেকে কাঁচা মাল পান। কোম্পানির নির্দেশ মত সমিতি নিজস্ব কর্মশালায় সেগুলিকে গড়া পেটা করে ফেরত দেন।

সমিতির বর্তমান সদস্যসংখ্যা একশোর কিছু বেশি। সমবায় বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার এর ম্যানেজাররূপে নিযুক্ত হয়েছেন। ম্যানেজারের বেতন সরকার দেন বটে, কিন্তু সমবায় সমিতির

নির্দেশেই তাঁকে কাজ করতে হয়। সমিতির নিজস্ব মূলধন অর্থাৎ শেয়ার মাত্র হাজার তের টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছেন। শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রণালয় থেকে এই সমিতি পেয়েছেন ১২,৪১,৫০ টাকা। মহীশূর সরকার ম্যানেজারিয়াল সাবসিডি ছাড়াও বিবিধ উপায়ে নানা সাহায্য করে থাকেন। বিদেশের মানব সেবা সংস্থা থেকেও এঁরা বেশ কিছু সাহায্য পেয়েছেন।

নারী কর্মী বলে কোলের বাচ্চা নিয়ে অনেককেই কাজ করতে আসতে হয়। ছোট হলেও কারখানা তো বটে, তাই বাচ্চা সামলে কাজ করা প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। এ সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করেছেন পশ্চিম জারমানির ক্যাথলিক সংগঠন ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। এই সমবায় সমিতির ক্রেশটিও খুব সুন্দর। এটি সমিতিই পরিচালনা করেন। সদস্যদের এজন্য মাসে মাত্র দুই টাকা চাঁদা দিতে হয়। কেন্দ্রীয় সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড থেকে দু হাজার টাকা পাওয়া যায়। কর্মশালা, সমিতি ভবন, ক্রেশ ইত্যাদি যে জমির উপর গড়ে উঠেছে সেটি দিয়েছেন বাঙ্গালোর নগর উন্নয়ন ট্রাস্ট। কোন সেলামি লাগেনি। বার্ষিক খাজনা মাত্র বার টাকা।

এমন সুবিধা পশ্চিমবঙ্গের কোন সমিতি আশা করতে পারেন? এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি কর্মীকে ৬ মাসের ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া হয়েছে। ট্রেনিং-এর সময় প্রত্যেককে মাসিক ৬০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়। শেষ হলেই চাকরি মেলে। নিম্নতম নিশ্চিত বেতন ৭৫ টাকা। তারপর যে যেমন কাজ করতে পারবেন তেমনি ইনসেনটিভ বোনাস। সাধারণতঃ কর্মী প্রতি এই খাতে মাসিক উপার্জন পনের টাকা থেকে একশত টাকা পর্যন্ত হয়। এই উপার্জন সামান্য মনে করার কোন কারণ নেই। বাঙ্গালোরে জীবনযাত্রার ব্যয় কলকাতার অর্ধেকেরও কম। এ ছাড়া আছে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং কর্মচারী রাজ্যবীমার সুবিধা।

সমিতি থেকে দুপুরে কর্মী ও তাদের সন্তানবর্গকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। সদস্যবর্গের সন্তান-সন্ততির জন্য ইন্দিরা-নগরে কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক স্কুল খুলেছেন সমিতি।

সমিতি কর্মীদের পুনর্বাসনেও উদ্যোগী হয়েছেন। যে-সব মৃত বা বিকলাঙ্গ সৈনিকের স্ত্রী এই সমিতির সদস্য, প্রথমে তাদের পুনর্বাসনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৮টি পরিবারের বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন এই সমিতি।

একটি মধুর ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এই সমিতিতে। নববর্ষের দিন প্রতিটি কর্মীকে ব্লাউজের কাপড় সহ একজোড়া শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। অর্থমূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, এই রকম কাজের দ্বারা কর্মী ও পরিচালকদের মধ্যে হৃদ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কর্মীদের নিকট প্রতিষ্ঠানটি কেবল মাত্র উপার্জনের হাতিয়ার না হয়ে, আত্মীয় হয়ে ওঠে।

সোসাইটি অচিরেই আরও বড় হবে। পঞ্চাশ জন নতুন কর্মী নেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে বলে শুনে এলাম। মহীশূর সরকার রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিল থেকে ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ঘরবাড়ি ও যন্ত্রপাতি কিনে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। সমবায় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যের ব্যাপারটা এদের সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই বুঝা যায় আমরা কেন পিছিয়ে আছি। যেখানে দশ টাকা দরকার, সেখানে আমরা দু টাকা দিয়ে দুধ ও তামাক দুটোই খেতে চাই। পশ্চিম বাংলায় সরকারী সাহায্যের চেয়ে চোখ রাঙানিটাই বোধ হয় বেশি। সরকারী মনোবৃত্তি না বদলালে এবং সাহায্যের পরিমাণ না বাড়ালে, কেবল অর্থের মাত্র নয়, অর্থের সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্যের নিশ্চিত বিক্রয়-ব্যবস্থা কিছুই সফল হবে না। ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিকে কেন্দ্র করে এই রকম একটি সমবায় সমিতি একবার গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাকে কেন্দ্র করে একটা সমিতি গড়ে উঠেছে—সেখানে সরকারের কোন সাহায্য নেই বলেই শুনেছি।

বাঙ্গালোর শহরে ফুলের মেলা। পথে প্রান্তরে সর্বত্র অজস্র ফুল। লালবাগের গোলাপবাগানের নাকি তুলনা নেই ভূভারতে। কি জানি এ কথা কতটা সত্য। আমি তো যা দেখি তাই অতুলনীয় মনে হয়। ষাট রকমের পুষ্পিত গোলাপ গাছ আছে এই বাগানে। হাজার রকম চেনা-অচেনা আরও সব গাছগাছালির মেলা বসেছে। শহরে খানিকটা এলোমেলো ঘোরা ফেরা করে কাটিয়ে দেওয়া গেল দিনটা। জনৈক বাঙালী যুবক বাঙ্গালোর থেকে ঘুরে এসে বলেছিলেন, এই শহরের একটি পথে চোদ্দটি সিনেমা আছে। সত্যই দু-চার দশ-পা এগোলেই একটা সিনেমা পড়ে।

জনতা ট্রাভেলসের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আমরা পরের দিন সকাল সাতটায় শ্রাবণবেলগোলা বেলুর ও হালেবিদ দেখবার জন্য যাত্রা করেছিলাম। চব্বিশ টাকা ভাড়া। পঞ্চাশজন যাত্রী নিয়ে একটি লাক্সারি বাস ঠিক সময়েই ছেড়েছিল কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য মধ্যপথ থেকে আমাদের ফিরে আসতে হয়।

শ্রাবণ বেল গোলা

বেলা এগারটার কয়েক মিনিট পরে আমরা শ্রাবণবেলগোলা পৌঁছেছিলাম। পথে মিনিট কয়েক বাসটি দাঁড়িয়েছিল একটি গঞ্জ মত জায়গায়, যাত্রীদের কফি পানের সুযোগ দেবার জন্য। কফি তো বটেই, যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য আমার অখাদ্য মনে হয়েছিল, পরিবেশটিও ছিল অপরিচ্ছিন্ন। কফি খাওয়া বাতিল করে এদিক-ওদিক একটু ঘোরা-ফেরা করা গেল। বাঙ্গালোর থেকে শ্রাবণবেলগোলার দূরত্ব কিলোমিটার, সেখান থেকে হালেবিদ ও বেলুর আরও কিছু দূরে।

শ্রাবণবেলগোলাকে বড় জোর একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম বলা যেতে পারে। একটা মাঝারি ধরনের পাহাড়ের চূড়ায় জৈন তীর্থঙ্কর গোমতেশ্বরের বিশাল পূর্ণাবয়ব মূর্তি। অনেক দূর থেকে এই মূর্তির উর্ধ্বাংশ, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত, আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। পাহাড়ে উঠবার সিঁড়ি

আছে। প্রবেশপথে কয়েকটি দোকান আর টিকিট-ঘর। আট আনা দক্ষিণা দিয়ে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে উপরে উঠতে হয়। সিঁড়িটি সুন্দর। যথেষ্ট প্রশস্ত এবং ধাপগুলি অনুচ্চ। উঠতে বিশেষ কষ্ট হয় না। তেমন খাড়াইও কোথায়ও নেই। তবু আমরা ক্লান্ত হয়েছিলাম। কিন্তু পক্ষীতীর্থ বা রক টেম্পলের মত হাঁফ ধরে নি। সিঁড়ি-ভাঙ্গা যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁরা সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে অপেক্ষাকৃত সমতল পাহাড়ের উপর দিয়ে হেঁটেও যেতে পারেন। দু-চার জনকে এই ভাবে নামতে দেখলাম। উঠতে দেখিনি কাউকে।

সিঁড়িটা একটানা মূর্তির পাদদেশ অবধি যায় নি। প্রায় শীর্ষদেশে দু-তিনবার ছোট ছোট ঘরের মধ্যে গিয়ে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। এমনি করে প্রলুব্ধ হতে হতে আমরা এক সময় মূর্তির পাদমূলে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। বিশালতাই শুধু মাত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে না, এর স্থাপনা-পদ্ধতি গঠন-সৌকর্য ও শিল্পকীর্তি মুগ্ধ করে এবং ভাবিয়ে তোলে। যাঁরা এটি রচনা করেছিলেন তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য ও দক্ষতার কোন বাস্তব ধারণা করা কি সম্ভব!

সম্পূর্ণ নগ্নমূর্তি। দুই পায়ের মধ্যস্থল থেকে দুটি লতা মূর্তিটিকে বেষ্টন করে উঠেছে। ছাদে চড়লে পেছন দিক থেকে উর্ধ্বাংশ দেখার সুবিধা হয়। এখান থেকে দেখা যায় পরিপাটি করে বাঁধা কেশদাম। অনেকগুলি ছোট ছোট খোঁপা যেন জুড়ে আছে সমগ্র মাথাটিকে। দেখতে ভারি সুন্দর। পাদমূলের বেদি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের আকারে রচিত। দুটি সর্প মূর্তিও খোদিত রয়েছে। সাপও এখানে তার স্বাভাবিক হিংস্রতা ভুলে যায়, এই কথাই বোধ হয় শিল্পী বোঝাতে চাইছেন সাপের উপস্থিতির দ্বারা।

মূর্তির সামনে একটি মন্দির ভবনের শীর্ষে সবাহনা কিছু দেবীমূর্তি দৃষ্ট হয়। সিংহবাহিনী কুষ্মাণ্ডিনী দেবী, কুক্কুট ও সর্পসহ পদ্মাবতী,

সহাতি ধরণীন্দ্র, হাঁস নিয়ে দেবী সরস্বতী এবং কমল হস্তে শ্রীলক্ষ্মী। জৈন তীর্থে এই সব বিগ্রহ অবশ্য পরবর্তী কালের সংযোজন। গোমতেশ্বরেরই রীতিমত পূজা হচ্ছে দেখলাম। তীর্থম্ (চরণামৃতকে দক্ষিণে তীর্থম্ বলে) দিয়ে পয়সা আদায় করার রীতি এখানেও প্রচলিত।

পাহাড়ের উপরে আরও কয়েকটি গৃহ আছে। একটি কূয়োর মত স্থান দেখিয়ে এক জন বল্লেন এখানে জল পাওয়া যেত। পাহাড়ের শীর্ষদেশের কূয়োতে জল একটু অবাক হবার মত কথাই বটে! ওপরে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চোখ বোলালে বেশ একটা শিহরণ জাগে মনে। নিচের বাড়ি-ঘর মাঠ-পুকুর সব এক নজরে এসে যায়, ছবি হয়ে ফুটে ওঠে! ঘরগুলি সব খেলাঘর, মানুষগুলি যেন পুতুল, আর গ্রাম হল ছবি। নিকট থেকে যেটা একান্তই হিজিবিজি বা নোংরা বোধ হয় উপর থেকে সে সবও অপরূপ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে হাস্যময় হাসান ওঠে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা নেমে এলাম। আপনার শ্রান্তি বিদূরণের জন্য ডাবওয়ালা হাজির। গ্রামটা ঘুরে দেখার সময় নেই। আমাদের রথ এখনই ছাড়বে। অনেকটা পথ যে বাকি! সাড়ে বারোটা নাগাদ বেলুরের পথে হাসান শহরে এসে আমাদের যাত্রা বিরতি ঘটল। একটি ছোট্ট সরাইখানা, নামটি কিন্তু তার বিরাট— হোটেল উডল্যাণ্ড। কোন কালে এটা হয়ত জঙ্গল ছিল। এখন তো পুরোপুরি শহর। আজ ঈদ। নতুন ও ঝলমলে পোষাকে মুসলিমদের দেখা গেল। সংখ্যায় তারা এখানে বেশ বেশিই বলে মনে হল।

হোটেল উডল্যাণ্ডে আমাদের দুপুরের খাওয়া সারবার ব্যবস্থা হয়েছে, দামটা যে নিজেদের মেটাতে হবে এ কথা জানাতে বাস-কর্তৃপক্ষ ভুল করেন নি। সেই চিরাচরিত দক্ষিণী খাবার। বাঙ্গালোর মহীশূরে একটু ইতরবিশেষ হয়েছিল কিন্তু এখানে চূড়ান্ত দক্ষিণী। ভাত, সম্বর অর্থাৎ শাকসবজি মিশ্রিত ডাল, টক ডাল, রসম্ অর্থাৎ ঝালমিশ্রিত

তেঁতুল গোলাজল, চাটনি অর্থাৎ লঙ্কা সহযোগে পাতিলেবু চটকে আধা সেদ্ধ করা ; পাঁপর ও টক দৈ। পদে ঘাটতি নেই, আড়ম্বর অনুষ্ঠানও ঠিক আছে কিন্তু ঐ খাবার গলা দিয়ে নামল না। যাই হোক খাওয়ার পাট চুকিয়ে সবাই আমরা বাস-চালকের নির্দেশমত তাড়াতাড়ি করে বাসে ফিরে এলাম। ফিরতেই শুনলাম, বাসওয়ালা কৌতুক করে জানিয়ে দিয়েছেন, পাঁচটা পর্যন্ত এখানেই মনুমেণ্ট দেখতে হবে, বাস খারাপ হয়েছে, সারতে সন্ধ্যে পাঁচটা হবে।

যাত্রীরা ক্ষেপে আগুন। কারো হাতেই প্রায় বাড়তি সময় নেই। বহু জনের জীবনে বেলুর হালেবিদের পথে দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ হয়ত জুটবেই না। দুঃখে ও ক্রোধে সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু হৈ চৈ সার হল। অনেক চেষ্টা করেও বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা গেল না। বাস-মালিক যদি আশ্বাস দিতেন পাঁচটা পর্যন্ত তাঁরা এখানে অপেক্ষা করবেন তা হলে অনেকে নিজেদের পয়সায় ট্যাকসী করে বেলুর হালেবিদ ঘুরে আসতে হয়ত সমর্থ হতেন। কিন্তু কয়েকজন উত্তেজিত যাত্রীর বাড়াবাড়িতে তাঁরা ভড়কে গেলেন। কিছুই ঠিক করে বলতে পারলেন না। রাস্তায় পায়চারি করেই সারাটা দিন কাটাতে হল। মাত্র দশ পনের মাইলের ব্যবধানে থেকে ফিরে যেতে হল। অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি বেলুর হালেবিদ না দেখে। অদৃষ্টে না থাকলে এমনি করেই সব আয়োজন ভেস্তে যায়।

কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে বাসটাকে চলার মত করতে ছ'টা বেজে গেল। বাসওয়ালা চান যে অন্ধকার সন্ধ্যায় আমরা বেলুর হালেবিদ ঘুরে যাই। কিন্তু প্রায় সকলেই এ প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানালেন। বিশেষ করে যাঁদের সঙ্গে মহিলা ও শিশু আছেন তাঁরা একেবারে বেঁকে বসলেন। গেলে হয়ত ভালই হত, যাহোক একটু তো দেখে আসা যেত। তা হল না। আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু হল। পথে আর একবার বাস গেল বিগড়ে, সেটা সারিয়ে নিয়ে

বাঙ্গালোর পেঁছাতে পেঁছাতে ইংরেজি মতে তারিখটা বদলে গিয়েছিল।

বাঙ্গালোরে এসে ক্ষিপ্ত যাত্রীরা থানা পুলিশ করলেন, বাস নিয়েই হামলা চলল মালিকের বাড়ি। চালক এক সময় বাস ফেলে পালিয়ে গেলেন। সে এক দারুণ ধুন্দুমার ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল রাত প্রায় আড়াইটার সময়। কোম্পানি পরের দিন মোট ভাড়া থেকে ৫ টাকা করে ফেরত দিয়েছিলেন। পাঁচ টাকার জন্য এই হুজ্জুত পোষায় না। রাতের খাওয়া ও বিশ্রাম দুটোই বাতিল হয়ে গেল।

সাঁইবাবার আশ্রম

ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়েছি কি না-ঘুমিয়েছি সুধীরদা ডেকে তুললেন। ছ'টার মধ্যে আমাদের বেরোতে হবে। যাব হোয়াইট ফিল্ডে সাঁই-বাবার আশ্রমে। স্নানাদি সেরে আমরা যখন বেরিয়েছি তখন ছটা পুরো বাজে নি। দিনের আলোও ভাল করে ফোটেনি। বাঙ্গালোর শহর একটু দেরিতে জাগে মনে হল। ঐ সময় কোন চায়ের দোকান এ পাড়ায় খোলা পেলাম না। ফুটপাথে ও খোলা বারান্দায় যারা শুয়ে কাটায় তারা তখনও দিব্যি ঘুমোচ্ছে। এ সময়ে বাঙ্গালোরে সকালটা বেশ ঠাণ্ডা, তার উপর বেশ জোরেই উত্তুরে হাওয়া বইছিল।

চা কফির পাট চুকিয়ে পৌনে সাতটায় মারুতির বাস ধরলাম। হিন্দুস্থান বিমান নির্মাণ কারখানার পাশ দিয়ে আমাদের পথ। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই কারখানা। গাদা গাদা ভাঙ্গাচোরা ও ভাল প্লেন পড়ে আছে, তা রাস্তা থেকেই দেখা যায়। মারুতিতে এসে বাস বদল করতে হয়। এখানে অনেকটা সময় কেটে গেল ঠিক বাস পেতে। ভুল বাস ধরলে পথে আর একবার বদল করার ধকল পোহাতে হয়।

ন'টার কাছাকাছি সময়ে আমরা হোয়াইট ফিল্ডে পৌঁছেছিলাম।

কিন্তু হায়, সাঁইবাবা নেই। সম্পৎবাবু বলে দিয়েছিলেন, সাঁইবাবা অলৌকিক শক্তির অধিকারী, এ যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি। মন্দভাগ্য, তাঁর দেখা পেলাম না। দু-তিনদিন আগে তিনি তাঁর জন্মস্থান পুট্টিপাতি চলে গিয়েছেন। জায়গাটা এখান থেকে ৮০ কিলোমিটার দূর। একদিনে ফিরে আসা যায় না, তবু অনেকে একবার মাত্র দর্শনের আশায় যাচ্ছেন দেখলাম। স্থানীয় সকলেই সাঁইবাবাকে ভগবান্ বলে অভিহিত করেন। অলৌকিক শক্তির সঙ্গে জনসেবার নানা কাজ,—স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের অখণ্ড শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেছেন। দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ তাঁর ভক্ত। বহুজনের মুখে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনেছি। মুষ্টি ঊর্ধ্বে তুললেই তিনি প্রয়োজন মত প্রসাদ ইত্যাদি সেই মুঠির মধ্যে পান। কেবল পাওয়া নয়, ভক্তদেরও দেন। এ সব সহজে বোধগম্য হয় না।

আশ্রমে যাঁরা সমবেত হন তাঁদের মধ্য থেকে খুশি মত কয়েকজনকে বেছে নিয়ে আশীর্বাদ করেন, দীক্ষা দেন। ভক্তরা বলেন, যার বেশি প্রয়োজন তাকেই তিনি আগে ডাকেন। তিনি বলেন সত্যাশ্রয়ী হও, ধার্মিক হও, শান্তি রক্ষা কর, ভালবাস তবেই সব পাবে। এর সব ক'টি অনুসরণ করা বর্তমান সময়ে অধিকাংশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাই তিনি যে-কোন একটি গুণ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমার শোনা কথা। তবু বড় ভাল লেগেছে তাই বলি। তিনি নাকি বলেছেন, শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণের মত দুষ্কৃতকারীদের নিধন করে এখন আর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ যুগের মানব-চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নেই। তাই অধার্মিক জনের হত্যা অভিযান শুরু করলে কেউ আর বেঁচে থাকবে না। সেই জন্য তিনি এসেছেন ধর্মসম্মত উপায়ে মানুষের বুদ্ধিকে নির্মল করে দিতে। বুদ্ধি নির্মল হলে মানুষ যে ভাল হয়ে যায় তাতে আর সন্দেহ কী!

সাঁইবাবা ১৯২৬ সনে অন্ধ্রের একটি সামান্য গ্রাম পুট্টপার্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব সম্পর্কে নানারকম অলৌকিক কাহিনী এখন লোকমুখে ফেরে। মাত্র বার বছর বয়সে ছাত্রাবস্থায় তিনি একখানি চাঞ্চল্যকর নাটক রচনা করেন—বইখানির তেলেগু ভাষায় লেখা নামের অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—"আমরা যা বলি তা কি করি" তাঁর স্কুলে নাটকটি অভিনীত হয় এবং তিনি সে অভিনয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

স্কুলে পড়াশুনা তাঁর বেশি হয়নি। কিন্তু বেদ, পুরাণ-উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর অসামান্য দখল। তিনি তাঁর পূর্বজন্মের কথাও স্মরণ করতে পারেন। ১৯৪০ সনে তিনি গৃহত্যাগ করেন। আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি বিশ্বের নানা দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। তিনি কোন বিশেষ ধর্মমতের উপর গুরুত্ব দেন না। থিয়োসফিস্টদের মতই বলেন—যার যা ধর্ম তিনি সেটাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করুন।

আজ সাঁইবাবার দেখা পেলাম না, কাল বেলুর হালেবিদ দেখা হল না। স্বভাবতই মনটা কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমাদের হাতে আরও একটা দিন সময় ছিল। মাদ্রাজ থেকে কলকাতাগামী মেল-গাড়ী ধরতে হলে বাঙ্গালোর থেকে দিনের দিন গেলে চলে। কিন্তু আন্না ডি. এম্. কে. দলের রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ দিনটি আর আমাদের যাত্রার তারিখটি এক হওয়ায় আমরা একটু বিচলিত হয়েছিলাম। নানা কারণে প্রতিবাদ দিবসের পরিণতি নিয়ে সর্বত্র একটা চাপা উত্তেজনা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করেছি। এখানে বসে বুঝতে পারা যায় না মাদ্রাজে কী হচ্ছে। তারপর পরপর দু'টি নিষ্ফল যাত্রার জন্য ঠিকই করে ফেলা হল আজই বৃন্দাবন এক্সপ্রেস গাড়ী ধরে মাদ্রাজ চলে যাব। সাঁইবাবার আশ্রম থেকে ফিরবার পথে সুধীরদা মাদ্রাজের টিকিট কিনতে গেলেন, মোহনদা ও আমি এলাম সরাসরি হোটেলে সব গুছিয়ে নিতে।

বাঙ্গালোর—মাদ্রাজ ৩৫৬ কিলোমিটার পথ। বৃন্দাবন এক্সপ্রেস মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় পাড়ি দেয় এই পথ। গাড়িখানি চমৎকার। যে ক'টি আসন তার চেয়ে একটি টিকিটও বেশি বিক্রী করা হয় না। সীটে বসেই চা, কফি, জলখাবার ও পানীয় পেতে পারেন। এজন্য অবশ্য টিকিট প্রতি এক টাকা (তৃতীয় শ্রেণী) বাধ্যতামূলকভাবে টিকিট কাটার সময়ই আদায় করে নেওয়া হয়। ওটা কেবল সার্বিস চার্জ, জিনিসের দাম পৃথক। পথের দৃশ্যে বৈচিত্র্য বেশি নেই। মাদ্রাজের দিকে যত এগুনো যাবে, তালগাছের সংখ্যা ততই বাড়বে। পথের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃশ্য পাখির মেলা। জায়গাটার নাম মনে নেই। সহস্র সহস্র পাখির মেলা বসেছিল সেখানে।

মাদ্রাজ এসে জানা গেল মাদ্রাজ মেলে আমাদের আসন সংরক্ষিত হয়নি। খুব ঝগড়াঝাঁটি-হুজ্জুত করে জনতার তিনখানা বসবার আসন পাওয়া গেল। গাড়ীতে উঠে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে এই ভরসায় রইলাম। রাতের মত উঠলাম সেই পুরানো কানডান লজে। এখানকার তত্ত্বাবধায়ক ছেলেগুলি বড় ভাল। আসন সংরক্ষণের গোলমাল শুনে ওদের অন্ধকার পথের আড়কাঠি পাঠিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু হল না।

প্রত্যাবর্তন

এবার ঘরের ফেরার পালা। গাড়ীতে চড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা বাড়ীতে পৌঁছে গেল। গাড়ী যতই দেরি করে, উদ্বেগ ও ক্লান্তি ততই বাড়ে। পুরো ৪৮ ঘণ্টা গাড়ীতে কাটাতে হয়েছিল। অন্ধ্রে মুলকি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী ছাত্রদলের দ্বারা আমাদের গাড়ীখানা আক্রান্ত হয়েছিল। গাড়ীটিকে তারা মাঠে-ঘাটে যথেচ্ছ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কৌটো নাচিয়ে সংগ্রাম তহবিলে চাঁদা তুলেছে। ভীত যাত্রীরা নীরবে অর্থ দিয়ে মুক্তি পাবার আশায় অকাতরে প্রভূত অর্থ দিচ্ছেন। ছাত্রদের ভাণ্ডার সহজেই পূর্ণ হয়। প্রত্যাশার অতিরিক্ত

তারা পেয়ে তখনকার মত গাড়ীখানা ছেড়ে দেয়। খানিকটা যেতেই আবার গাড়ী থামে, ছাত্রদল ওঠে, চাঁদা সংগৃহীত হয় এবং পুনরায় গাড়ী চলে। পুলিশের চোখের সামনেই গাড়ীখানার আলো বিকল করে দিয়ে গেল কিছু অতি উৎসাহী ছেলে। ফিরতি যাত্রা কেবল আতঙ্ক ও ক্লেশের মধ্যে কিন্তু কাটে নি। নানা কারণে খুবই রমণীয়ও হয়েছিল। গাড়ীতে বসেই ভাইজাগে একটা বাজার চোখে পড়ল যেখানে বস্তুতঃ কোন ঘর নেই, দোকানদারেরা সব বড় বড় তালপাতার ছাতার তলায় গোল হয়ে বসে বেচাকেনা করছেন। সে যেন নানা আকারের একটা ছাতার মেলা। এ অঞ্চলে তালগাছের যেমন প্রাচুর্য, তেমনি রকমারি কাজেও তালপাতার ব্যবহার হয়।

আর একটা মনোরম দৃশ্য দেখেছিলাম চিল্কাতে। রম্ভা ও চিল্কাতীরের কালিকট স্টেশনে আমাদের গাড়ী থেমেছিল। বিকেলের পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চিল্কা হ্রদের অপরূপ সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। পাহাড় ও দ্বীপ ঘিরে দূর-বিস্তৃত শান্ত জলরাশি; বুকে অগণিত জেলেডিঙ্গি। এমন জায়গায় ভেসে বেড়াতে বাসনা জাগবে না এমন পাষাণহৃদয় মানুষ কেউ আছে কি না সন্দেহ। ঝাঁক ঝাঁক উড়ন্ত পাখিরা চকিত করে দিয়ে চলে যায়। কি পাখি তা বোঝাই যায় না। জনৈক সহযাত্রী বললেন—অধিকাংশই সারস জাতীয় পাখি। জননী সারদেশ্বরী এখানে নীলকণ্ঠ পাখী দেখে অভিভূত হয়ে যুক্ত করে প্রণাম করেছিলেন। তাদের কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি।

মাছ ধরার ব্যাপক আয়োজন গাড়ীতে বসেই লক্ষ করা যায়। নানা বিচিত্র আকারের ঢাউশ বোচনোগুলি খানিকটা দূর দূর অন্তর বৃত্তাকারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। মাছেরা তার মধ্যে সহজে ঢুকবে কিন্তু শত চেষ্টা করেও বেরোতে পারবে না। কলকাতা থেকে চিল্কা পাঁচশ পঞ্চাশ কিলোমিটারের মতন। এই চিল্কা থেকে কলকাতা বাজারে রোজই প্রচুর মাছ যায়।

দক্ষিণ-ভারতবর্ষ সমুদ্র সেবিত, বেষ্টিতও বটে। সমুদ্রের উদার দাক্ষিণ্য এর সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট। সুপ্রাচীন কাল থেকে বাণিজ্য লক্ষ্মীর সম্পর্ক ঘটেছিল প্রাচ্য প্রতীচ্যের নানাদেশের সঙ্গে। খ্রীষ্ট-ধর্মের শৈশবে ভারতবর্ষের এই অংশে সে আপনার স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের শতবর্ষের মধ্যেই সাধু টমাস এসেছিলেন মাদ্রাজে। ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে যিশুর ধর্ম এতটা নিরুপদ্রবে বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়নি। খাস ইউরোপেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনায় ভরপুর। অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে ভাসকোডাগামা দক্ষিণের কালিকটে এসে কূল পেয়েছিলেন। হিমালয় অতিক্রম করে মুসলমান এসেছিল লুঠেরার বেশে, কিন্তু দক্ষিণের ভূমিখণ্ডে তারা নেমেছিলেন বন্ধুরূপে বাণিজ্যের সহকারী হয়ে। দক্ষিণের ভারতবর্ষ শঙ্করাচার্য রামানুজ বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক প্রভৃতি মহাত্মাজন উপহার দিয়েছেন। নবীন ভারতের পথ-নির্দেশক স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা আজ যেমনভাবে জানি তার প্রস্তুতিপর্ব ঘটেছিল দক্ষিণ ভারত ভূমিতেই। দক্ষিণের ভারতবর্ষ তাই সত্যিকারের পুণ্যভূমি।

ভারতবর্ষের সুন্দরতম মন্দিরগুলির প্রায় সবক'টিই এই দাক্ষিণাত্যের মাটিতে। উত্তর-ভারতেও যে ছিল না তা জোর করে বলা যায় না। ধর্মধ্বংসী দুর্বৃত্তগণ ভেঙ্গেচুরে ফেলার পর যা আছে তাই ত আমরা দেখছি। বিশ্বের আর কোন দেশের মন্দিরের সঙ্গে আমাদের মন্দিরগুলির তেমন মিল নেই। মিশরের পিরামিড প্রভৃতিতে বিস্ময়কর স্থাপত্য রয়েছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে ভারতের মন্দিরের তুলনা চলে না।

শুধুমাত্র ধর্মবোধ তৃপ্ত হলেই মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হল না। বাড়তি কিছু রচনার দ্বারা মানুষ স্বর্গের দেবতাকে ঘরের আপনজন করে তুলেছে। মন্দিরে মন্দিরে দেবতার সঙ্গে তার জাগতিক সঙ্গীসাথী

পশুপাখি তৃণগুল্ম ফলফুল সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের যাবতীয় ঘটনার ছবি ফুটিয়ে দূর ভবিষ্যতের অনাগত মানুষের নিকট সময়মের কথা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মুখর হয়ে উঠেছে নিস্তব্ধ অতীত মন্দিরে মন্দিরে, শিলাখণ্ডের বুকে। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দবেদনার রসে রঞ্জিত করে রাগ-অনুরাগের দ্বারা ভগবান্‌কে একান্তই আপনার জন করে নিয়েছে।

মন্দিরকে আমরা স্বর্গে প্রবেশের রাজপথের সিংহদ্বার বলে আলাদা করে রাখি নি। আমরা ভারতের হিন্দু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্রকন্যা বা ভ্রাতাভগ্নী, এমনকি শিষ্য প্রশিষ্য বলে মনে করি না। আমরা বিশ্বাস করেছি মানুষ মাত্রেই ভগবানের অংশ। এর ফলে আমাদের সুকৃতি দুষ্কৃতি সবকিছুর সঙ্গে ঈশ্বর একাত্ম হয়ে আছেন। এই ভাবনার অনুরূপ হল, আমাদের প্রতিটি গৃহই মন্দির। আমরা মন্দিরবাসী। রাজ-রাজড়ারা বড় বড় বিস্ময়কর শিল্পসমৃদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়ে তার প্রাঙ্গণে বাস করতেন। আমরা যারা সামর্থ্যহীন তারা শোবার ঘরেই একখানা লক্ষ্মীর পট বা নারায়ণের ছবি রেখে নিত্য একটু ফুল-জল দেই। তাই মনে হয়, দক্ষিণের ভুবন বিখ্যাত মন্দিরগুলির সঙ্গে আমার গৃহদেবতার আসনটির মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই, একই মানসিকতার ভিন্ন প্রকাশ। এই ভিন্নতার আকর্ষণে তিন সপ্তাহ ধরে দক্ষিণের ভারতবর্ষের পথে পথে আমরা ঘুরেছি। দেখেছি অনেক শুনেছিও বিস্তর। বুঝিনি তার অনেক কিছু। কিন্তু তৃপ্ত হয়েছি নিশ্চয়ই।

ভুবনেশ্বর মন্দির দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছ-বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে সাক্ষীরূপে ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে। নির্জনে নহে, যোগে নহে,—সজনে কর্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে লোকালয়কে

দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে ; সমষ্টি রূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমতঃ ছোটবড় সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তর পটে এক করিয়া সাজাইয়াছে, তাহার পর দেখাইয়াছে পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে, তিনি কে।” ঋষি কবির এই সত্যদর্শন দক্ষিণের সকল মন্দির সম্পর্কেই সত্য। লোকালয় যখন দেবালয়ে রূপান্তরিত হয় তখনই ত এই ধূলার ধরণী স্বর্গ হয়ে ওঠে।

স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ আপন আপন ইচ্ছা অভিলাষ অনুসারে নিজ নিজ মনোমন্দিরে স্বর্গের রূপ কল্পনা করেছে। শোক-দুঃখ জরা ব্যাধি শূন্য সদাপ্রফুল্ল ও শান্তিময় আনন্দলোক আমাদের স্বর্গ-কল্পনায় স্থান পেয়েছে। বাইবেলে নন্দনকাননের কথা আছে। সেখানে অফুরন্ত খাদ্য-পানীয় আরাম-বিরাম। কল্প লোকের স্বর্গ নিয়ে সুখী হতে পারেননি বহুজনে। তাঁরা এই পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্ববন্দিত প্রেমিক কবি ওমর খৈয়ামের স্বর্গের কল্পনা খুবই বাস্তব। তাঁর ধারণায়, বিজনে কুঞ্জতলে পাশে বসে প্রিয়া গান গাইবেন আর সঙ্গে থাকবে এক টুকরো রুটি, একপাত্র পানীয় এবং একখানা কবিতার বই। সম্রাট সাজাহান লালকেল্লা বানিয়ে বললেন, এই ত স্বর্গ। লিখে দিলেন তার গায়ে —ধরিত্রীর বুকে যদি স্বর্গ কোথাও থাকে তবে তা এখানেই, এখানেই। এত করেও স্বর্গ মরীচিকাই হয়ে রয়েছে অধিকাংশ মানুষের কাছে। হয়ত অনন্তকাল ধরেই এমনি করে সে মানুষকে প্রলুব্ধ করবে। এই প্রলোভনের শিকার হয়েই আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে, হিমালয় থেকে সমুদ্রে, আবার সমুদ্র থেকে হিমগিরি কন্দরে ছুটে চলি, মন্দিরে মন্দিরে খুঁজে ফিরি। কেউ স্বর্গের সন্ধান পাই, কেউ বা পাই না। পাই বা না পাই, খোঁজার বিরাম নেই, যাতায়াতও তাই কোনদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে না। অনন্তকালের সেই যাত্রাপথের কোন-না-কোন বিন্দুতে পথিক আমরা সবাই। অগণিত সেই যাত্রীদলের মধ্যে কচিৎ

কখনো দুই-পাঁচ-দশজন 'সুগন্ধ মাটি' হবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হন।

স্নানাগারের "সুগন্ধ মাটি" কবিকে জানিয়েছিল—মাটি মাটিই—তার নিজের কোন সুগন্ধ নেই; কিছুকাল গোলাপ বাগানে ছিল সেই সুবাদে গন্ধহীন অবহেলিত মাটি সুগন্ধ হয়ে উঠেছে, কবির চিত্ত আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। যুগ-যুগান্ত থেকে চলমান্ এই যাত্রীদলের যাত্রালগ্নে সকলেই সাধারণ মানুষ—কিন্তু মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে ভারত সংস্কৃতির প্রবহমান স্রোতে অবগাহন করে যখন ফিরে আসেন তখন তিনিও ঐ মাটির মত সুগন্ধ বহন করে আনেন। তারই কিছু এখানে সঞ্চিত রইল। ওঁ মধু॥

—●—